978-984-35-4260-1

978-984-35-4260-1

সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান | ড. কামরুল হক

সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান

ড. কামরুল হক

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান

ড. কামরুল হক

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

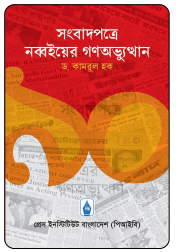

সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান

প্রকাশক	জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
প্রচ্ছদ	সোহেল আশরাফ খান
প্রথম প্রকাশ	এপ্রিল ২০২৩
কম্পিউটার বিন্যাস	ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল
তথ্য সংগ্রহ	দিনেশ মাহাতো
কম্পিউটার কম্পোজ	মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম মো. ফরিদুল আলম
বানান সমন্বয়	মো. তফাজ্জল হোসেন
মুদ্রণ	মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং ১০/১ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
গ্রন্থস্বত্ব	পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মূল্য	৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

PEOPLES UPRISING OF NINETY IN NEWSPAPER
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : ৳ 550 ■ $ 05 Only
ISBN : 978-984-35-4260-1
Phone : 9361424, 9330081-83, Fax : 880-02-48317458
E-mail: research@pib.gov.bd, Website: পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

মু | খ | ব | ন্ধ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তুমুল গণআন্দোলনের পর ঘটেছিল এই গণঅভ্যুত্থান। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল এরশাদের পতন হয়েছিল। অবসান হয়েছিল তাঁর দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরশাসন।

জেনারেল এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। সামরিক আইন জারির পর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম। স্থগিত ঘোষণা করেন সংবিধান। জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকেন। নানা অপতৎপরতার মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যায়। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ স্বতঃফূর্তভবে অংশগ্রহণ করেন এই আন্দোলনে। ধীরে ধীরে এরশাদবিরোধী আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়। গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র। দিন দিন তা ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। গণআন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর জেনারেল এরশাদ দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। সংবাদপত্রে আন্দোলনের খবর প্রকাশের ওপর কঠোর সেন্সরশিপ আরোপ করেন। প্রতিবাদে সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অবিরাম ধর্মঘট শুরু করেন তারা। ধর্মঘটের ফলে ১৯৯০ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে যায় সংবাদপত্রের প্রকাশনা। একটানা আট দিন দেশে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার পদত্যাগের পর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পুনরায় সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু হয়।

গণআন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ থাকায় জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে তীব্র গণরোষ ও গণঅভ্যুত্থানের প্রতিফলন ঘটেনি বাংলাদেশের সংবাদপত্রে। কিন্তু নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সংবাদপত্রে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

'সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান' শীর্ষক এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করেছে। পিআইবির গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হককে গবেষণাকর্মটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। নিষ্ঠার সঙ্গে তা সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সহযোগিতার জন্য গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক, গবেষক, গণমাধ্যমকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যদের এই গবেষণা গ্রন্থ কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

প্র|স|ঙ্গ|ক|থা

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রতিফলন কেমন ছিল তা জানার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গবেষণাকর্মটি হাতে নেওয়া হয়। কিন্তু জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনের পর যখন গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, ঠিক সে সময়টিতে দেশের সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ ছিল। তাই 'সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান' অনুধাবন করার জন্য এই গবেষণাকর্মে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরের সংবাদপত্র বিশ্লেষণের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের চারটি সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংবাদপত্রগুলো হচ্ছে: দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। উল্লিখিত পনেরো দিনের মধ্যে ১৭ ডিসেম্বর সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। তাই এই গবেষণাকর্মে মোট চৌদ্দ দিনের সংবাদপত্র বিশ্লেষণের আওতায় আনা হয়েছে।

সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জাতীয় জীবনে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। আর তাই গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরের ঘটনাবলি সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ও প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। চারটি সংবাদপত্রেই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সংশ্লিষ্ট খবরের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। সংবাদপত্রে গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। শুধু তাই না, গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার মাধ্যমেও সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৪ দিনের মধ্যে ৬ দিন দৈনিক বাংলা ও সংবাদ গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট একটি করে রিপোর্ট আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করেছে। আর দৈনিক ইত্তেফাক ৩দিন এবং বাংলাদেশ অবজারভার ২দিন একটি করে রিপোর্ট আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করেছে। গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট মোট ৫৬টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দৈনিক বাংলা ও সংবাদ ১৬টি করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। আর দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার ১২টি করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। একইদিন একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশের নজিরও রয়েছে। এমন কি নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান

সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিশেষত্বের কারণে প্রথম পৃষ্ঠায়ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার একটি করে সম্পাদকীয় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছে। সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলাম ছাড়াও এই প্রসঙ্গে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের অভিমত তুলে ধরেন। গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৪ দিনে চারটি সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বমোট ৬৪টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু সংবাদেই ৩২টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, সংবাদপত্রের পাঠকরা নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলো। প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপকভাবে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

'সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান' শীর্ষক এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়ায় পিআইবি'র মহাপরিচালক একুশে পদকপ্রাপ্ত খ্যাতিমান সাংবাদিক জনাব জাফর ওয়াজেদ মহোদয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর সিদ্ধান্তের কারণেই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা ও গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ড. কামরুল হক
গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	⬇
পটভূমি	৯
উদ্দেশ্যে	৩৪
গবেষণা প্রশ্ন	৩৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	⬇
গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন	৩৭
তৃতীয় অধ্যায়	⬇
তথ্য উপস্থাপন	৪৩
চতুর্থ অধ্যায়	⬇
আধেয় বিশ্লেষণ	৩২৩
পঞ্চম অধ্যায়	⬇
গবেষণা প্রশ্নের ফলাফল	৩৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	⬇
উপসংহার	৩৪৫

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই গণঅভ্যুত্থানের জন্য দেশের মানুষকে দীর্ঘ নয়বছর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছে। আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। আহত হয়েছেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। তাদের মধ্যে অনেককেই পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের অন্তরীণ হতে হয়। কারাগারে আটক থাকতে হয় অসংখ্য নেতা-কর্মীকে।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানকে নানাভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। স্বৈরাচারবিরোধী এই গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী লিখেছেন:

> ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশে সংঘটিত গণআন্দোলন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। নয় বছরব্যাপী পরিচালিত ঐ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের কাছে যেন ১৯৭১ সালের মতই ১৯৯০ এর ডিসেম্বরের বিজয়-উত্তরকালের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সে কারণেই অভূতপূর্ব এ গণআন্দোলনকে নিয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী, ছাত্র, শিক্ষক সংগঠনসহ দেশের সচেতন মহলে ব্যাপক আশাবাদ পরিলক্ষিত হয়।[১]

রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি তখন সেনাবাহিনীর প্রধান। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেই তিনি দেশে সামরিক আইন জারি করেন। স্থগিত ঘোষণা করেন সংবিধান এবং দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। 'হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হাননান লিখেছেন:

> সাত্তার সরকারের ব্যর্থতা, দুর্নীতি, সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ইত্যাদি সঙ্কটজনক অবস্থার মুখে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর

> প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে বসেন। তার ক্ষমতা দখলের এই নাটক ১৯৫৮ সালের জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের অনুকরণেই ঘটে। এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছ থেকে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। জিয়াহীন জাতীয়তাবাদী দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব তখন চরম কলহে রূপ নিয়েছিল। ফলে দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী রাষ্ট্রপতি সাত্তারের পক্ষে আর শাসনক্ষমতা ধরে রাখা এবং ক্ষমতালোভী এই সেনানায়কের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। এরই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশ আবার সামরিক শাসনের কারাগারে বন্দী হয়।[২]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পুরো শাসন আমলই ছিল আন্দোলনমুখর। তবে আন্দোলনে ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক আইন জারির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদও জানায় ছাত্রসমাজ। এই প্রতিবাদ সংক্রান্ত সব তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। ড. মোহাম্মদ হাননান তাঁর 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদের সময়কাল' শীর্ষক গ্রন্থে এই সম্পর্কে লিখেছেন:

> সামরিক শাসন জারির প্রতিবাদে ২৪ মার্চ রাতেই ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সকাল বেলায়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো আক্রান্ত হয়। খোদ সামরিক বাহিনীই হলগুলোতে চলে আসে। প্রচণ্ড ত্রাস সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা।[৩]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের মধ্যে রাজপথে প্রকাশ্যে প্রথম মিছিল করে ছাত্ররাই। প্যালেস্টাইনে ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদে ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে এই মিছিলটি বের করা হয়। সামরিক আইন অনুযায়ী তখন রাজনৈতিক তৎপরতাসহ মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ। ছাত্রনেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মধুর কেন্টিনে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন, সামরিক আইন অমান্য করে জুমাতুল বিদার দিন জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে আমেরিকান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। এই প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হাননান উপরোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন:

> ছাত্ররা তাদের বিজয় হয়েছে ভেবে স্লোগান দিতে দিতে মতিঝিল থেকে দৈনিক বাংলা হয়ে শিশু একাডেমীর পাশ দিয়ে আবার মধুর কেন্টিনে ফিরে যাচ্ছিল। এই সময় বাঁশি বাজাতে বাজাতে সেনাবাহিনী ভর্তি কতকগুলো গাড়ি শাহবাগ-ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র-হাইকোর্ট রাস্তা দিয়ে আসছিল। সেনাবাহিনীর গাড়িগুলোও এমন বন্ধের দিনে এবং সামরিক

> আইনের মধ্যেও এমন একটি মিছিল দেখে প্রথমে একেবারে আশ্চর্যই হয়ে পড়ে এবং সকল গাড়ির চাকাই মিছিলটির পাশ ঘেঁষে থেমে যায়। ছাত্ররা দেখতে পায় গাড়িতে বসে আছেন স্বয়ং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।[৪]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক আইন জারির প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পোস্টার ও দেয়াল লিখন শুরু করে। দেয়াল লিখনগুলো ক্রমাগত মুছে ফেলা হচ্ছিল। দেয়াল থেকে সব পোস্টারও তুলে ফেলা হচ্ছিল। কিন্তু এর মধ্যেও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পাল্টা দেয়াল লিখন হয়। পোস্টারও পড়ে। ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর এই ধরনের পোস্টার লাগাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্র। পরে সামরিক আইন আদালত তাদের সাত বছর করে কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৯৮২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> সরকারী সূত্রের বরাত দিয়া গতকাল বাসস জানায়, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টারিং করার সময় যে ৩ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল ১নং সংক্ষিপ্ত সামরিক আইন-আদালত তাহাদিগকে ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী পোস্টার লাগাইবার সময় নিরাপত্তা প্রহরী এবং কর্তব্যরত পুলিশ এই ছাত্রদের গ্রেফতার করে। দণ্ডপ্রাপ্ত ছাত্ররা হইতেছে শিবলী কাইউম, হাবিবুর রহমান ও আবদুল আলী।[৫]

পোস্টার লাগাতে গিয়ে যারা গ্রেপ্তার হন তাদের মুক্তি চেয়ে প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলো একটি বিবৃতি দেয়। কিন্তু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকার তা পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে দেয়নি। পিআইডি থেকে সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে 'প্রেস অ্যাডভাইস' দেয়া হয়।[৬]

এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ছাত্র সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এরশাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৪টি ছাত্র সংগঠন ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা এরশাদবিরোধী বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। এই প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ হাননান উপরোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন:

> শত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরও ১৪টি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৪ সংগঠনের একটি বিবৃতি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে দেওয়া হয়। এরশাদ বিরোধী বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এটাই প্রথম বিবৃতি। বিবৃতিতে ছাত্রদের বৃহত্তর ঐক্যের আহ্বান জানানো হয়েছিল।[৭]

ক্ষমতা দখলের ছয় মাসের মধ্যেই হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকার নতুন একটি বিতর্কিত শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। সেই অনুযায়ী তার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খান শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। ১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এই শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়। পরদিন ২৪ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে এই শিক্ষানীতি ঘোষণার খবরে লেখা হয়:

> নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮২-৮৭ সালের জন্য নূতন শিক্ষানীতি ও কর্মসূচি ঘোষণা করিয়াছে। আগামী জানুয়ারি মাস হইতে এই নীতি বাস্তবায়ন শুরু হইবে। শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খান গতকাল শিক্ষানীতি ঘোষণা উপলক্ষে সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, নূতন শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষার চারটি স্তর থাকিবে।[৮]

১৪টি ছাত্র সংগঠন এ শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে। এ প্রসঙ্গে তারা একটি বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতিতে বলা হয়:

> ১৯৮২-৮৭ সালের জন্যে ঘোষিত নতুন শিক্ষানীতি ও কর্মসূচিতে প্রাথমিক শিক্ষার শুরুতেই দুটি বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। শিশু বয়সে একসাথে তিনটি ভাষা শেখানোর প্রচেষ্টা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়- শিশু মনোবিজ্ঞানের নীতিবিরোধীও বটে। এ ছাড়া নতুন শিক্ষানীতিতে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর মাধ্যমিক সার্টিফিকেট দেবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার ঔপনিবেশিক কাঠামো বজায় রেখে এ ধরনের নীতি গ্রহণ করা হলে অভিভাবকদের পক্ষে মৌলিক সার্টিফিকেট লাভের জন্য তাদের সন্তানদের দু'বছর বাড়তি পড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।[৯]

ছাত্রদের এরশাদবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হতে শুরু করে বিতর্কিত শিক্ষানীতি ঘোষণার পর থেকেই। আর সামরিক সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশি তৎপরতাও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৮২ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। জাসদ ছাত্রলীগের মিছিল থেকে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। তবে পরে ১৪টি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরাও পুলিশি তৎপরতা প্রতিরোধে অংশ নেয়। পরদিন ৯ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের অভ্যন্তরে একটি ছাত্র মিছিলকে কেন্দ্র করিয়া গতকাল সকাল সোয়া ১০টা হইতে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ছাত্র-পুলিশের উপর্যুপরি সংঘর্ষে পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও রাইফেলের কুঁদোর আঘাতে দেড়শত ছাত্র-শিক্ষক আহত হন।[১০]

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষেও এই ঘটনার দুই সপ্তাহের মধ্যে ১৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে উঠে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৮২ সালের ২১ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এর ঘোষণা দেয়া হয়। এই সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষানীতিকে কুখ্যাত সনদ অভিহিত করা হয় এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।[১১]

এরশাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলায় রাজনৈতিক দলগুলোকে শরিক করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকায় ছিল ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ সামরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সচিবালয় ঘেরাও করে। এই কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এক ব্যক্তি নিহত ও অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাসহ প্রায় দেড় হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> সোমবার ঢাকায় এক প্রেসনোটের বরাত দিয়ে বাসসর খবরে বলা হয়: তথাকথিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, যা ১৪টি রাজনৈতিক দলের ছাত্র শাখাগুলোর একটি সংমিশ্রণ- একথা ঘোষণা করেছিল যে তারা সরকারী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সচিবালয় অবরোধ করবে। বেলা ১১টায় তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয় এবং বক্তারা সামরিক আইন অগ্রাহ্য করে ছাত্রদের প্রতি তাদের নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়। ছাত্র নামধারী এই পেশাদার বিক্ষোভকারীদের প্ররোচনায় ছাত্ররা একটি মিছিল নিয়ে বেরোয় এবং তাও সামরিক আইনে নিষিদ্ধ।[১২]

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরদিন ১৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২৭ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। মঙ্গলবার ঢাকায় এক সরকারী ঘোষণায় এ কথা বলা হয়। অপর এক ঘোষণায় বলা হয়, মঙ্গলবার থেকে সমগ্র মেট্রোপলিটন ঢাকা এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা হতে সকাল ৬টা পর্যন্ত সান্ধ্যআইন বলবৎ থাকবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার অন্যান্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আগামী ২৭ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[১৩]

১৯৮৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার করা রাজনৈতিক নেতাদের একটি তালিকা সংবলিত খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল ঢাকা মহানগরীতে জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল এবং নগরীর কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া সরকারী তথ্য বিবরণীতে জানানো হইয়াছে। দেশের অবশিষ্ট এলাকায় বড় ধরনের কোন ঘটনার খবর পাওয়া যায় নাই। এদিকে সরকার কর্তৃক ঢাকায় গত ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারির ঘটনার সহিত জড়িত আটক রাজনৈতিক নেতা ও অন্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে।[১৪]

পরদিন ১৯৮৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে সরকারি প্রেসনোটের বরাত দিয়ে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়: সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সারা দেশে মোট ১৩৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয় যে, গত ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ সারা দেশে ১৩৩১ ব্যক্তিকে আটক করা হয়। উহার মধ্যে ১০২১ জনকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে ৩১০ জন আটক রহিয়াছে। চূড়ান্ত জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের পর যাহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নহে বলিয়া শনাক্ত হইবে তাহাদেরকেও ছাড়িয়া দেয়া হইবে।[১৫]

১৯৮৩ সালে এসে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে এরশাদবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল মিলে দুটি পৃথক রাজনৈতিক জোট গঠন করে। জোট দুটির একটি পনেরো দলীয় জোট এবং অপরটি সাত দলীয় জোট। পনেরো দলীয় জোটের শরিক দলগুলো ছিল: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (হাসিনা), গণআজাদী লীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (দেওয়ান ফরিদ গাজী), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর), ন্যাপ (হারুন), জাতীয় একতা পার্টি, জাসদ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল (নগেন) ও মজদুর পার্টি। আর সাত দলীয় জোটের শরিক দলগুলো ছিল : বিএনপি, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, ন্যাপ (আবু জাফর), ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, ইউপিপি (আরেফিন), ইউপিপি (সাদেক) ও জাতীয় লীগ। উভয় জোটের বেশ কিছু সংখ্যক নেতা এরশাদবিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বপক্ষ ত্যাগ করে এরশাদের সঙ্গে যোগ দেন।[১৬]

দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর জোটবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তাঁর দুরভিসন্ধির অংশ হিসেবে ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে দেশে ঘরোয়া রাজনীতি শুরুর অনুমতি দেয়া হয়। ১ এপ্রিল সংবাদপত্রে ঘরোয়া রাজনীতি শুরুর খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে লেখা হয়:

> ঘরোয়া রাজনীতির মাধ্যমে আজ পয়লা এপ্রিল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সীমিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হল। দেশের ৬০টি দলের মধ্যে প্রায় বিশটি দল আজই 'দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি' সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনার জন্যে জাতীয় বা নির্বাহী কমিটির বৈঠক ডেকেছে।[১৭]

তবে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দুরভিসন্ধি সফল হয়নি। ঘরোয়া রাজনীতি চালুর পর রাজনৈতিক জোট দুটির এরশাদবিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকে আরও সংগঠিত করার জন্য জোট হিসেবে আলাদা হলেও পনেরো দলীয় জোট ও সাত দলীয় জোট ১৯৮৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর অভিন্ন পাঁচ দফা দাবিনামা ঘোষণা করে। পরদিন ৩ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়:

> গতকাল ১৫ দল এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (সাত্তার) সহ সাত দল পৃথক দুটি বিবৃতিতে পাঁচ দফা অভিন্ন দাবীনামা ঘোষণা করেছে। দুটি বিবৃতিতেই এই পাঁচ দফা অভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী দাবী দিবস পালনের কথা বলা হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এসব দাবী পূরণ না হলে উক্ত দিনের সমাবেশে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।[১৮]

পনেরো ও সাত দলীয় জোটের অভিন্ন পাঁচ দফা দাবিসমূহ ছিল:

> ১. অবিলম্বে সামরিক আইনের শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
> ২. অবিলম্বে দেশে জনগণের সকল মৌলিক অধিকারসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে সকল বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে।
> ৩. নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে অন্য যে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই কেবলমাত্র সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সংবিধান সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে। অন্য কারো নয়।

> ৪. রাজনৈতিক কারণে আটক বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দণ্ডিত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।
> ৫. ১৯৮৩ সালের মধ্য-ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্রহত্যাসহ সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ যাবৎকাল ছাত্র-শ্রমিক রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হত্যার তদন্ত, বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি, নিহত-আহতদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক-ক্ষেতমজুরসহ সকলের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১৯]

৫ দফা আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের ২ সেপ্টেম্বরের ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর উভয় জোটের দাবি দিবস পালিত হয়। পরদিন ১ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[২০] ১৯৮৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের ঘোষণা অনুযায়ী পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১ নভেম্বর পনেরো দলীয় জোটের বিক্ষোভ দিবস ও সাত দলীয় জোটের প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ২ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পনেরো দলীয় জোটের খবরে লেখা হয়:

> গতকাল বিকালে স্টেডিয়াম গেটে ১৫ দলের এক বিরাট জনসভায় আগামী ৮ই নভেম্বরের মধ্যে সামরিক আইন প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়। এ সময়ের মধ্যে উক্ত দাবী পূরণ না হলে ১৫ দল তা আদায়ের উদ্দেশ্যে পুনরায় প্রত্যক্ষ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করবে বলে জনসভায় ঘোষণা করা হয়।[২১]

অন্যদিকে সাত দলীয় জোটের খবরটিতে লেখা হয়:

> মঙ্গলবার সাত দল আহূত নওয়াব ইউসুফ মার্কেটের গণসমাবেশে নেতৃবৃন্দ গতকালের হরতালকে বর্তমান শাসনের প্রতি জনগণের অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন। সাত দলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকালের হরতালকে পাঁচ দফা দাবীর পক্ষে গণরায় বলে উল্লেখ করে বলেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে সরকার এই পাঁচ দফা দাবী মেনে না নিলে সাত দল আরো কঠোর এবং ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করবে।[২২]

উভয় রাজনৈতিক জোটের চাপের মুখে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১৪ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে আংশিক দাবি মানার নাম করে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে ওই দিন থেকেই প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর অনুমতি প্রদান করেন। পরদিন ১৫ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ ১৯৮৪ সালের ২৪ শে মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং একই বছর ২৫ শে নভেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এখন থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেয়ার কথাও ঘোষণা করেন। জেনারেল এরশাদ গত সন্ধ্যায় বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে এই ঘোষণা দেন।[২৩]

বিরোধী রাজনৈতিক দলের আন্দোলন প্রশমনের জন্য হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৮৪ সালের শুরুতে এই লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু হয়। পনেরো দলীয় জোট, সাত দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী ছাড়া বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি ২৭মে একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

> প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ আগামী ২৭ মে একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস হইতে অবাধ রাজনীতির অনুমতি প্রদান করা হইবে বলিয়াও তিনি জানান। গতকাল সন্ধ্যায় রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, ৫২টি রাজনৈতিক দলের ২৯৯ জন নেতার সঙ্গে মাসব্যাপী তাহার সংলাপের ভিত্তিতেই একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।[২৪]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসেবে ১৯৮৪ সালের ২৮ মার্চ আলোচনায় বসার জন্য পনেরো ও সাত দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীকে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৮৪ সালের ২৫ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[২৫] পরে ১৯৮৪ সালের এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে দুই রাজনৈতিক জোট ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সংলাপে উভয় জোট তাদের ৫ দফা দাবির ব্যাপারেই প্রাধান্য দেয় এবং গুরুত্ব আরোপ করে।

সংলাপের পর ১৯৮৪ সালের ১২ মে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। এই ভাষণে উভয় জোটের পাঁচ দফা দাবি সম্পর্কে কোনো ঘোষণা ছিল না। পরদিন ১৩ মে সংবাদপত্রে খবরটি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই খবরে লেখা হয়:

> প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ চলতি বছরের শীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এই নির্বাচনের তারিখ ও তফসিল নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবে।[২৬]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের এই ভাষণে পাঁচ দফা দাবির প্রতিফলন না ঘটায় উভয় জোট তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮৪ সালের ১৯ মে পনেরো ও সাত দলীয় জোট সর্ব প্রথম সংসদ নির্বাচন ও সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ পাঁচ দফা দাবি আদায়ের জন্য এরশাদবিরোধী যুগপৎ আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। দুই জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। ২০ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়:

> গতকাল পনের ও সাত দলীয় ঐক্যজোটের লিয়াজোঁ কমিটির এক বৈঠকে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন ও সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুগপৎভাবে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী অব্যাহত রাখার প্রশ্নে উভয় জোটের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ভবিষ্যৎ সংসদ ও সরকার কাঠামোর প্রশ্নে উভয় জোটের নেতাদের মধ্যে বিস্তৃত ও খোলাখুলি আলোচনা হয় ও এই ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছার লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে উভয়পক্ষ একমত হয়।[২৭]

দুই জোটের লিয়াজোঁ কমিটির এই সিদ্ধান্তের পর পুনরায় এরশাদবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনের মধ্যেই ১৯৮৪ সালের ৩ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের তফসিল ঘোষণা করে। তফসিল অনুযায়ী ৮ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। ১৯৮৪ সালের ৪ অক্টোবর উভয় জোটের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, পাঁচ দফা দাবি না মানা হলে তারা নির্বাচনে যাবেন না। ঘোষিত নির্বাচন প্রতিরোধ করার জন্য ১৯৮৪ সালের ১৩ অক্টোবর দুই জোট ২৭ অক্টোবর থেকে প্রতিরোধ পক্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। উভয় জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়।[২৮]

বিরোধী দুই রাজনৈতিক জোটের আন্দোলন কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে ১৯৮৪ সালের ২৭ অক্টোবর নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে সরকার। পরদিন ২৮ অক্টোবর সংবাদপত্রে লেখা হয়:

> ৮ই ডিসেম্বর নির্ধারিত সংসদ নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। শনিবার (২৭ অক্টোবর) এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয় : দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সংসদ নির্বাচন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৯]

পরে বিরোধী দুই জোটের পাঁচ দফা দাবির বিপরীতে ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচিতে ১৯৮৫ সালের এপ্রিলের প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচনেরও ঘোষণা দেন তিনি। জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে এই ঘোষণা দেয়া হয়। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এ বিষয়ক খবরে লেখা হয়:

> প্রেসিডেন্ট এরশাদ আগামী এপ্রিলের প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। প্রেসিডেন্ট দেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসন এবং গণতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে ৫ দফা কর্মসূচীও ঘোষণা করেছেন। বিজয় দিবস উপলক্ষে শনিবার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে রেডিও ও টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট তার এই কর্মসূচী ঘোষণা করেন।[৩০]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ঘোষিত উল্লেখিত পাঁচ দফা কর্মসূচিতে দুই রাজনৈতিক জোটের পাঁচ দফা দাবি পূরণ না হওয়ায় তারা আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। দুই জোট তাদের পূর্ব ঘোষিত ১৯৮৪ সালের ২২ ও ২৩ ডিসেম্বরের হরতাল কর্মসূচি যথারীতি বহাল রাখে। এই প্রেক্ষাপটে ২০ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক আইন আদেশ জারি করে ২২ ও ২৩ ডিসেম্বরের হরতালসহ সব রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৮৪ সালের ২০ ডিসেম্বর পুনরায় সামরিক আইন আদেশ জারির মাধ্যমে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণার সমালোচনা করে পনেরো ও সাত দলীয় জোট। সরকারের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখেও ১৯৮৪ সালের ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর দুই রাজনৈতিক জোটের আহ্বানে সারাদেশে ৪৮ ঘণ্টা একটানা হরতাল পালিত হয়। হরতাল পালনের এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন তীব্র করার জন্য দুই জোট অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিপরীত দিকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করেন ১৯৮৪ সালের ২৯ ডিসেম্বরের এক জনসভায়। ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জেলা সামরিক আইন প্রশাসক ও উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দপ্তর এবং ১৯৮৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর বিলুপ্ত করা হয়। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তৎপরতাও সরকার অব্যাহত রাখে। ১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে এক ভাষণের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার ঘোষণা

দেন। কিন্তু বিরোধী দুই জোট তাদের পাঁচ দফা দাবি পূরণ না হওয়ায় সরকার ঘোষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। জামায়াতে ইসলামীও একই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে।[৩১]

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের এরশাদবিরোধী আন্দোলনের এই পর্যায়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি তৈরি করার জন্য গণভোটের আয়োজন করে। ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া এবং তার নীতি ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা যাচাইয়ের জন্য ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে এই ভাষণে তিনি পুনরায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক, জেলা সামরিক প্রশাসকের পদ ও সামরিক আইন আদালত পুনর্বহাল করেন। পরদিন ২ মার্চ এই বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ২১ শে মার্চ সারা দেশে জনমত যাচাই করা হবে। প্রেসিডেন্টের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা সে সম্পর্কে জনগণ ২১ শে মার্চ রায় দেবেন।[৩২]

অপর এক খবরে লেখা হয়:

> রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এরশাদ দেশে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি গতরাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, এই ব্যাপারে এখন থেকে সামরিক আইনের বিধানসমূহ কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হবে।[৩৩]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের ১ মার্চেই নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। অন্যদিকে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ অনুষ্ঠিত বিতর্কিত গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অবস্থান এবং তার নীতি ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা অর্জন করেন। গণভোটের পরও বিরোধী রাজনৈতিক জোটদ্বয় ও জামায়াতে ইসলামীর এরশাদবিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতি চালু করার অনুমতি সংক্রান্ত ঘোষণা দেন। সেই

অনুযায়ী ১ অক্টোবর আবার ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হয়। ঘরোয়া রাজনীতি চালু হওয়ার দেড় মাস পর ১৯৮৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ঘোষণা করেন যে, ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পুনরায় প্রকাশ্য রাজনীতি চালু হবে। সেই অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতিও চালু হয়। একই দিন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের তত্ত্বাবধানে সরকারী দল হিসেবে জাতীয় পার্টিও আত্মপ্রকাশ করে। ১ জানুয়ারি এই সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রকাশ্য রাজনীতি শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আবার দুই জোট ও জামায়াতে ইসলামীর এরশাদবিরোধী আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়। বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল আন্দোলন অব্যাহত রাখলেও ১৯৮৬ সালের ২ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পুনরায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ভাষণে তিনি বলেন, বিরোধী দল অংশ নিলে নির্বাচন-প্রার্থী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন, আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ও তার নিচের সব পদ বিলুপ্ত হবে এবং সামরিক আদালতও থাকবে না।[৩৪]

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ভাষণ সম্পর্কে পনেরো ও সাত দলীয় জোটের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ৪ মার্চের সংবাদপত্রে। এতে লেখা হয়:

> সাত দলীয় ঐক্যজোট প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে গতকাল ৩ মার্চ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছে, জাতি এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে জোট ঘোষিত নির্বাচন মেনে নিতে পারে না। পনের দল রোববার ২ মার্চ রাতেই প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, প্রেসিডেন্টের ভাষণ অস্পষ্ট এবং অর্থবহ নয়।[৩৫]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ভাষণ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীও দুই জোটের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১৯৮৬ সালের ৫ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[৩৬]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নির্বাচন সংক্রান্ত ঘোষণা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পর এরশাদবিরোধী আন্দোলন প্রশ্নে দুই জোটের শীর্ষ নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে দুইবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ১০ মার্চ এবং দ্বিতীয় বৈঠক হয় তিনদিন পর ১৩ মার্চ। সংবাদপত্রে তাদের বৈঠকের খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রে প্রথম বৈঠকের খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ১১ মার্চ। এতে লেখা হয়:

> বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ১০ মার্চ রাতে ঢাকার বনানীর একটি বাড়িতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে চার

> ঘণ্টাব্যাপী আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার কথা স্বীকার করেন। আজ কক্সবাজারে এই ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, দেশ ও জনগণের জন্য এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে এই আলোচনা হয়।[৩৭]

১৪ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত দ্বিতীয় বৈঠকের খবরে লেখা হয়:

> দুই বিরোধী রাজনৈতিক জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা ওয়াজেদ গতকাল ১৩ মার্চ রাতে পুনরায় বৈঠকে মিলিত হন। পাঁচ দিনের মধ্যে এটি তাদের দ্বিতীয় দফা বৈঠক। তবে কোথায় তারা বৈঠকে বসেছিলেন কোন সূত্র থেকেই তা জানানো হয়নি।[৩৮]

কিন্তু নির্বাচন প্রশ্নে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে হঠাৎ দুই জোট দ্বিধা-বিভক্ত হয়। এই দ্বিধা-বিভক্তির কারণ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পনেরো দলীয় জোটের শরিক আটটি সংগঠনের অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পনেরো দলের শরিক আটটি দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮৬ সালের ১৯ মার্চ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) একটি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে। পরদিন ২০ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের দুই বিরোধী জোট ১৫ দল ও ৭ দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে তিনশ' আসনেই প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনকে গণভোটে পরিণত করা ও নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল ১৯ মার্চ বিকালে পল্টনে সিপিবি ঢাকা মহানগরী শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় বলা হয় উভয় জোটের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা প্রয়োজন।[৩৯]

সিপিবির এই আহ্বানের একদিন পর ১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ওই রাতের মধ্যেই (২১ মার্চ) রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া এবং নির্বাচনবিরোধী সব কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে মনোনয়নপত্র পেশের সময় বৃদ্ধি, নির্বাচনের তারিখ পেছানো, মনোনয়নপ্রার্থী মন্ত্রীদের পদত্যাগসহ চারটি পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দেন। পরদিন ২২ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[৪০] ১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের উল্লিখিত ভাষণের অব্যবহিত পরেই পনেরো দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল সিপিবি নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য পুনরায় পনেরো ও সাত দলীয় জোটের প্রতি আহ্বান জানায়। একইদিন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[৪১]

এই প্রেক্ষাপটে পনেরো দলীয় জোটের সভায় শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২২ মার্চেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরে লেখা হয়:

> পনের দল আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতরাতে কেন্দ্রীয় ১৫ দলের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ধানমন্ডি ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে ১৫ দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪২]

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।[৪৩] অন্যদিকে সাত দলীয় জোট এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২২ মার্চেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরে লেখা হয়:

> ৭ দলীয় জোটের সভাশেষে রাত ৩টা ১০ মিনিটে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। জনগণের মৌলিক অধিকার, সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং সামরিক আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের দণ্ডাদেশ মওকুফ, রাজনৈতিক মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করলে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ৭ দলীয় ঐক্যজোট নির্বাচনে যেতে পারে।[৪৪]

পনেরো দলীয় জোটের শরিক পাঁচটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের জোটগত সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিল। এই বিরোধের প্রেক্ষাপটেই শেষ পর্যন্ত পনেরো দলীয় জোট থেকে পাঁচটি দল বেরিয়ে এসে পাঁচ দলীয় জোট গঠন করে। নির্বাচনে পনেরো দলীয় জোটের অংশগ্রহণ প্রশ্নে ১৯৮৬ সালের ২৩ মার্চ পাঁচ দলের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এতে লেখা হয়:

> পনের দলের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি রাজনৈতিক দল ছাত্র-শ্রমিক-আইনজীবী প্রভৃতি শ্রেণী, পেশা ও সংস্থাসমূহের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যাপারে ২২ দলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত প্রকাশের জন্য ১৫ ও ৭ দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণের প্রেক্ষিতে ১৫ দলের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বলা হয়, রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রেক্ষিতে ১৫ দল নির্বাচন সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছে সে সম্পর্কে আমরা ঐ বৈঠকেই আমাদের সুস্পষ্ট নীতিগত বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছি।[৪৫]

এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে পনেরো দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নেয় দলের সভাপতি শাজাহান সিরাজ এবং বিপক্ষে

অবস্থান নেন হাসানুল হক ইনু। তারা পৃথক বিবৃতি দিয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[৪৬] সাত দলীয় জোট ও পাঁচ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ১৯৮৬ সালের ৩ এপ্রিল পুনরায় পাঁচ দফা ভিত্তিক আন্দোলনের জন্য নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৪৭] অন্যদিকে পনেরো দলীয় জোটের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৮টি দল নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়।[৪৮]

১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সরকারী রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫২টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে এই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, হাঙ্গামা ও গোলযোগের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী আট দলীয় জোট, সাত দলীয় জোট, পাঁচ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী আবার আলাদা আলাদাভাবে এরশাদবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক জোটসমূহ ও জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন যখন ধীরে ধীরে আবার দানা বাঁধতে শুরু করছে তখন ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন ১৫ অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলগুলো এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের দাবি উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আয়োজনের প্রতিবাদে রাজনৈতিক জোট দলসমূহ ১৯৮৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আলাদা আলাদাভাবে সমাবেশ করে এবং এই সমাবেশগুলো থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা ও এই নির্বাচনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন করার জন্য ১৯৮৬ সালের ১৩ অক্টোবর আট দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ও সাত দলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়াকে নিজ নিজ বাসভবনে অন্তরীণ করে রাখা হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জয়লাভ করেন। তবে এই নির্বাচনে ভোটারদের নগণ্য উপস্থিতি ও ব্যাপক কারচুপির তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহ ১৯৮৬ সালের ২৩ অক্টোবর 'কালো দিবস' পালন করে এবং এই দিবস উপলক্ষ্যে জোট ও দলগুলো আলাদা আলাদা সমাবেশ থেকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। অন্যদিকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয়

সংসদে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাসের ধারাবাহিকতায় ওইদিনই এরশাদ সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন। পরের বছর ১৯৮৭ সালের ২৪ মার্চ আড়ম্বরপূর্ণভাবে এরশাদ তার ক্ষমতা দখলের পাঁচ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করেন। ক্ষমতা দখলের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চ এক বাণীতে এরশাদ তার বিভিন্ন সাফল্য গাথা তুলে ধরেন। বিপরীত দিকে ১৯৮৭ সালের ২৪ মার্চ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলের দিনটিকে 'কালো দিবস', 'বিক্ষোভ দিবস' ও 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করে বিরোধী তিন রাজনৈতিক জোট ও জামায়াতে ইসলামী।[৪৯]

১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোট এরশাদবিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের প্রশ্নে পুনরায় তিন জোটের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালের ১৮ জুন। এই খবরে লেখা হয়:

> আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ আট দল, সাত দল এবং পাঁচ দলীয় জোটের শরিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌঁছেছে।[৫০]

তিন রাজনৈতিক জোট হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এরশাদবিরোধী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে এই আন্দোলন তীব্রতর হয়। নভেম্বরের এই আন্দোলনের প্রক্রিয়া শুরু হয় আগস্ট মাস থেকেই। ১৯৮৭ সালের ১৭ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় তিন রাজনৈতিক জোট ৭ আক্টোবর 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। তিন জোটের কর্মসূচির সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীও একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এই খবরে লেখা হয়:

> পাঁচ দল, সাত দল, আট দল ও জামায়াতে ইসলামী ৭ই অক্টোবর 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। সরকারের পদত্যাগ দাবীতে সারা দেশ থেকে রাজধানীতে লোক আনার জন্য দেড় মাসের বেশি প্রস্তুতি কর্মসূচীও দেয়া হয়েছে। অভিন্ন অবরোধ কর্মসূচীতে পাঁচ দল, সাত দল ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আট দলের কিছু অমিল রয়েছে।[৫১]

পরে অবশ্য 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচি ৭ অক্টোবরের পরিবর্তে ১০ নভেম্বর করা হয়। সরকারবিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহের আহূত ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি প্রতিহত করার ব্যবস্থা নেয়। সংবাদপত্রে এর নজির দেখা যায়, ১৯৮৭ সালের ২৪ অক্টোবর জারি করা এক প্রেসনোটের মাধ্যমে। ২৫ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই প্রেসনোটে লেখা হয়:

> গতকাল শনিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ইংরেজী ভাষায় একটি প্রেসনোট জারি করা হয়েছে। প্রেসনোটে বলা হয়: 'সরকার উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছেন যে, কয়েকটি রাজনৈতিক দল ঢাকা ও দেশের অন্যান্য স্থানে 'ঘেরাও' এবং 'অবরোধ' করার হুমকি দিচ্ছে। এ ধরনের হুমকির খবর সংবাদপত্রেও ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। যারা এই ধরনের 'ঘেরাও' ও 'অবরোধ' সংগঠন ও অংশগ্রহণে জড়িত এবং যারা এ ধরনের বেআইনী তৎপরতা প্রচার করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।[৫২]

তবে সরকারি প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করেই ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বরের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচির প্রস্তুতি চলতে থাকে। এই কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ২৮ অক্টোবর আট দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ও সাত দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আকস্মিকভাবে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে তারা এক যুক্ত বিবৃতিতে এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে ১০ নভেম্বরের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিসহ সকল কর্মসূচি ঐক্যবদ্ধভাবে সফল করার ঘোষণা দেন। পরদিন ২৯ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

> শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে গতকাল রাতে বৈঠক হইয়াছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বিএনপি চেয়ারম্যান ও ৭ দলীয় নেত্রীর মধ্যে মধ্যে ৫৮ মিনিটব্যাপী রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর এক যুক্ত বিবৃতিতে 'সরকারের পতনের লক্ষ্যে আগামী ১লা ও ১০ই নভেম্বরের কর্মসূচিসহ সকল কর্মসূচি ঐক্যবদ্ধভাবে সফল করিয়া তোলার' কথা ঘোষণা করা হয়।[৫৩]

সরকারি প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহ আহূত ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। ওইদিন ঢাকায় ব্যাপক হাঙ্গামা হয়। ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে পুলিশি নির্যাতন ও পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের আহ্বানে ১৯৮৭ সালের ১১ থেকে ১৭ নভেম্বর, ২১ থেকে ২৪ নভেম্বর এবং ২৯ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। সরকারও বিরোধী জোট ও দলসমূহের আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এর অংশ হিসেবে দুই রাজনৈতিক জোটের শীর্ষ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে ১৯৮৭ সালের ১১ নভেম্বর অন্তরীণ করা হয়। বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৭ সালের ১২ নভেম্বর জারি করা এক প্রেসনোটে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয় এবং নাশকতামূলক কাজের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি

মৃত্যুদণ্ড উল্লেখ করা হয়। বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের আন্দোলন বন্ধ করার লক্ষ্যে দমন-পীড়নের পাশাপাশি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সমঝোতার প্রস্তাব দেন। এই জন্য ১৯৮৭ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে এরশাদবিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতি রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার আহ্বান জানান। এই ভাষণে বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য চারটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও দেন। ১৯৮৭ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণের ধারাবাহিকতায় নতুন জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১৯৮৭ সালের ১০ ডিসেম্বর দুই জোটের শীর্ষ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেয়া হয়। ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় ১৯৮৭ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে। কিন্তু এরশাদের এই সব আপোস উদ্যোগ বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের আন্দোলনকে স্তিমিত করতে পারেনি। ১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি সরকারের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা বা মতবিনিময় না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণার ধারাবাহিকতায় চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। তিন রাজনৈতিক জোট এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৮৮ সালের ৩ জানুয়ারি তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সভায় নির্বাচন প্রত্যাখ্যান ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[৫৪]

এরশাদবিরোধী আন্দোলনের এই পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী একটি প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হয় এবং তিন রাজনৈতিক জোটের চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ এই ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়। ১৯৮৮ সালের ২০ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত খবরে লেখা হয়:

> গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক সভায় দেশ ও সমাজ-জীবনে গণতান্ত্রিক নীতিমালার স্থায়ী প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে আন্দোলনরত সকল গণতান্ত্রিক শক্তি, তিন জোট ও বিশেষভাবে দুই নেত্রীর মধ্যে কর্মসূচিগত দৃঢ় ঐক্য কামনা করা হয়। আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় গৃহীত ঘোষণায় গণতন্ত্রের দাবীতে ও জাতির দুর্গতি মোচনের লক্ষ্যে পেশাজীবীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলা হয়, চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।[৫৫]

পরে ১৯৮৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পেশাজীবীদের এক সমাবেশে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করা হয়। এই সমাবেশে ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৮৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে পেশাজীবী দাবি দিবস পালিত হয়। এই দাবি দিবসে পেশাজীবীরা আন্দোলনরত রাজনৈতিক জোটসমূহকে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। পেশাজীবীদের এরশাদবিরোধী আন্দোলন কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের ১৭ মার্চ সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[৫৬]

নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের একের পর এক হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের পরও ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনেও সরকারি দল জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। নির্বাচনে স্বল্প ভোটারের উপস্থিতি এবং ব্যাপক কারচুপি ও হাঙ্গামার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের ৪ মার্চ। নির্বাচনের পর ১৯৮৮ সালের ১০ মার্চ তিন রাজনৈতিক জোট এরশাদবিরোধী আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। পরদিন ১১ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি সরকারকে পদত্যাগ করানোর লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার ১০ মার্চ লিয়াজোঁ কমিটির সভায় আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।[৫৭]

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সংবিধান নিয়ে আটদলীয় জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা এবং সাতদলীয় জোট নেত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার জন্য ১৯৮৮ সালের ১১ মে জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। একে সংবিধানের (অষ্টম সংশোধনী) বিল ১৯৮৮ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহ এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় যা ১৯৮৮ সালের ১২ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রতিবাদকে উপেক্ষা করেই ১৯৮৮ সালের ৭ জুন রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিল জাতীয় সংসদে পাস হয়। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার জন্য সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিল পাসের প্রতিবাদে তিন রাজনৈতিক জোট পৃথক কর্মসূচি ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৮৮ সালের জুন মাসে দুই রাজনৈতিক জোটের শীর্ষনেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার পরস্পরবিরোধী বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এরশাদবিরোধী আন্দোলন হঠাৎ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৮ সালের ১৪ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ

সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রসহ মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত মূল্যবোধ এই দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। বিবৃতিতে তিনি ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে ১৯৮৮ সালের ১৩ জুন বিএনপির চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া এক জনসভায় ১৯৮৮ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচন দাবি করেন। দুই নেত্রীর পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে দেয়া এক বিবৃতি ১৯৮৮ সালের ১৫ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে অহেতুক সংবিধানের বিতর্ক টেনে না এনে এরশাদবিরোধী আন্দোলনকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।[৫৮]

১৯৮৮ সালের জুন থেকে পরবর্তী প্রায় দুই বছর তিন রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহ বিচ্ছিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এরশাদবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময় আবার তিন রাজনৈতিক জোটের ঐক্যবদ্ধ এরশাদবিরোধী আন্দোলন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯০ সালের ২৯ জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে লেখা হয় :

> গতকাল ২৮ জুন আট দল, সাত দল, পাঁচ দল, ছয় দল, জামায়াতে ইসলামী, ভাসানী ন্যাপ, মুসলিম লীগ, জাগপা, সাম্যবাদী দল, কমিউনিস্ট লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দল সরকারের পদত্যাগের দাবীতে আগামী ২৯ শে জুলাই দেশব্যাপী 'গণবিক্ষোভ দিবস' পালনের যুগপৎ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।[৫৯]

১৯৯০ সালের শেষ দিকে আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকেন। বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে এরশাদবিরোধী আন্দোলন জোরদার করে। ১৯৯০ সালের ২ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয় : ডাকসু আয়োজিত এক ছাত্র কনভেনশনে সরকারের কাছে ১২ দফা দাবি পেশ করা হয়েছে এবং দাবি আদায়ের জন্য মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।[৬০]

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জেহাদ নিহত হলে ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জেহাদের মরদেহ সামনে রেখে ২৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন করা হয়। ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি এরশাদবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৯০ সালের ১৩ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> গতকাল ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে বক্তাগণ ছাত্র সমাজের মত বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে কোন বিভেদ ছাত্র-জনতা মেনে নেবে না।[৬১]

ছাত্র সংগঠনগুলোর আহ্বানের প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ সালের ১৬ অক্টোবর তিন রাজনৈতিক জোট এরশাদবিরোধী আন্দোলনে আবার অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৭ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> আট দল, সাত দল ও পাঁচ দলসহ বিভিন্ন বিরোধী জোট ও রাজনৈতিক দল চলমান আন্দোলনের পরবর্তী অভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। মঙ্গলবার ১৬ অক্টোবর অর্ধদিবস হরতাল পালন শেষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জোট ও দলের সমাবেশে এই অভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।[৬২]

এরপর উপর্যুপরি হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তিন রাজনৈতিক জোটের এরশাদবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর তিন জোট এরশাদ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণা করে। ২০ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই রূপরেখা প্রকাশিত হয়।[৬৩] নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণার পর তিন রাজনৈতিক জোট এরশাদ সরকারের পতনের আন্দোলন জোরদার করে। এইজন্য ১৯৯০ সালের ২১ নভেম্বর তিন জোট অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২২ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই কর্মসূচির খবরে লেখা হয়:

> আট দল, সাত দল, পাঁচ দল, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন জোট ও দল আগামী ২৬ শে নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আহূত হরতালের প্রতি সমর্থন এবং আগামী ১০, ১১ ও ১২ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। সরকারের অপসারণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে তিন জোট ঘোষিত অভিন্ন রূপরেখার ভিত্তিতে চলমান আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে এই কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।[৬৪]

১৯৯০ সালের ২৬ নভেম্বর ছিল সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আহূত পূর্ব নির্ধারিত হরতাল কর্মসূচি। কিন্তু সংগঠনবিরোধী কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কয়েক নেতাকে বহিষ্কার করাকে কেন্দ্র করে ২৪ ও ২৫ নভেম্বর হঠাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পূর্ব নির্ধারিত হরতালের দিন ২৬ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক হাঙ্গামা হয়। পরদিন ২৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকালও (২৬শে নভেম্বর) প্রচণ্ড গোলাগুলী হয়েছে। গুলীতে নিমাই (১৮) নামে একজন যুবক নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও সাতজন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য অভিযোগ করেছে যে গাড়ির আরোহী সশস্ত্র যুবকরা ছিল জতীয়তাবাদী ছাত্রদলের 'নীরু-অভি' গ্রুপের সমর্থক।[৬৫]

ঐদিনই অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ২৬ নভেম্বরেই সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সরকার পতনের লক্ষ্যে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

> সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পয়লা ডিসেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। কর্মসূচীতে রয়েছে দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন, ঘেরাও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-বাসাবাড়ী ও যানবাহনে কালো পতাকা উত্তোলন, ঢাকায় শহীদ পরিবারের সমাবেশ।[৬৬]

অন্যদিকে ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত তিন রাজনৈতিক জোটের এক বিবৃতিতে ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর ৭২ ঘণ্টার পূর্বনির্ধারিত অবরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের পদত্যাগ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানানো হয়। এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল ২৬ নভেম্বর সিপিবি কার্যালয়ে তিন জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বৈঠকে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া আগামী ১০ হইতে ১২ ডিসেম্বর সারা দেশে ৭২ ঘণ্টার সর্বাত্মক অবরোধসহ সকল কর্মসূচী সফল করিয়া তোলার মাধ্যমে সরকারের পদত্যাগ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানানো হয়।[৬৭]

১৯৯০ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এরশাদবিরোধী আন্দোলন দ্রুত ব্যাপকতা লাভ করে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা দেশে। গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। গণঅভ্যুত্থান ঠেকাতে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ২৭ নভেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। কিন্তু জরুরি অবস্থা গণঅভ্যুত্থান ঠেকাতে পারেনি।

তিন জোটের যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বেসামাল হয়ে পড়ে স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের সরকার। জাতীয় পার্টি, ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত সন্ত্রাসী, এলাকার মাস্তান, গুণ্ডা বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে সরকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার কৌশল অবলম্বল করে। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সর্বত্রই তখন সরকার এবং বিরোধী জোট ও দলসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ মুখোমুখি আকার ধারণ করে। বিশেষত ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে হয়রানি, হলের রুমে রুমে আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা তখন অস্থির হয়ে উঠে। ২৭ নভেম্বর বিএমএ এর যুগ্ম সম্পাদক ডা.

শামসুল আলম খান মিলনসহ কয়েকজন নেতা কলেজের দিকে আসার পথে সন্ত্রসীদের গুলিতে আহত হন। ডা. মিলন সেই গুলিতেই হাসপাতালে মারা যান। সেই রাতেই হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। কিন্তু জরুরি অবস্থা ও কারফিউ সেই রাত থেকেই অমান্য করা শুরু হয়। ঢাকা-চট্টগ্রামসহ সর্বত্র পুলিশের সাথে ছাত্র-ছাত্রী এবং জনতার সংঘর্ষ বেধে যায়। একই সঙ্গে জরুরি অবস্থা জারির প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পদত্যাগের ঘোষণা প্রদান করেন, প্রশাসনের ভেতরে অনেক ক্যাডার কর্মকর্তাই তখন সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ করে পদত্যাগের হুমকি প্রদান করেন। কার্যত দেশে জরুরি আইন, কারফিউ ইত্যাদি অচল হয়ে পড়ে। ৩ ডিসেম্বর সচিবালয়ে প্রকাশ্যে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখন আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার ঘোষণা প্রদান করে যান। শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া অন্তরীণ অবস্থায় থেকেও নানাভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।[৬৮]

১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে সংবাদপত্রে আন্দোলনের খবর প্রকাশের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত অবিরাম ধর্মঘট শুরু করেন।[৬৯] ধর্মঘটের ফলে ২৮ নভেম্বর থেকে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। একটানা আটদিন দেশে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।

গণঅভ্যুত্থানের মুখে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর রাতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পর উল্লাসে ফেটে পড়ে সারা দেশের মানুষ। জনতার এই উল্লাস ও বিজয়-উৎসব চলতে থাকে কয়েকদিন ধরে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিজয় মিছিল বের করে ঘটনার ধারাবাহিকতায়। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার ঘোষণার পর ৫ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোট প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে সর্বসম্মতভাবে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেন। ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পরই ৬ ডিসেম্বর থেকে তিন জোট আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করে। ৭ ডিসেম্বর তিন জোটের যৌথ সভায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। এরপর বিভিন্ন মহল থেকে এই

দাবি সোচ্চার হয়। অবশেষে ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে অন্তরীণ করা হয় এবং তার ১৫ জন সহযোগীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে তারা বিচারের সম্মুখীন হন।[৭০]

দীর্ঘ নয় বছরের লাগাতার গণআন্দোলন এবং নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯৯০ সালে এসে তা ব্যাপকতা লাভ করে। শেষ পর্যন্ত তা গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এরশাদবিরোধী দীর্ঘ আন্দোলনে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এ প্রসঙ্গে ড. মঞ্জুরে খোদা লিখেছেন:

> আন্দোলনে প্রায় ৩৭০ জন জীবন দিয়েছিলেন। পঙ্গু-গুম হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। হরতাল হয়েছিল প্রায় ১ বছর ৩২৮ দিন। অবরোধ হয়েছিল ৭০ দিন। জাতীয় সম্পদ ও আর্থিক ক্ষতিও হয়েছিল প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার।[৭১]

গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে বিবৃতি:

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ নির্বাচিত একটি সরকারকে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেই তিনি সামরিক আইন জারি করেন। সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ক্ষমতা দখল করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি কথা রাখেননি। বরং বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার অপচেষ্টা চালান। সুবিধাবাদীদের নিয়ে নিজেই রাজনৈতিক দল গঠন ও প্রহসনের নির্বাচন করেন। দুর্নীতি-লুটপাটের মচ্ছব চালান। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করেন। ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হত্যা-খুন-গুম-দমন-পীড়নের রাজনীতিতে নিজেকে বিশ্ব বেহায়ায় পরিণত করেন। তবে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সংবাদপত্র যেহেতু শক্তিশালী গণমাধ্যম, তাই স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রে চলমান ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলনের পাশাপাশি সমকালীন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিফলন ঘটে। একই সঙ্গে সেই ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রের মতামতের প্রতিফলন ঘটে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠারও প্রতিফলন ঘটে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে নানা ধরনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকীয় প্রকাশিত

হয়েছিল। এমনকি পাঠকের চিঠিও প্রকাশিত হয়েছিল। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন কেমন ছিল, সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপন-প্রবণতা কেমন ছিল, সম্পাদকীয় মতামতের মাধ্যমে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ইস্যুতে সংবাদপত্রগুলো কী ভূমিকা রেখেছিল, চিঠির মাধ্যমে জনমতের কী ধরনের প্রতিফলন ঘটেছিল– এই প্রেক্ষাপট ও গবেষণা সমস্যাকে সামনে রেখে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

চারটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়:

এক. সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন যাচাই করা।

দুই. সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী খবরের উপস্থাপন-প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।

তিন. সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ ও কলাম বিশ্লেষণ করা।

চার. সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঠকের চিঠি বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা প্রশ্ন:

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে এই গবেষণাকর্মের জন্য নিচে উল্লেখিত গবেষণা প্রশ্ন নির্ধারণ করা হয়:

এক. ঘটনার গুরুত্বের কারণে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সংশ্লিষ্ট খবরের মাধ্যমে সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল কি?

দুই. সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল কি?

তিন. সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট খবর ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল কি?

চার. সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর একাধিক দিন গুরুত্ব পেয়ে থাকলে সে বিষয়ে একাধিক দিন একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল কি?

পাঁচ. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট ঘটনার বিশেষত্বের কারণে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল কি?

ছয়. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছিল কি?

তথ্য সূত্রঃ

১. ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, গণআন্দোলন ১৯৮২-৯০: পটভূমি, অ্যালবাম: গণআন্দোলন: ১৯৮২-৯০ (সম্পাদক: ইউসুফ মুহম্মদ), চট্টগ্রাম: তোলপাড়, এপ্রিল ১৯৯৩, পৃ. ১৭।

২. ড. মোহাম্মদ হাননান, *হাজার বছরের বাংলাদেশ : ইতিহাসের অ্যালবাম*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৬৮।

৩. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদের সময়কাল*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ. ১

৬. ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

৭. ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ. ১

৯. *ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫*

১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ নভেম্বর ১৯৮২, পৃ. ১

১১. ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১২. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১

১৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১

১৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১

১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১

১৬. ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৮

১৭. *দৈনিক বাংলা*, ১ এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ. ১

১৮. *দৈনিক বাংলা*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১

১৯. ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

২০. *দৈনিক বাংলা*, ১ অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১

২১. *দৈনিক বাংলা*, ২ নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১

২২. প্রাগুক্ত

২৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ১

২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ১

২৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ১

২৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ মে ১৯৮৪, পৃ. ১

২৭. *সংবাদ*, ২০ মে ১৯৮৪, পৃ. ১

২৮. কামরুল হক, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সমকালীন রাজনীতি : ১৯৭২-৯০*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুন ২০২১, পৃ. ৪৫২-৪৫৩

২৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ১

৩০. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১

৩১. কামরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫-৪৫৯

৩২. *সংবাদ*, ২ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ১

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. কামরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০-৪৬১

৩৫. *দৈনিক বাংলা*, ৪ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১

৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ৫ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১

৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ১১ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১

৩৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১

৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ২০ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১

৪০. *সংবাদ*, ২২ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১

৪১. *দৈনিক বাংলা*, ২২ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১

৪২. *সংবাদ*, ২২ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১

৪৩. প্রাগুক্ত

৪৪. প্রাগুক্ত

৪৫. *সংবাদ*, ২৩ মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ১

৪৬. *সংবাদ*, ৩ এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ. ১

৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ. ১

৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ. ১

৪৯. কামরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬-৪৭০

৫০. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ জুন ১৯৮৭, পৃ. ১

৫১. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৮৭, পৃ. ১

৫২. *সংবাদ*, ২৫ অক্টোবর ১৯৮৭, পৃ. ১

৫৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ অক্টোবর ১৯৮৭, পৃ. ১

৫৪. কামরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩-৪৭৫

৫৫. *সংবাদ*, ২০ জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ১

৫৬. কামরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬

৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ১১ মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১

৫৮. কামরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮

৫৯. দৈনিক বাংলা, ২৯ জুন ১৯৯০, পৃ. ১

৬০. দৈনিক বাংলা, ২ অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ১

৬১. দৈনিক বাংলা, ১৩ অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ১

৬২. দৈনিক বাংলা, ১৭ অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ১

৬৩. দৈনিক বাংলা, ২০ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১

৬৪. দৈনিক বাংলা, ২২ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১

৬৫. দৈনিক বাংলা, ২৭ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১

৬৬. প্রাগুক্ত

৬৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১

৬৮. ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪।

৬৯. ড. গোলাম রহমান ও কামরুল হক, *সংবাদপত্রে সমকালীন রাজনীতির উপস্থাপন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা: ৭০-৭২, জুন ২০০১-অক্টোবর ২০০১-ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৯

৭০. কামরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬-৫১৭

৭১. ড. মঞ্জুরে খোদা
https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%A4/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A7%8E-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A3%E0%A6%A4%E0%A6%BF-353026 (৩১ মে ২০২২)

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই গবেষণাকর্মের জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের পরিমাপক হিসেবে সংখ্যাত্মক (Quantitative) ও গুণাত্মক (Qualitative) উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে গণমাধ্যম গবেষণার জন্য জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত রাখতে গিয়ে Joann Keyton তাঁর Communication Research: Asking Questions, Finding Answers গ্রন্থে লিখেছেন:

> Content analysis is the most basic methodology for analyzing message content; it integrates data collection method and analytical technique in a research design to reveal the occurrence of some identifiable element in a text or set of messages. Content analysis can be used to identify frequencies of occurrence, differences, trends, patterns, and standards; first-order linkages should also be considered in the research design.[১]

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে গণমাধ্যম গবেষণার জন্য একটি জনপ্রিয় গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। Mass Media Research: An Introduction শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে তাঁরা লিখেছেন:

> Content analysis is a popular technique in mass media research.[২]

এই গ্রন্থে Roger D. Wimmer ও Joseph R. Dominick আধেয় বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিভিন্ন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা লিখেছেন:

> Many definitions of content analysis exist. Walizer and Wienir have defined it as any systematic procedure devised to examine the content of recorded information, Krippendorf defined it as a research technique for making replicable and valid references from data to their context.

> Kerlinger's definition is fairly typical: content analysis is a method of studying and analyzing communication in a systematic, objective, and quantitative manner for the purpose of measuring variables.[৩]

P. J. Stone তাঁর The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis গ্রন্থে আধেয় বিশ্লেষণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে লিখেছেন:

> Content analysis is a research technique for making references by systematically and objectively identifying specified characteristics within texts.[৪]

Content Analysis of Communications শীর্ষক গ্রন্থে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত রেখেছেন Richard W. Budd, Robert K. Thorp ও Lewis Donohew. গ্রন্থটিতে তাঁরা লিখেছেন, আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি কী ধরনের গবেষণায় প্রয়োগ করা যায়। আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির ছ'টি ধাপের কথাও বলেছেন তাঁরা। তাঁরা লিখেছেন:

> Content analysis is a systematic technique for analyzing message content and message handling- it is a tool for observing and analyzing the overt communication behavior of selected communicators.
>
> Content analysis techniques may be applied to study the content of any book, magazine, newspaper, individual story or article, motion picture, news-broadcast, photograph, cartoon, comic strip, or a series or combination of any of these. They have been applied not only to printed mass media, but to such communications as private correspondence, transcripts of psychoanalytic interviews, gestures, political documents, and minutes of meetings.
>
> Content analysis studies usually involve six stages. First, the investigator formulates the research question, theory, and hypotheses. Second, he selects a sample and defines categories. Third, he reads (or listens to or watches) and codes the content according to objective rules. Fourth, he may scale items or in some other way arrive at scores. Next, if other factors are included in the study, he compares these scores with measurements of the other variables. And finally, he interprets the findings according to appropriate concepts or theories.[৫]

মুহাম্মদ হাসান ইমাম তাঁর 'সামাজিক গবেষণা : প্রত্যয়, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি' গ্রন্থে গণমাধ্যমের আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন:

> গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ত্রিশের দশক থেকেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কম সময়, কম খরচ এবং প্রচুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আধেয় বিশ্লেষণ করা যায় হেতু বর্তমানে পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর এবং এ কারণে গণমাধ্যম গবেষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়।[৬]

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে এই সমীক্ষার জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতিকে প্রাসঙ্গিক মনে করা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণের কৌশল:

আধেয় বিশ্লেষণের জন্য প্রথমে নমুনাভুক্ত চারটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট এবং প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয় ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকের চিঠি তারিখের ক্রমানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়।

রিপোর্টগুলো লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:
এক. প্রকাশের তারিখ;
দুই. সূত্র: বার্তা সংস্থা, নিজস্ব সাধারণ আইটেম, স্পেশাল আইটেম;
তিন. কোন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে;
চার. কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে;
পাঁচ. শিরোনাম;
ছয়. রিপোর্টের মূল বক্তব্য।

সম্পাদকীয় লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:
এক. প্রকাশের তারিখ;
দুই. শিরোনাম;
তিন. সম্পাদকীয়র মূল বক্তব্য;

চিঠি লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:
এক. প্রকাশের তারিখ;
দুই. শিরোনাম;
তিন. চিঠির মূল বক্তব্য।

গবেষণার আওতাধীন সময়:

এই গবেষণাকর্মের আওতাধীন সময় ছিল: ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

নমুনায়ন:

এই গবেষণাকর্মের জন্য স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। দুই ধাপে নমুনা বাছাই করা হবে। প্রথম ধাপে চারটি সংবাদপত্রকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হবে। সংবাদপত্র চারটি হচ্ছে: দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার।

এই সংবাদপত্রগুলো বাছাই করার কারণ হচ্ছে, নব্বইয়ের দশকে এই সংবাদপত্রগুলোই প্রভাবশালী ও শীর্ষস্থানীয় ছিল। চারটি সংবাদপত্রের সবকটি জাতীয় দৈনিকের মর্যাদাসম্পন্ন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত। চারটি সংবাদপত্রের মধ্যে দৈনিক বাংলা তুলনামূলকভাবে নবীন হলেও বাকি তিনটি সংবাদপত্র বেশ প্রাচীন। গবেষণাকর্মের আওতাভুক্ত সময়ে বাংলাদেশের গোটা পত্রিকামাধ্যমকে মোটামুটি প্রতিনিধিত্ব করেছে সংবাদপত্রগুলো।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল এরশাদ ৬ ডিসেম্বর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১২ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদকে অন্তরীণ করা হয় এবং তার ১৫ সহযোগীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারি করা হয়।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে গণরোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জেনারেল এরশাদ ২৭ নভেম্বর সারাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। জরুরি অবস্থা জারির প্রতিবাদে সংবাদপত্রগুলোর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় এবং ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের পর সংবাদপত্রগুলো পুনরায় প্রকাশনা শুরু করে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় ধাপে উল্লেখিত চারটি সংবাদপত্রের ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫ দিনের সব কপি নমুনাভুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ছুটি থাকায় পরদিন ১৭ ডিসেম্বর সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। তাই উপরোক্ত চারটি পত্রিকার মোট ১৪ দিনের সব কপি নমুনাভুক্ত করা হয়।

নমুনাভুক্ত চারটি সংবাদপত্রের সব কপি ছাড়াও প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সংবাদপত্র ও গ্রন্থ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

তথ্য সূত্রঃ

১. Joann Keyton, '*Communication Research : Asking Question, Finding Answer',* New York: McGraw-Hill, 2006, p. 246.

২. Roger D. Wimmer & Joseph R. Dominick, '*Mass Media Research : An Introduction(2nd ed.)',* California: Wadsworth Publishing Company, 1987, p. 187.

৩. Ibid, p. 166.

৪. P. J. Stone, '*The General Inquirer : A Computer Approach to Content Analysis',* Cambridge, MA: MIT Press,1966, p.5

৫. Richard W. Budd, Robert K. Thorp & Lewis Donohew, '*Content Analysis of Communications*', New York: The Macmillan Company, 1967, p. 2-6.

৬. ইমাম, মুহাম্মদ হাসান, '*সামাজিক গবেষণা : প্রত্যয়, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি*', ঢাকা: অধুনা প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ. ২৮৩।

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য উপস্থাপন

১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। গভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এই দিন রাতে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পরদিন ৫ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোটের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করা হয়। ৬ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। পরে ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে অন্তরীণ করা হয়। এই গণঅভ্যুত্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে গণঅভ্যুত্থানের প্রতিফলন যাচাই করার জন্য ঘটনার পরদিন ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে পরবর্তী দুই সপ্তাহের (২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত) পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সলের ২৭ নভেম্বর জরুরী অবস্থা জারির প্রতিবাদে ২৮ নভেম্বর থেকে দেশে সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পুনরায় সংবাদপত্র প্রকাশনা শুরু হয়।

রিপোর্ট :

৬ ডিসেম্বর ১৯৯০

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর প্রাধান্য লাভ করে। এইদিন চারটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের মধ্যে কয়েকটির বিষয় ছিল অভিন্ন এবং এই রিপোর্টগুলোই তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে।

এর মধ্যে এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত বিষয়ক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের পদত্যাগ : জনতার বিজয়োল্লাস : বিচারপতি সাহাবুদ্দীন সর্বসম্মত ভাইস-প্রেসিডেন্ট'। এই খবরে লেখা হয়:

> উত্তাল গণআন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পর বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের অস্থায়ী

> প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। তিনিই বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলের প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে আসন্ন নির্বাচন পরিচালনা করবেন। গতকাল সারাদিন বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় তিন জোট সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনয়ন দানের কথা ঘোষণা করে।[১]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের পদত্যাগ ॥ জনতার বিজয় উল্লাস'।[২] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের ঘোষণা : উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন মনোনীত ॥ এরশাদের পদত্যাগ'।[৩] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Justice Shahabuddin nominated as Vice-President : Emergency goes ॥ Ershad To Step Down.'[৪]

শেখ হাসিনার বক্তব্যভিত্তিক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ বাতিল করতে হবে: শেখ হাসিনা'। এই খবরে লেখা হয়:

> আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে এরশাদ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মন্ত্রিসভা ও সংসদ বাতিল করার আহ্বান জানান।[৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Hasina asks Ershad to dissolve Cabinet, JS.'[৬] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'জনতার বিজয়কে সুসংহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকুন: শেখ হাসিনা'।[৭] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'অবিলম্বে মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে: হাসিনা'।[৮]

খালেদা জিয়ার বক্তব্যভিত্তিক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জনগণের বিজয় সংহত করে সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে হবে: খালেদা জিয়া'। এতে লেখা হয়:

সাত দলীয় জোট নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া জনসমুদ্রে ঘোষণা করেছেন, এরশাদ জনগণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। গণহত্যা, সম্পদ পাচার ও দুর্নীতির দায়ে তার বিচার করা হবে। তিনি বলেন, জনগণ যে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে তাকে সংহত করতে হবে একটি সুন্দর ভবিষ্যত তৈরি করার জন্য।[৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Remain alert against conspiracy : Khaleda'.[১০] দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বিজয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে: খালেদা জিয়া'।[১১] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'সতর্ক থাকুন, ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি: খালেদা'।[১২]

জনতার আনন্দ-উল্লাস বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার'। এতে লেখা হয়:

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকায় মানুষের যে ঢল নেমেছিল, কেবল তারই সঙ্গে গতকালের গণজোয়ারের তুলনা চলে। মঙ্গলবার রাত দশটা তেরো মিনিটে টেলিভিশনে এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উল্লসিত জনতা বিজয়-উৎসবে মেতে ওঠে। ঘর ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ নেমে পড়ে রাজপথে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।[১৩]

সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আনন্দ উল্লাসে মুখরিত মহানগরী'। এতে লেখা হয়:

রাষ্ট্রপতি এরশাদ অবিলম্বে পদত্যাগ করতে রাজী হয়েছেন– মঙ্গলবার রাতে এ কথা ঘোষিত হবার পর অসংখ্য জনতা রাস্তায় নেমে এসে গভীররাত পর্যন্ত উল্লাস শেষে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু গতকাল বুধবার ভোর থেকে তারা দ্বিগুণ হয়ে আবার রাস্তায় নেমে এলে দুপুর নাগাদ পুরো রাজধানী জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এ যেন একাত্তর সালের দখলদার মুক্ত হওয়ার সময়কার আনন্দ উল্লাসের পুনরাবৃত্তি।[১৪]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Unprecedented Jubilation.' এই খবরে লেখা হয়:

Hundreds of thousands of people who streamed to the city streets soon after President Ershad's decision to step down on Tuesday night continued their jubilation till the

time of writing this report at 10 p.m. on Wednesday. Scores of processions bearing the national flags marched the city with the tune of bands. The avalance of people which included men, women and children danced to tune of bands on the streets and frequently chanted slogans demanding trial of President Ershad, his cabinet colleagues and collaborator of his regim.[১৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'উল্লাস মুখরিত নগরী'। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল বুধবার রাজধানী ঢাকা মহানগরী আনন্দ-উল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠে। মিছিলে মিছিলে সয়লাব হইয়া যায় রাজপথ। গণতন্ত্রের বিজয় গাথায় চারিদিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। মঙ্গলবার রাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় হাজারো মানুষ কারফিউর কথা ভুলিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়ে।[১৬]

পাঁচ দলীয় জোটের বক্তব্যভিত্তিক খবরটি আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় সংবাদ ছাড়া বাকি তিনটি পত্রিকায়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে: পাঁচ দল'। এতে লেখা হয়:

পাঁচ দল, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ ও ঐক্য প্রক্রিয়ার নেতৃবৃন্দ বলেছেন আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় এখনও অর্জিত হয়নি। অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। গতকাল (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে জাসদ বাসদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক জনসভায় তারা বক্তৃতা করেন। জনসভায় বলা হয়, এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।[১৭]

দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন: পাঁচ দল'।[১৮] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Five-Party to Continue movement.'[১৯]

জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবরটিও আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় সংবাদ ছাড়া বাকি তিনটি পত্রিকায়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যেন আর স্বৈরাচারের জন্ম না হয়: জামায়াত'। এই খবরে লেখা হয়:

> জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেছেন, স্বৈরাচারের পতনের ফলে দেশের মানুষ আজ মুক্তির আলো দেখছে। তবে বিজয়ের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের এই শিক্ষাই নিতে হবে যাতে বাংলাদেশে আগামী দিনে আর কোন স্বৈরাচারের জন্ম না হয়।[২০]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'যে কোন মূল্যে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখুন: জামায়াতে ইসলামী'।[২১] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Abbas appeals for restraint.'[২২]

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্যভিত্তিক খবর বাংলাদেশ অবজারভার ও সংবাদ ছাড়া বাকি দুটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ছাত্র ঐক্য : ছাত্র জনতার বিজয়কে সংহত করতে হবে'। এই খবরে লেখা হয়:

> গণআন্দোলনে বিজয়ের পর আজ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতারা বললেন, এই বিজয় ঐতিহাসিক। এই বিজয় ছাত্র জনতার। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছাত্র জনতার এই ঐতিহাসিক বিজয়কে সুসংহত করা। ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের নায়করা আজ এভাবে তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।[২৩]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আন্দোলনে বিজয়কে অর্থবহ করিতে হইবে: ছাত্রঐক্য'।[২৪]

৭ ডিসেম্বর ১৯৯০

১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বরেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর প্রাধান্য বিস্তার করে। এই দিন চারটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের মধ্যে কয়েকটির বিষয় ছিল অভিন্ন এবং এই রিপোর্টগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এর মধ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। খবরটি দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'মন্ত্রিসভা ও সংসদ বাতিল : এরশাদের আনুষ্ঠানিক পদত্যাগ: সাহাবুদ্দীন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট'। এতে লেখা হয়:

> প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গতকাল বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করার পর তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর আগে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদ বাতিল করেন। প্রেসিডেন্ট সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেন।[২৫]

সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর : অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের দায়িত্ব গ্রহণ'।[২৬] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Parliament, Cabinet dissolved : Ershad goes : Justice Shahabuddin takes over as Acting President'.[২৭] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের পদত্যাগ : অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের দায়িত্ব গ্রহণ'।[২৮]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্যভিত্তিক অভিন্ন খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান: অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করুন : ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট'। এই খবরে লেখা হয়:

> যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে নতুন সুযোগ এসেছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে শপথ গ্রহণের পর বঙ্গভবনে এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগ গণতন্ত্রের জন্যে একটি বিজয়।[২৯]

দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করুন : শান্তি বজায় রাখুন : অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট'।[৩০] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'শান্তি-শৃঙ্খলা-সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেছেন : এরশাদের পদত্যাগ গণতন্ত্রের বিজয়'।[৩১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Restore law and order for free, fair polls : Shahabuddin.'[৩২]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন দল ও সংগঠনের অভিনন্দন'। এই খবরে লেখা হয়:

> দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ দেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এই সব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন: দেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছে। জনগণ তার উপর যে আস্থা স্থাপন করেছেন তিনি তা সুচারুরূপে পালন করতে সক্ষম হবেন।[৩৩]

অন্য তিনটি পত্রিকায়ও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের প্রতি বিভিন্ন দল ও সংগঠনের অভিনন্দন'।[৩৪] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'অভিনন্দন'।[৩৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Political parties greet Justice Shahabuddin.'[৩৬]

তিন জোটের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত বিষয়ক অভিন্ন খবরটি চারটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের কর্মসূচি স্থগিত : সকল অফিস-আদালত চালু করার আহ্বান'। এই খবরে লেখা হয়:

> আট দল, সাত দল ও পাঁচ দলীয় ঐক্য জোট আন্দোলনের কর্মসূচী স্থগিত করেছে। গতকাল জোটের এক যুক্ত ঘোষণায় উক্ত কর্মসূচী স্থগিতের কথা ঘোষণা করে অবিলম্বে অফিস-আদালত, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সকল যানবাহন এবং প্রশাসনিক সকল কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চালু করার আহ্বান জানানো হয়।[৩৭]

দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের আন্দোলনের কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা'।[৩৮] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'আন্দোলনের সকল কর্মসূচি স্থগিত : অফিস-আদালতসহ সর্বত্র পুনরায় স্বাভাবিক কাজকর্ম চালুর আহ্বান'।[৩৯] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Alliances call off programms.'[৪০]

শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা সংশ্লিষ্ট অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলা ও সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন : অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করুন : শেখ হাসিনা'। এই খবরে লেখা হয়:

> ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন যে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন নিশ্চিত করবেন। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে অভিনন্দন জানিয়ে শেখ হাসিনা গতকাল বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের বলেন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সবার সহযোগিতা করা উচিত। খবর ইউএনবি'র।[৪১]

সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাই : শেখ হাসিনা'।[৪২] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গভবনে নেতা-নেত্রীদের প্রতিক্রিয়া'।[৪৩] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Caretaker govt. to ensure free, fair polls : Hasina.'[৪৪]

খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা সংশ্লিষ্ট অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে: খালেদা জিয়া'। এই খবরে লেখা হয়:

> ৭ দলীয় নেত্রী ও বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া অনেক ত্যাগ ও দুঃখ-দুর্দশার বিনিময়ে অর্জিত জনগণের বিজয় সুসংহত করার আহ্বান জানান। বৃহস্পতিবার বিকালে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের শপথগ্রহণের পর বঙ্গভবনের দরবার হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে বেগম জিয়া বলেন, জনগণের ৯ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বিজয় অর্জিত হয়েছে। তিনি তাদের প্রতি দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। খবর বাসস'র।[৪৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'জনগণের বিজয় সংহত করিতে হইবে : খালেদা জিয়া'।[৪৬] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত হতে চলেছে : খালেদা'।[৪৭] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Khelida for Ershad's trial.'[৪৮]

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা সংশ্লিষ্ট অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না ॥ এরশাদ ও সহযোগীদের বিচার হবে : ছাত্রঐক্য'। এতে লেখা হয়:

> সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জেনারেল এরশাদ এবং তার সকল সহযোগীদের বিচার বাংলার মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে। এদের কাউকে ক্ষমা করা হবে না। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ এ ঘোষণা দেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, তবে কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এদের সকল অপকর্মের বিচার হবে।[৪৯]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বিজয় সংহত করার জন্য সজাগ থাকিতে হইবে : ছাত্রঐক্য'।[৫০] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'ছাত্রঐক্যের আহ্বান ॥ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার শুভসূচনা নস্যাতের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন'।[৫১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'APSU demands trial of Ershad, allies.'[৫২]

জনতার আনন্দ-উল্লাস বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলা ও সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা সহ সারা দেশে বিজয় মিছিল : সমাবেশ'। এতে লেখা হয়:

> গণআন্দোলনের বিজয়ে রাজধানী ঢাকা এখনো উল্লাসমুখর। উৎফুল্ল জনতার বিজয়োল্লাস চলছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পাড়ায় মহল্লায়। জারিগান, পালাগান, নৃত্য-আবৃত্তি চলছে এই নগরীতে। একই সঙ্গে চলছে বর্ণাঢ্য মিছিল আর রং খেলার আনন্দ। মঙ্গলবার রাতে টিভিতে এরশাদের পদত্যাগের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানী উল্লাসমুখর হয়ে উঠে। লাখো জনতা নেমে পড়ে রাজপথে। সেই উল্লাসের রেশ গতকালও ছিল।[৫৩]

সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'এখনো আনন্দ উৎসবের জোয়ার বইছে'।[৫৪] অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ ॥ আনন্দ মিছিল অব্যাহত'।[৫৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Thousands pour in Democracy Road.'[৫৬]

জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবর সংবাদ ছাড়া বাকি তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। তিনটি পত্রিকায়ই খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ চক্র কয়েক হাজার কোটি টাকা লুট করেছে : জামায়াত'। এই খবরে লেখা হয়:

> জামায়াতে ইসলামী মহানগরীর আমীর আবদুল কাদের মোল্লা বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচার করার দাবী জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, তারা কয়েক হাজার কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ লুট করেছে। ঢাকায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর দিকের গেটে অনুষ্ঠিত পার্টির এক সমাবেশে তিনি বক্তৃতা করছিলেন। খবর বাসস'র।[৫৭]

দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'জামায়াতের শোকরানা দিবস'।[৫৮] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Jamaat for trial of Ershad.'[৫৯]

৮ ডিসেম্বর ১৯৯০

১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বরেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর প্রাধান্য বিস্তার করে। এই দিন চারটি পত্রিকাতেই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের মধ্যে কয়েকটির বিষয় ছিল অভিন্ন এবং এই রিপোর্টগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এরমধ্যে জাতির উদ্দেশে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণ বিষয়ক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম শিরোনামে ব্যানার আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই মুখ্য দায়িত্ব : সাহাবুদ্দীন ॥ গণতন্ত্র কায়েমে সবাই অবদান রাখুন'। এতে লেখা হয়:

> ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। গতকাল রাতে রেডিও-টেলিভিশনে দেয়া জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বলেন, তার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান কর্তব্য হলো দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।[৬০]

সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষা অর্ডিন্যান্স ও বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করা হবে : অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ॥ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করুন'।[৬১] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বিতর্কিত স্বাস্থ্যনীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল করা হইবে : রাজনৈতিক দলগুলো চাহিলে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হইবে ॥ জাতির উদ্দেশে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ : আসুন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সকলে একযোগে কাজ করি'।[৬২] বাংলাদেশ

অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Election Commissions likely to be recast : Free, fair polls Govt.'s main task : Shahabuddin'.[৬৩]

তিন জোটের সভায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার দাবি বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যে কোন ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সতর্ক থাকুন : এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচার চাই : ৩ জোট'। এতে লেখা হয়:

> আটদল, সাতদল ও পাঁচদলীয় জোট অবিলম্বে এরশাদ, রওশন এরশাদ, এরশাদ সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, সকল দুর্নীতিবাজ ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী মন্ত্রী, এমপি, আ স ম আবদুর রব এবং তাদের সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচার করার জন্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিন জোট তাদের দেশ ত্যাগ নিষিদ্ধ করারও দাবী জানায়।[৬৪]

অন্য তিনটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের যৌথ সভা : এরশাদ ও সহযোগীদের বিচার দাবী'।[৬৫] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'দেশত্যাগ নিষিদ্ধ ও ব্যাংক একাউন্ট ফ্রীজ করার দাবী : এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার করুন : ৩ জোট'।[৬৬] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Alliances demand Ershad's detention.'[৬৭]

শেখ হাসিনার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় পার্টি নেতাদের দলে না নেয়ার আহ্বান ॥ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখুন : শেখ হাসিনা'। এতে লেখা হয়:

> আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা স্বৈরাচারী এরশাদের জাতীয় পার্টির নেতাদের আশ্রয় না দেয়ার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নইলে ঐসব দল স্বৈরাচারী এরশাদের দোসর হিসেবে চিহ্নিত হবে।[৬৮]

দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করুন : শেখ হাসিনা'।[৬৯] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত বিজয় সংহত করতে ঐক্যবদ্ধ থাকুন : হাসিনা'।[৭০] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং শিরোনাম ছিল: 'Maintain law and order at all costs : Hasina'.[৭১]

খালেদা জিয়ার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং শিরোনাম ছিল: 'শহীদ জিয়ার মাজারে খালেদা জিয়ার পুষ্পস্তবক অর্পণ'। এতে লেখা হয়:

> সাত দল নেত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া গতকাল সকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার মাজার জেয়ারত ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। মাজার জেয়ারতের সময় বেগম জিয়া বেশ কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে গত নয় বছর বেগম জিয়া আপোসহীন ও অনমনীয় আন্দোলন চালান।[৭২]

অন্য তিনটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'জিয়ার মাজারে বেগম জিয়া'।[৭৩] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'জিয়ার কবর জিয়ারতে খালেদা জিয়া'।[৭৪] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Khaleda visits Zia's mazar.'[৭৫]

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্য বিষয়ক অভিন্ন খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক ছাড়া তিনটি পত্রিকাতে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আহ্বান : এরশাদের সহযোগীদের কোনো দল বা সংগঠনে আশ্রয় দেবেন না'। এতে লেখা হয়:

> সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার ও তার সহযোগীদের কোন গণতান্ত্রিক দল ও সংগঠনে আশ্রয় না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল এক বিবৃতিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এ আহ্বান জানায়।[৭৬]

সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'এদের কোন দলে স্থান দেবেন না : ছাত্রঐক্য'।[৭৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'APSU call not to give shelter to Ershad's collaborators.'[৭৮] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং শিরোনাম ছিল: 'দেশবাসীর প্রতি ছাত্রঐক্য : দায়িত্বশীল আচরণ ও ভূমিকা পালন করুন'।[৭৯]

জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবর সংবাদ ছাড়া বাকি তিনটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। তিনটি পত্রিকাতেই খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন: আব্বাস'। এতে লেখা হয়:

> জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান দেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শুক্রবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, জনগণের অধিকার খর্ব করার যেকোন তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে।[৮০]

দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'প্রয়োজন ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতা : জামায়াত'।[৮১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Abbas urges people to be alert against anarchy.'[৮২]

৯ ডিসেম্বর ১৯৯০

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব পায়। এর মধ্যে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের তিন জোটে জায়গা না দেয়ার সিদ্ধান্ত বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিন জোটের যুক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারের কাউকে আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত কোনো দলে আশ্রয় দেয়া হবে না। খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায়ই প্রথম পৃষ্ঠায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের যুক্ত সভায় সিদ্ধান্ত : এরশাদ সরকারের কাউকে দলে নেওয়া হবে না'। এতে লেখা হয় :

> ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য অথবা জাতীয় পার্টির গণধিকৃত যে কোন পর্যায়ের নেতা, কর্মী বা সদস্য কিংবা এই দলের সহযোগী কোন সংগঠনের নেতা বা কর্মীকে আট দল, সাত দল ও পাঁচ দলীয় জোট অথবা তিন জোটের কোন দল বা অঙ্গ সংগঠনে আশ্রয় দেওয়া হবে না। আবদুস সামাদ আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তিন জোটের এক যুক্ত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৮৩]

অন্য তিনটি পত্রিকার মধ্যে সংবাদে খবরটি ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'তিন জোটের সভা: এরশাদ সরকারের সহযোগীদের জোট ও দলে নেয়া হবে না'।[৮৪] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় পার্টির কাহাকেও ৮,৭ ও ৫ দলে আশ্রয় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত'।[৮৫] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: '3 alliances not to accept JP members.'[৮৬]

অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় উপদেষ্টার নাম ঘোষণা বিষয়ক খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'দুই একদিনের মধ্যে সম্প্রসারণ: ছয় সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন'। এই খবরে লেখা হয়:

> অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গতরাতে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ছয়জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন। এঁরা হলেন: সাবেক অর্থসচিব কফিলউদ্দিন মাহমুদ, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. এম এ মাজেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, পুলিশের সাবেক আইজি জি কিবরিয়া ও বিআইডব্লিউটিসির সাবেক চেয়ারম্যান মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম।[৮৭]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'ছয় উপদেষ্টার নাম ঘোষণা'।[৮৮] সংবাদে শিরোনাম ছিল: '৬ উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত'।[৮৯] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: '6 Advisers appointed.'[৯০]

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বিজয় উৎসব বিষয়ক খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ছাত্রঐক্যের আনন্দমুখর বিজয় উৎসব পালন'। এই খবরে লেখা হয় :

> গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল অভূতপূর্ব উৎসবের আমেজে ভরপুর। প্রায় ১২ ঘণ্টাব্যাপী এই বিজয় উৎসবে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন-পোস্টারে, প্যারোডি গানের সুরে, হৈ হুল্লোড় ও স্বৈরাচার বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগানে, খণ্ড খণ্ড মিছিলে, রংয়ের হোলিখেলা, বিজয় মঞ্চে একটানা প্রায় দশঘণ্টার জমজমাট আবৃত্তি-সংগীত-অভিনয় অনুষ্ঠান, কয়েকটি খণ্ড খণ্ড পোস্টার, কার্টুন ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের এই সমাবেশ এক ব্যতিক্রমী পরিবেশ বিরাজ করে। গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে এই বিজয় উৎসবের আয়োজন করে।[৯১]

সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'বিজয় উৎসব : আনন্দ আর উল্লাসে মুখর ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা'।[৯২] দৈনিক বাংলা খবরটি তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য বিজয় উৎসব'।[৯৩] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Thousands of students celebrated victory.'[৯৪]

১০ ডিসেম্বর ১৯৯০

১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট কয়েকটি খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব পায়। এর মধ্যে সাত দলীয় জোটের বিজয়

মিছিল বিষয়ক খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : '৭ দলের বিরাট বিজয় মিছিল ॥ এরশাদের বিচার দাবী'। এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল রবিবার বিকালে ৭ দলীয় জোটের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম চত্বর হইতে এক বিরাট বিজয় মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলের পূর্বে আয়োজিত সমাবেশে ৭ দলীয় জোট নেতা ও বিএনপির মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার বলেন, জনগণের আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গণতন্ত্র হত্যা করার পাঁয়তারা আবার নতুন করিয়া শুরু হইয়াছে।[৯৫]

দৈনিক বাংলার শিরোনাম ছিল: 'নগরীতে সাত দলের বিশাল বিজয় মিছিল'।[৯৬] সংবাদে খবরটি ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাজধানীতে সাত দলের বর্ণাঢ্য বিজয় ও গণমিছিল'।[৯৭] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল : 'BNP for trial of Ershad.'[৯৮]

আরও তিনজন উপদেষ্টা নিয়োগ বিষয়ক খবরটি বাংলায় চার কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আরো তিনজন নিয়োগ : শপথ গ্রহণ : উপদেষ্টাদের দপ্তর'। এতে লেখা হয়:

> ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রোববার আরও তিনজন নতুন সদস্য নিয়োগ করে তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ সম্প্রসারণ করেছেন। বাসস'র খবরে প্রকাশ, উপদেষ্টা পরিষদের নতুন সদস্যরা হচ্ছেন: সিনিয়র আইনজীবী ও সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, সিনিয়র অর্থনীতিবিদ প্রফেসর রেহমান সোবহান এবং হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল খালেক।[৯৯]

খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'আরও ৩ জন উপদেষ্টা নিয়োগ'।[১০০] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'আরো তিনজন নিয়োগ : উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের দপ্তর বণ্টন'।[১০১] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Advisers in Sworn.'[১০২]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাক্ষাৎকার বিষয়ক একটি খবর বিবিসি রেডিও এর বরাত দিয়ে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ॥ আমি দুঃখিত নই : এরশাদ'। এতে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ বলেছেন, ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। ঢাকা সেনানিবাস থেকে গতকাল বিবিসির সাথে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে জোনারেল এরশাদ বলেছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা তাতে তিনি অংশ নেবেন। আর জয়ী হলে আগামী বছর অনুষ্ঠেয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেছেন। তবে তার কৈফিয়ত দেবার মত কিছু নেই এবং এর জন্য তিনি দুঃখিত নন।[১০৩]

১১ ডিসেম্বর ১৯৯০

গণঅভ্যুত্থানের ঘটনার ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোট সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করে এবং এইসব বৈঠকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। পরদিন ১১ ডিসেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '৩ জোটের সঙ্গে ছাত্রঐক্যসহ বিভিন্ন সংগঠনের বৈঠক ॥ এরশাদ ও তার সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেফতার দাবী'। এতে লেখা হয়:

> সোমবার ১০ ডিসেম্বর আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, যুব সংগ্রাম পরিষদ, ১৭ টি কৃষক ক্ষেতমজুর সংগঠন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং আন্দোলনকারী বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করেন। এইসব বৈঠকে গণসংগ্রাম ও দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং করণীয় প্রভৃতি বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়। বৈঠকে জেনারেল এরশাদ, তার সব সহযোগী ও বেগম রওশন এরশাদ এবং সাবেক সরকার ও জাতীয় পার্টির সদস্যদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার দাবী করা হয়।[১০৪]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন সংগঠনের সহিত তিনজোটের বৈঠক : সংবিধান লংঘনের দায়ে এরশাদ ও সহযোগীদের বিচার দাবী'।[১০৫] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন সংগঠনের সাথে তিনজোটের বৈঠক: অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান'।[১০৬] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Alliances call to foil conspiracy.'[১০৭]

১২ ডিসেম্বর ১৯৯০

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি অব্যাহত থাকার প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বরের খবরের কাগজে। এই বিষয়ে একাধিক খবর প্রকাশিত হয় এইদিন। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'লক্ষ্য অর্জনে এক থাকতে হবে : তিন জোট'। এতে লেখা হয়:

> তিন জোটের নেতৃবৃন্দ এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচারের দাবী জানিয়ে বলেছেন, জনগণের এই পরাজিত শত্রুরা এখনও সক্রিয় রয়েছে। তারা বলেন, ষড়যন্ত্র এখনও চলছে। এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিন জোটের নেতৃবৃন্দ গতকাল ১১ই ডিসেম্বর সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।[১০৮]

তিন রাজনৈতিক জোট ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিভিত্তিক একটি খবর ১২ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংযুক্ত কর্মচারী ঐক্য পরিষদের একটি বিশাল সমাবেশে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানানো হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Call to set up tribunal for Ershad's trial.' এই খবরে লেখা হয়:

> Sangjukta Karmachari Oikkya Parishad (SKOP) in a big rally held in front of Jatiya Press Club on Tuesday demanded arrest and trial of the ousted President Ershad and his associates. Mr. Yakub Ali Bhuiyan, leader of SKOP read out the announcement at the rally. The announcement said that SKOP will organize continuous rallies, meetings, demonstrations in the mills and factories from today (Wednesday) demanding the arrestes of the ousted President Ershad and his associates.[১০৯]

সংবাদে অনুরূপ একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে এরশাদের বিচারের ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের দাবির কথা তুলে ধরা হয়। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের গ্রেফতার বিচার ও একাউন্ট ফ্রীজের দাবী'। এই খবরে লেখা হয়:

> বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দলের পক্ষ থেকে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ, তার উপরাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য ও দালাল আমলাদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও তাদের বিচার অনুষ্ঠানের দাবী অব্যাহত রয়েছে।[১১০]

দৈনিক ইত্তেফাকেও এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের গ্রেফতার ও বিচার দাবীতে বিভিন্ন সংগঠন'। এই খবরে লেখা হয়:

> বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গতকাল মঙ্গলবার সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদকে গ্রেফতার এবং বিচারের দাবী অব্যাহত রাখিয়াছে। সম্মিলিত পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ গতকাল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জেনারেল এরশাদ এবং তাহার সহযোগীদের গ্রেফতার এবং কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদের বিচারের দাবী জানাইয়াছে।[১১১]

১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০

অবশেষে ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে অন্তরীণ করা হয় এবং তার ১৫ জন সহযোগীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারি করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব ক'টি পত্রিকায় খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভার ছাড়া বাকি তিনটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনাম আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'মওদুদ, জাফরসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে আটকাদেশ ॥ এরশাদ অন্তরীণ'। এই খবরে লেখা হয়:

> ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে গতকাল বুধবার দুপুরে অন্তরীণ করা হয়েছে। তাকে গুলশানের একটি বাড়ীতে রাখা হয়েছে বলে সরকারীভাবে জানানো হয়েছে। তার সঙ্গে তার স্ত্রী রওশন এরশাদ ও ছেলে শাদও রয়েছে। ইউএনবি আরও জানায়, অন্তর্বর্তী সরকার মঙ্গলবার ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন মোতাবেক সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদসহ ১৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং ১২০ দিন আটক রাখার আদেশ জারী করেছেন। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩ ধারার (১)ক-এর অধীনে ১৬ ব্যক্তিকে গ্রেফতারের আদেশ দেন বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে। এ সরকারী আদেশে 'যেখানে তাদের পাওয়া যাবে সেখান থেকেই' গ্রেফতার করার বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১১২]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ অন্তরীণ'।[১১৩] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'গুলশানের একটি বাড়িতে স্থানান্তর ॥ এরশাদ অন্তরীণ ॥

মওদুদ জাফর মোয়াজ্জেমসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি'।[১১৪] অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Ershad interned'.[১১৫]

১৩ ডিসেম্বরের খবরের কাগজে গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের বিজয় মিছিল সংক্রান্ত একটি খবরও প্রকাশিত হয়। খবরটি দৈনিক বাংলায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয় মিছিল'। এই খবরে লেখা হয়:

> আওয়ামী লীগের লাখো কর্মী-সমর্থকের এক বিশাল বিজয় মিছিল বুধবার রাজধানীর সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে বঙ্গবন্ধু ভবনে সমবেত জনতার উদ্দেশে আটদলীয় জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে জাতিকে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে এরশাদ সরকারের পতনে এদেশের মানুষের মনে যে স্বস্তি ও আনন্দ সৃষ্টি হয়েছে আজকের মিছিল তারই বহিঃপ্রকাশ।[১১৬]

খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে– শেখ হাসিনা'।[১১৭] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'আওয়ামী লীগের বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল: চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ থাকুন : শেখ হাসিনা'।[১১৮] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Sustain people's unity: Hasina.'[১১৯]

১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০

এরশাদ অন্তরীণ হওয়ার পরদিন তার সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গ্রেপ্তার হন। এরশাদের অন্য সহযোগীদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ান জারি করা হয়। খবরটি দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই পত্রিকায় খবরটি ছয় কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গাফ্ফার মাহবুবসহ ৫ জনের নামে হুলিয়া : শাহ মোয়াজ্জেম গ্রেফতার'। এই খবরে লেখা হয়:

> ক্ষমতাচ্যুত এরশাদ সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় পার্টির মহসচিব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। মালিবাগে ডিআইটি অফিসার্স কোয়ার্টারের পেছনে এক আত্মীয়ের বাড়িতে তিনি গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। এখান থেকেই পুলিশ গতকাল সকালে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর দুপুর সাড়ে বারটায় শাহ মোয়াজ্জেমকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।[১২০]

সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের কোন সহযোগীই রেহাই পাবে না : শিগগিরই তদন্ত কমিশন : শাহ মোয়াজ্জেম গ্রেফতার : মওদুদ ও জাফরকে ধরার জন্য জোর তৎপরতা'।[১২১] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'শাহ মোয়াজ্জেম গ্রেফতার'।[১২২] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Warrant against 5 more issued : Moazzem arrested .'[১২৩]

১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০

গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় ১৯৯১ সালের ২ মার্চ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। পরদিন ১৫ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে। সংবাদ ও দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। সংবাদে খবরটির শিরোনাম ছিল: '২রা মার্চ সংসদ নির্বাচন'। এই খবরে লেখা হয়:

> আগামী বছর ২রা মার্চ দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। গতকাল শুক্রবার রাতে এক সরকারী ঘোষণায় একথা জানানো হয়। বাসস জানায়, নির্বাচন কমিশন শিগগিরই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবে। গত ৬ই ডিসেম্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ৯০ দিনের মধ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। ইউএনবি জানায়, স্বাধীনতা লাভের পর দেশে পঞ্চমবারের মত নির্বাচন হতে যাচ্ছে। বিরোধীদলসমূহ ও ছাত্র-জনতার দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফল এই নির্বাচন।[১২৪]

দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হবে : ২রা মার্চ সংসদ নির্বাচন'।[১২৫] দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: '২রা মার্চ সংসদ নির্বাচন'।[১২৬] বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Election Commission to be recast : JS polls March 2.'[১২৭]

১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরদিন ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। পরদিন ১৬

ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক ইত্তেফাকে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '১০ই জানুয়ারী মনোনয়নপত্র দাখিল : ১২ই জানুয়ারী বাছাই : ২১শে জানুয়ারী প্রত্যাহারের শেষ দিন : ২মার্চ ভোট গ্রহণ : সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা'। এই খবরে লেখা হয়:

> নির্বাচন কমিশন গতকাল (শনিবার) আগামী ২রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের নয়া সাধারণ নির্বাচনের বিস্তারিত তফসিল ঘোষণা করিয়াছে। এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ই জানুয়ারী রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার অথবা উভয়ের নিকট পেশ করিতে হইবে। শুধুমাত্র রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাই করা হইবে ১২ই জানুয়ারী। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২১শে জানুয়ারী নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ২রা মার্চ সমগ্র দেশে ভোট গ্রহণ করা হইবে।[১২৮]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'JS polls schedule announced : Nomination filing Jan 10, withdrawal Jan 21.'[১২৯] দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে সেকেন্ড লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষণা : মনোনয়নপত্র দাখিল ১০ই জানুয়ারী'।[১৩০] সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা : ১০ই জানুয়ারী মনোনয়নপত্র '।[১৩১]

১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলসহ নানা অভিযোগ তদন্তের ব্যাপারে গণদাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯০ সালের ১৭ ডিসেম্বর এ ব্যাপারে একটি প্রেসনোট জারি করা হয়। পরদিন ১৮ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'সম্পত্তির তালিকা তৈরির পদক্ষেপ : এরশাদের দুর্নীতি তদন্তে কমিটি'। এই খবরে লেখা হয়:

> সরকার সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ, তার মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বাসস গতকাল এ খবর দেয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে বলা হয় যে, এই কমিটিকে এরশাদ, তার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য ব্যক্তি, সরকারী ও বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইউএনবি জানায়, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে এরশাদেও বিচার সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্রসমাজ ও পেশাজীবীদের দাবীর মধ্য দিয়ে এই কমিটি গঠিত হচ্ছে।[১৩২]

দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ ও তাহার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত'।[১৩৩] সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ ও মন্ত্রীদের দুর্নীতি তদন্তে কমিটি'।[১৩৪] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'SC judge to head 3-member committee : Body to probe into alleged corruption by Ershad set up.'[১৩৫]

১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরদিনই অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর কমিটির তিন সদস্যকে নিয়োগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ১৯ ডিসেম্বর এই খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে বাংলাদেশ অবজারভারে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Allegations against Ershad : Probe body named.' এই খবরে লেখা হয়:

> The Government on Tuesday appointed Mr. Justice D. M. Ansaruddin, a judge of the Supreme Court to head the three-member committee to enquire into the allegations of corruptions and misuse of powers by the former President Hussain Muhammud Ershad, members of his council of ministers, officials and employees of the government and other statutory bodies during his rule, reports BSS. The government has also appointed Shah Abdul Hannan, Member, Board of Revenue and Mr. Mahbubul Huq, Commissioner of Khulna Metropolitan Police, as members of the committee. The Government on Monday announced the formation of the committee.[১৩৬]

খবরটি সংবাদ ও দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদে শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ : বিচারপতি আনসারউদ্দিন তদন্ত কমিটির প্রধান'।[১৩৭] দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'বিচারপতি আনসারের নেতৃত্বে এরশাদের দুর্নীতি তদন্ত কমিটি'।[১৩৮] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিচারপতি আনসার উদ্দীন তদন্ত কমিটির প্রধান নিযুক্ত'।[১৩৯]

২০ ডিসেম্বর ১৯৯০

পূর্বে ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখ ১৯৯০ সালের ২ মার্চ পবিত্র শবে বরাত হওয়ায় নির্বাচনের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এই খবরটিও সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় সংবাদে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সময়সূচীর অন্যান্য তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে : ২৭শে ফেব্রুয়ারী সংসদ নির্বাচন'। এই খবরে লেখা হয়:

> পবিত্র শবেবরাতের প্রেক্ষিতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের তারিখ আগামী ২রা মার্চ শনিবার-এর পরিবর্তে আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারি বুধবার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। গতকাল রাতে নির্বাচন কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে বাসস জানায়, কেবলমাত্র ভোটগ্রহণের তারিখ ছাড়া আসন্ন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিগত ১৫ই ডিসেম্বর সরকারী গেজেটে ঘোষিত বিস্তারিত সময়সূচীর অন্যান্য তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে।[১৪০]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'SC polls now Feb 27.'[১৪১] দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে সেকেন্ড লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: '২রা মার্চের পরিবর্তে ২৭শে ফেব্রুয়ারী সংসদ নির্বাচন'।[১৪২] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম রিভার্স শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচন ২৭শে ফেব্রুয়ারী'।[১৪৩]

সম্পাদকীয়:

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি নিয়ে ৫৬টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র, জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা

যায়। দৈনিক বাংলায় এই বিষয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে সংহত করে সুন্দর ভবিষ্যত নির্মিত হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের জয় জনতার জয়'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> বাংলাদেশের অবাধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এক অবিস্মরণীয় বিজয় অর্জন করেছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। ছাত্র-জনতার দাবী স্বীকৃতি লাভ করেছে। গণতন্ত্রের জন্য এই সংগ্রাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে সংযোজিত হয়ে থাকবে।
>
> সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, তিন জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল গণতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করে এবং জনগণকে সংগঠিত করার ব্যাপারে অতুলনীয় ঐক্য প্রদর্শন করে। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন দেশের সকল পেশাজীবী মানুষ। শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিল্পী-সাহিত্যিক সবাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জনতার কাতারে এসে দাঁড়ান।
>
> গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এদেশের ছাত্র-জনতাকে অপরিমেয় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন অগণিত মানুষ। লাঠিচার্জে পঙ্গু হয়েছেন ছাত্র-জনতা বহুজন। কিন্তু সন্ত্রাস, দমননীতি, জরুরী অবস্থা, কারফিউ, গুলি, টিয়ারগ্যাস কোন কিছুই আন্দোলনকারী মানুষকে পিছু হঠাতে পারেনি। বাংলাদেশের মানুষ যে গণতন্ত্রে অবিচলভাবে বিশ্বাসী, বাংলাদেশের মানুষ যে অপশাসনের বিরুদ্ধে সেকথা রাজপথে রক্তের অক্ষরে উত্তীর্ণ হয়েছে।
>
> প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্তফা দেবেন এই খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার রাজপথে গভীর রাত্রি পর্যন্ত উল্লাসমুখর মানুষের ঢল প্রমাণ করেছে কত নিবিড়ভাবে, কত গভীরভাবে মানুষ গণতন্ত্রকে ভালবাসে। কারফিউর ভয় মানুষকে ঘরের ভেতর ধরে রাখতে পারেনি। মৃত্যুভয় ছাত্র-জনতা উপেক্ষা করেছে। এর ফলে অর্জিত হয়েছে এ বিরাট বিজয়।
>
> আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে ছাত্র-জনতা এদেশের অবাধ ও বহুদলীয় গণতন্ত্রে উজ্জ্বল সৌধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর কখনো খর্বিত হবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনার দয়িত্ব গ্রহণ করবেন। আজকের বিজয়কে সংহত করে আমাদের সুন্দর এক ভবিষ্যত নির্মাণ করতে হবে।

আমরা আজ ছাত্র-জনতাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমরা দুই জননেত্রী এবং অন্যান্য জোট ও দলের নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন আমরা তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। যারা নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর সমবেদনা জানাই।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন প্রমাণ করেছে মানুষ কখনো পরাভূত হয় না। মানুষের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।[১৪৪]

একই দিন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ অবজারভারও প্রথম পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য তাদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি মন্তব্য করা হয় যে, ছাত্রদের সম্মিলিত সংহতি দ্বারা শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি গণআন্দোলনকে দ্রুত গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করে বিজয় এনে দিয়েছে। শিরোনাম ছিল: 'The Need Of The Hour'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

The people's sustained struggle for freedom and democracy has at last triumphed with President Ershad offering to resign. An interim government taking over pending elections to be conducted by a newly appointed Election Commissioner, the political situation will, we hope, start stabilising, to the welcome of all. Opposition unity and singleness of purpose reinforced by student solidarity has made this victory so quickly achievable. Even in what should be a brief transition the utmost need is restraint and reconciliation in the greater interest of the country. It is reassuring that both the alliances leaders. Mrs. Sheikh Hasina Wazed and Begum Khaleda Zia, have appealed to the people for peace and the avoidance of anything that may come in its way.

Administratively, the maintenance of law and order comes first, and the alliances' leaders will certainly help keep it by their active guidance and cooperation until a constitutionally formed government is put in place, which we hope, will not take long to come.

The two alliances' leaders, in their appeals, have rightly stressed the need for political stability and unhampered economic progress for which the nation has been struggling for long. However strong the sense of

victory– and the upsurge of emotion produced by it is quite understandable–the nation cannot afford to forget that both political peace and economic progress are its first general priorities as well as a special one in this extraordinary situation.

Politics that had been swung into the streets on the crest of dissent has now to be rolled back to a parliament elected in a free and fair election. This has been the persistent demand of the people so far and for this a new opportunity has been created. Democracy which has had rather a hobbled progress in this country should hence-forth be the most relentlessly pursued goal and must be put before personal or party interests. Unity and cooperation have to be the foundation on which the political and social future of this country will need to be built. And, we hope, that will now be much easier–now that all the mainstream political parties and leaders have come together with a pledge to work together for the same goal.

This being the prime purpose behind the political struggle newly brought to success, the new leadership should go ahead with resolve and put behind it all that stood in its way in the past.[১৪৫]

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। অভিনন্দনের পাশাপাশি সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মূল শক্তি ও প্রেরণা ছিল সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। শিরোনাম ছিল: 'ছাত্রঐক্যের সাফল্য এবং একটি জরুরী বিষয়'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

গতকাল সারাদিন ধরিয়া সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বিজয় উৎসব পালিত হইয়াছে। স্বৈরাচারের পতনের পর গোটা দেশেই এখন বলিতে গেলে বিজয় উৎসব চলিতেছে। তবে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের এই বিজয় উৎসবের তাৎপর্য অনেক বেশী। সবাই জানেন, এবারের আন্দোলনের মূলে শক্তি ও প্রেরণা হইয়া কাজ করিয়াছে এই সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য। দেশের গণমানুষের আশা-আকাংক্ষার প্রতিনিধিত্বকারী এই সচেতন ছাত্রসমাজের নেতৃবর্গ প্রয়োজনের মুহূর্তে সকল রকম মতপার্থক্য ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন এবং ছাত্রঐক্যের এই আন্দোলন জোয়ারে দেশের রাজনীতির অঙ্গন হইতেও সকল ধরনের মতপার্থক্য খড়কুটার মত ভাসিয়া গিয়াছে। জনসাধারণ রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছে। ঐক্যবদ্ধভাবে

আগাইয়া আসিয়াছেন রাজনৈতিক নেতৃবর্গও। আর এভাবেই সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সূচিত বলিষ্ঠ আন্দোলন বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দলের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। এভাবেই ছাত্র, জনতা, রাজনৈতিক কর্মী ও পেশাজীবী মহলের সম্মিলিত আন্দোলনের মুখে পতন ঘটিয়াছে স্বৈরতন্ত্রের। সুতরাং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বিজয় উৎসবের প্রতি দেশবাসীর যে অভিনন্দন স্বতঃস্ফূর্ত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয় উপলক্ষে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের প্রতি আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ এবং প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিগত নয় বৎসরের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যেসব ছাত্র, চিকিৎসক, অন্যান্য স্তরের মানুষ প্রাণ দিয়াছেন, আহত হইয়াছেন- সেইসব জানা-অজানা সংগ্রামী বীরকেও এই মুহূর্তে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করিতে চাই। কোন রক্তদানই বৃথা যায়না। ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিতর্কিত স্বাস্থ্যনীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ বাতিল করা হইবে। সফলতার এই পটভূমিতেই আজ এই প্রসঙ্গে আমরা একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি ছাত্রঐক্যসহ সকল রাজনৈতিক জোট ও দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহা হইতেছে, যে কোন কারণেই হউক এবং যেভাবেই হউক, ইতিমধ্যে প্রচুর সংখ্যক অবৈধ অস্ত্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আন্দোলনের সময়ে ক্ষমতাসীনদের তরফ হইতে বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র প্রদানেরও অভিযোগ রহিয়াছে। এদিকে বিপথগামী ছাত্র-তরুণ, একশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মী, দুষ্কৃতিকারী ও মাস্তানদের মধ্যেও নানা সূত্র হইতে অবৈধ অস্ত্র সরবরাহের খবর পাওয়া গিয়াছে। এইসব অস্ত্রধারীর দাপটে গোটা সমাজ- জীবন পেশীশক্তির নিকট বলিতে গেলে এখন জিম্মী। সমাজ-জীবনকে এই জিম্মী অবস্থা হইতে মুক্তি প্রদানের স্বার্থেই আজ আমরা ছড়াইয়া পড়া অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের উপরে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে চাই।

বিগত নয় বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব সম্ভাবনাময় তরুণ প্রাণ হারাইয়াছেন তাঁহাদের বেশীরভাগই ছিলেন এই অবৈধ অস্ত্রের শিকার। সুতরাং শিক্ষা জীবনের সুস্থতা ফিরাইয়া আনার জন্যও আজ এই মুহূর্ত হইতেই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান পরিচালনা করা দরকার। আর কোন ছাত্র-তরুণকে যেন শিক্ষাঙ্গন হইতে লাশ হইয়া ফিরিতে না হয়, সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে উহারই নিশ্চয়তা বিধান আজ করিতে হইবে। শিক্ষা জীবনে সুস্থিরতা বিধান এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের ইহাও অন্যতম পূর্বশর্ত। আমরা আশা করি, গণতন্ত্রকামী সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, সকল রাজনৈতিক জোট ও দল এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আগাইয়া আসিবেন। এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের প্রয়োজনীয়

> উদ্যোগ ও তৎপরতা দেখিতে চাই। বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের খুন-খারাবির জন্য যাহারা দায়ী, দেশের প্রচলিত আইনে অবিলম্বে তাহাদের বিচার শুরু করিতে এখন আর কোন বাধা নাই। ইহার জন্য কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেরও প্রয়োজন নাই। পুলিশ বিভাগের তৎপরতাই যথেষ্ট।[১৪৬]

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে বেশ ক'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। এই প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। সম্পাদকীয়তে তিন রাজনৈতিক জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে এই মূহূর্তে সর্বাধিক ধৈর্যশীল, সহনশীল ও দূরদর্শী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণতান্ত্রিক বিজয়ের এই সূচনায়'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁহার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার পতনকে ত্বরান্বিত করিতে সামরিক বাহিনীও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করিয়াছে। বিবিসি প্রচারিত এক সংবাদভাষ্যে বলা হয়, শেষ পর্যায়ে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, জনমতের বিরুদ্ধে তাহারা আর ব্যবহৃত হইতে রাজী নন। বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের ধারায় বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা-পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের বিজয় যুক্ত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে এক নবতর ইতিহাস। রাজনৈতিক জোটের ও অপরাপর রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে এই মূহূর্তে সর্বাধিক ধৈর্য, সহনশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় রাখিতে হইবে। আন্দোলনের বিজয় অর্জন যেমন কঠিন, তেমনি সেই বিজয়কে ধরিয়া রাখা আরও কঠিন। সেই গুরুদায়িত্বভারই এই মূহূর্তে গোটা জাতির স্কন্ধে। জাতি অবশ্য এই গুরুদায়িত্ব পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এ বিষয়ে রাজনৈতিক যে দিক নির্দেশনা–উহা প্রদানে মূল দায়িত্ব পালন করিতে হইবে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেই। দুই জোটের নেত্রীর বক্তব্য ইতিমধ্যে দেশব্যাপী সম্প্রচারিত হইয়াছে। এই মূহূর্তে সকল রকম ভাবাবেগের উর্ধ্বে উঠিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে চালু রাখিবার উপরেই তাহারা উভয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। একটি চরম পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের পতন হইয়াছে। যতটা অরাজক অবস্থার আশঙ্কা করা হইয়াছিল সেই তুলনায় কিছুই হয় নাই। আমরা আশা করি, ধৈর্য ও সহনশীলতার এই প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত বজায় রাখা হইবে।
>
> বস্তুতঃ সকল রকম দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠিয়া এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু রাখার ব্যাপারটাই দলমত নির্বিশেষে সকলের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা এই দায়িত্ব পালনের জন্যই আজ সচেতন দেশবাসীর

প্রতি আহ্বান জানাইতেছি। কারণ সকল ধরনের আন্দোলনের বিজয়কে নস্যাৎ করিবার জন্য সবসময়ই কিছু না কিছু বর্ণচোরা মানুষ ঘাপটি মারিয়া থাকে। ইহারা কখনও আইনকে নিজেদের হাতে তুলিয়া নেওয়ার জন্য প্ররোচনা যোগায়। কখনও আন্দোলনের ঐক্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া আন্দোলনের বিষয়কে বিপথগামী করিবার প্রয়াস পায়। আবার কখনও নেতৃত্বের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় দলীয় সংকীর্ণতা ও তাহাদের বক্তব্যের মধ্যেও লুকানো থাকে বিভেদের বীজ। আন্দোলনরত সকল রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন পেশাজীবী ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বকে এইসব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে কোন অবস্থায় গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধ যাহাতে ক্ষুণ্ন হইতে না পারে, তজ্জন্য সচেতন সকলকেই আজ নিজ নিজ অবস্থানে থাকিয়াই জাতীয় দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের লক্ষ্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষমতায় বসানো নয়। ব্যক্তিস্বার্থ নয়, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে হইবে। জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ও একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠনের জন্যই গণতান্ত্রিক জীবনধারা বাস্তবায়িত করিতে হইবে। আর এই সুমহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা অবাধ নির্বাচন, জবাবদিহির সরকার, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন সুনিশ্চিত করিতে হইবে।

বাংলাদেশের জনগণ চিরকালই গণতন্ত্রপ্রিয়। গণতন্ত্রপ্রিয়তার জন্য এদেশের মানুষকে কম রক্ত দিতে হয় নাই। এবারের আন্দোলনেও বহু রক্ত ঝরিয়াছে। বহু লোক আহত হইয়াছেন। এক নদী রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এদেশের স্বাধীনতা তখনই ফলপ্রসূ হইবে–যখন নির্ভেজাল গণতন্ত্রের ধারায় দেশ শাসনের ব্যাপারে জনগণের শরিকানা হইবে নিরঙ্কুশ। আমরা সেই শুভ দিনের অপেক্ষায় রহিয়াছি। এবং আশা করিতেছি, ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের দূরদর্শিতাপূর্ণ সদিচ্ছা ও জাতীয়তাবোধসম্পন্ন শুভবুদ্ধিই এ বিষয়ে সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকিবে।[১৪৭]

১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে । সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করা। শিরোনাম ছিল: 'এই নূতন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের মধ্য দিয়া যে নূতন আশা ও প্রত্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই আলোকেই আমরা দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। আমরা বুঝি যে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হইয়াছে অবাধ নির্বাচন

> নিশ্চিত করার জন্য। তাই সব সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বর্তমান সরকারের কাজ নয়। তবু যে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব তাহা হইল যৌতুক ও বাল্যবিবাহ।
>
> যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা এখনো আমাদের সমাজ জীবনের অগ্রগতিকে নানাভাবে বিঘ্নিত ও বিপন্ন করিতেছে। নওগাঁর গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহের সংখ্যাধিক্য আমাদের অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সত্য ইহাই। যৌতুক ও বাল্যবিবাহ কতো অসহায় নারীর জীবনে যে করুণ পরিণতি ডাকিয়া আনিয়াছে তাহা সম্ভবত না বলিলেও চলে। এ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন সামাজিক অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য ইহার অবসান কতোখানি প্রয়োজনীয় ও জরুরী। যৌতুকের অভিশাপ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা ও জনমত গড়িয়া তোলার বিষয়টি আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। সমাজে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও পশ্চাদপদতা পুষিয়া রাখিয়া এই সব সামাজিক অনাচার দূর করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা বিস্তার ও আধুনিক চিন্তার প্রসার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
>
> কি কারণে সমাজে যৌতুক ও বাল্যবিবাহের মতো ঘটনাগুলি এখনো অব্যাহত আছে তাহাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। একদিকে অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়গুলি যেমন ইহার জন্য দায়ী, তেমনি অর্থনৈতিক অবস্থাও ইহার আর একটি বড়ো কারণ। তবে এ কথা সত্য যে, সমাজের সচ্ছল ও সম্পন্ন অংশের মধ্যেও যৌতুক-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যৌতুক বিবাহিত জীবনে যে কি ভয়াবহ পরিণতি ডাকিয়া আনিতেছে এবং কতো অসহায় নিরপরাধ গৃহবধূ যে যৌতুকের মর্মান্তিক শিকারে পরিণত হইয়া নানারূপ নিপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্যে দিন কাটাইতেছে তাহা সম্ভবত অধিক ব্যাখ্যা করাও নিষ্প্রয়োজন। এজন্য অবিলম্বে সামাজিক সচেতনতাবোধের উদ্বোধন ও সমাজের সচেতন অংশের মধ্যে উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়া যৌতুক ও বাল্যবিবাহের ভয়াবহ পরিণতি হইতে সমাজকে মুক্ত করার জন্য সকলেরই উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।[১৪৮]

১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির স্বার্থে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে তৎপর হওয়ার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রথমত: অবৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো। দ্বিতীয়ত: তল্লাশি অভিযান চালানো। শিরোনাম ছিল: 'শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পতনের পর আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যতটা অবনতি হওয়ার কথা ছিল কার্যতঃ তাহা হয় নাই, ইহা স্বীকার্য। ক্রুদ্ধ জনতা যথেষ্ট শৃংখলার পরিচয় দিয়াছে। ইহার উপর গত কয়েকদিনে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির আরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদ এই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবদান রাখার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অপরিহার্য। তাই কেহ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করিলে শক্ত হাতে তাহা প্রতিরোধ করিতে হইবে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এই আহবান জ্ঞাপন করার পরদিন পুলিশের আইজি এই লক্ষ্যে দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। স্মর্তব্য যে, বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দও আইন হাতে তুলিয়া না নেওয়ার আহবান জানাইয়াছেন।

জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে দলমত নির্বিশেষে সকলেরই সুবিবেচকের মত কাজ করা উচিত। এমন কিছু করা ঠিক নয় যাহাতে সামাজিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য বাড়ে। কিন্তু একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা এই বাঞ্ছিত পথ ধরিয়া চলার ধার ধারে না। গৃহস্থের ঘরে আগুন লাগিলে ইহারা আলু পোড়া দেওয়ার জন্য অস্থির হইয়া উঠে। ক্লান্তিকালের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাপ-দাদার আমলের বিরোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চায়। বর্তমানে কেহ তেমন অসুস্থ তৎপরতায় লিপ্ত হয়তো তাহা নয়। তবে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি না ঘটিলেও বোমাবাজি এবং হাঙ্গামা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়। চট্টগ্রামের একটি মিছিলের উপর একশ্রেণীর দুষ্কৃতকারী বোমা হামলা করে। ইহাতে প্রায় ২০ জন আহত হয়। ঢাকার নয়াটোলা এলাকায় দুই দলে আর একটি সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষেও একাধিক ব্যক্তি আহত হয়। নিঃসন্দেহে এইসব অবাঞ্ছিত ঘটনা। পুলিশ বিভাগের উচিত এহেন ঘটনার অভ্যুদয় প্রতিহত করার জন্য কাজ করিয়া যাওয়া।

অস্ত্রের ঝংকার এখন পক্ষকাল আগের মত নয়। ইহার অর্থ এই নয় যে, সব অস্ত্র উদ্ধার হইয়া গিয়াছে কিংবা ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। যেসব অস্ত্রের শব্দ শোনা যাইত, আসলে সেই সব অস্ত্র বিভিন্ন জনের হাতে রহিয়াছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এইসব অস্ত্র উদ্ধার করা প্রয়োজন। দুই ভাবে এই কাজ করা যাইতে পারে। এক, শুভবুদ্ধির প্রতি আহবান জানাইয়া। এবং দুই, তল্লাশি তৎপরতার মাধ্যমে। অস্ত্র জমা দেওয়ার আহবান উপেক্ষিত হওয়ার পরই দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি কারা সৃষ্টি করে, পুলিশ কর্তৃপক্ষের তাহা অজানা থাকার থাকার বিষয় নয়। এতদিন অজুহাত

ছিল বিশেষ মহলের চাপের জন্য অস্ত্র উদ্ধার করা যায় না। এখন সে অবস্থা প্রায় নাই বলিলেই চলে। সুতরাং পুরানা অজুহাত নূতন করিয়া তোলার অর্থ হইবে কর্তব্যে ফাঁকির নামান্তর। আমরা বিশ্বাস করিতে চাই না, তেমন মানসিকতা দেখাইতে কেহ প্রস্তুত। বলাবাহুল্য, শুধু সামাজিক শান্তি স্বস্তির জন্য নয়- স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করার এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যও ইহা জরুরী। সবাইকে বুঝিতে হইবে বর্তমান সরকারকে মূলতঃ নির্বাচন নিয়া ব্যস্ত থাকিতে হইবে। দেশে এই সময়ে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখিতে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকেই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।[১৪৯]

১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত আরেকটি সম্পাদকীয়তেও গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়। এই সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৯০ সালের বিজয় দিবসে জনগণের আনন্দ ও উল্লাস ১৯৭১ সালে অর্জিত মুক্তির আনন্দ ও স্বাদকেই মনে করিয়ে দিয়েছে। স্বাধীনতার সেই আশাবাদ ও স্বপ্নকে আবার নতুনভাবে ফিরিয়ে এনেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেই গণঅভ্যুত্থানের প্রধান বিজয় অর্জিত হবে। এই লক্ষ্যে সর্বস্তরের মানুষকে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করতে হবে। শিরোনাম ছিল: 'আজ মহান বিজয় দিবস'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

আজ ১৬ই ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। ১৯ বছর আগে এই দিনটিতে বাঙালী জাতি হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ও পাকিস্তানী শাসনের দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিল। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত মুক্তির সেই উল্লাস ও চেতনা আজও জাতির নিত্যদিনের চলার প্রেরণা ও পাথেয়। আজিকার এই মহান দিনে আমরা স্মরণ করি রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের আত্মত্যাগী শহীদদের- যাহারা রক্তের লাল রং জাতীয় পতাকার সূর্য-ব্যঞ্জনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আমরা স্মরণ করি মুক্তি পাগল জনগণের সেই আপোষহীন সংগ্রামী চেতনাকে-যাহা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে তীব্র ও দুর্দমনীয় প্রতিরোধের ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং যাহা ইতিহাসে বাঙালী জাতির জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছে একটি বিশাল সাফল্য ও গৌরবের স্থান।

এইবারের বিজয় দিবস নানা কারণে উজ্জ্বল ও অনন্য। দীর্ঘ সংগ্রামের পর এইবারই রাজনৈতিক পর্যায়ে জনগণের সম্মিলিত সংগ্রাম স্বৈরশাসনকে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করিয়া স্বাধীনতার নবতর অর্থ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। এইবারের বিজয় দিবসে জনগণের আনন্দ ও উল্লাস ১৯৭১ সালে অর্জিত সেই মুক্তির আনন্দ ও স্বাদকেই মনে করাইয়া

দেয়। স্বাধীনতার সংগ্রাম রাজনীতি ও সশস্ত্র পর্যায়ে শুরু হইয়াছিল যে চেতনাকে সামনে রাখিয়া, এইবারের বিজয় দিবসে সেই চেতনা পুনরায় প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে। সেই চেতনা হইল জাতিকে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে স্থিত করা এবং সময়ের ধারায় জাতিকে একটি গর্বিত ও স্বয়ংনির্ভর জাতি হিসাবে গঠন করা। নব্বইয়ের গণআন্দোলন জনগণের দাবীর ভাষায় সেই চেতনাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। জনগণের দাবীর মুখে ধসিয়া পড়িয়াছে স্বৈরশাসনের দুর্গ, গঠিত হইয়াছে নির্বাচনোত্তর একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ইতিমধ্যে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হইয়াছে আগামী ২রা মার্চ। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়া দেশে একটি সার্বভৌম পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহা হইবে নব্বইয়ের গণআন্দোলনেরই একটি প্রধান বিজয়।

গত উনিশটি বছর জাতি একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছে। 'বীরের রক্তস্রোত' ও 'মাতার অশ্রুধারা' কি বিফলে যাইবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই। স্বাধীনতার কিছুকাল পর রাজনীতিকে প্রথমে যেভাবে একদলীয় শাসনের জাতাকলে পিষ্ট করা হইয়াছে, পরে বিভিন্ন সময়ে নানা কৃত্রিম গণতান্ত্রিক মুখোশের আচ্ছাদনে রাজনীতিকে যেভাবে স্বৈরস্বার্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে স্বাধীনতার ছত্রচ্ছায়ায় জাতির বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়াটি কোনদিনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। হিসাব মিলাইতে গেলে দেখা যায়, উনিশ বছর পর রাজনীতির গায়ে অনেক কাদা ও কলঙ্ক, অর্থনীতি প্রায় মুখ থুবড়াইয়া পড়ার অবস্থা এবং সমাজের সর্বত্র ধস ও অবক্ষয়ের চিহ্ন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হইতে জাতির যাত্রা শুরু হইয়াছিল বিশাল এক আশাবাদ ও স্বপ্নের হাত ধরিয়া। হায়, উনিশ বছরের বেশীর ভাগটা স্বৈর শাসনের দাপট কাটাইতেই চলিয়া গেল।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান স্বাধীনতার সেই আশাবাদ ও স্বপ্নকে আবার নতুনভাবে ফিরাইয়া আনিয়াছে। আমরা আর ঠকিতে চাই না। চাই একটি বহমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। চাই ব্যক্তি উদ্যোগের আশা ও বিশ্বাসে উজ্জীবিত একটি গণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। চাই একটি নিরাপদ ও মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ। আগামীতে আমরা যেন স্বাধীনতার সুফলকে ঘরে তুলিতে পারি, এই হউক জাতি হিসাবে আমাদের প্রতিজ্ঞা। আমাদের অঙ্গীকার হউক জাতীয় ঐক্যের, আত্মশুদ্ধির এবং কর্মচেতনার। আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য হউক, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে অধিকার ও দায়িত্ববোধের উদ্বোধন।[১৫০]

১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে অস্থায়ী সরকারের তাদের মৌলিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকলেও প্রশাসন

আশানুরূপ তৎপর হচ্ছে না অভিহিত করে হতাশ ব্যক্ত করা হয়। সরকারের উপদেষ্টাদেরকে আরও দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রশাসন চাঙ্গা হইতেছে না কেন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় পক্ষকাল বাহিত হইতে চলিয়াছে। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী শুরু হইয়াছে রাজনৈতিক তৎপরতা--লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আগামী ২রা মার্চের নির্বাচন। ওই দিনটি আবার শবেবরাতের দিন বলিয়া গণনায় দেখা যাইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে ২রা মার্চের ইলেকশন দুই-একদিন আগাইয়া বা পিছাইয়া যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু দুই একদিন আগু-পিছুতে কিছু হইবে না-যদি নির্ধারিত সময়ে ভালোয় ভালোয় ইলেকশন হয়, ইলেকশন হইতে পারে। আসলে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বহু বাঞ্ছিত এই ইলেকশন হইতেই হইবে। কেননা ইহাই এবারের সকল আন্দোলন-কমিটমেন্ট, সার্বিক গণআন্দোলন বিজয়ের মৌল সাফল্য। যেকোন মূল্যে এই অর্জন করার জন্য গোটা জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একই কারণে গোটা জাতি অন্য কাহাকেও নয়, সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিসকেই তাহাদের অন্তর্বর্তী সরকার পরিচালনার জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনয়ন দিয়াছে। এবং আশা করিতেছে, যাহা কিছুই ঘটুক, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টাকে সবকিছুর উর্ধ্বে রাখিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতি তাহাদের বহু কাংক্ষিত ও বহু বাঞ্ছিত রাজনৈতিক সরকার লাভ করিবে।
>
> ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁহার এই মৌল দায়িত্বের বিষয়ে যথারীতি সচেতন থাকিয়াই কাজ করিয়া চলিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি নির্বাচন কমিশনও পুনর্গঠন করিয়াছেন। অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে তৎপরতা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন; কিছু কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তনও সাধন করিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য না করিয়া পারা যাইতেছে না যে, কখনও প্রশাসনের উদ্যোগে আবার কখনওবা বাহির হইতে প্রায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দল, মহল ও গোষ্ঠী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা দাবী-দাওয়া পেশ করিতেছেন। এইসব দাবীর ন্যায্যতা নিয়া কোন প্রশ্ন তুলিতেছি না। কিন্তু একটি অন্তর্বর্তী সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নিকট এধরনের দাবী-দাওয়া পেশ এবং উহা ফলাও করিয়া প্রকাশ ও প্রচারের ইহাই কি সময় ? এদিকে অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে যে, প্রশাসনিক কাজকর্ম প্রায় অচল অবস্থায় রহিয়াছে--ব্যাংকের কাজকর্মসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েটসহ কোন কোন স্থানে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু যাহা করিবার তাহা সময়ক্ষেপণ না

করিয়াই সম্পন্ন করা ঠিক হইবে। তাহা হইলে সরকারী আমলা-কর্মচারীরা অনিশ্চয়তায় ভুগিতেছেন বলিতে পারিবেন না।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট অবশ্য মিনিস্টারের পদ মর্যাদায় প্রায় একডজন উপদেষ্টা গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা গিয়াছিল, এই উপদেষ্টা মহলের যথাযথ তৎপরতায় গৃহীত পদক্ষেপে প্রশাসনিক কার্যকর্মের অচলাবস্থা দূরীভূত হইবে। বস্তুতঃ দেশবাসী ক্ষমতাসীন কাহারও নিকট হইতে এখন আর বক্তৃতা-বিবৃতি বেশী শুনিতে চায় না--তাহারা কাজ দেখিতে চায়। প্রশাসন কতটা চাঙ্গা করা হইয়াছে, বিদ্যমান অচলাবস্থা ভাঙ্গিয়া শিল্প কল-কারখানায় উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ অর্থনীতি কতটা সচল হইয়া উঠিয়াছে, উহার উপরে উপদেষ্টাদের সার্থকতাও নির্ভরশীল বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ, সরকার পরিচালনার দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যাইবার জন্যই প্রধানতঃ তাঁহাদেরকে উপদেষ্টা হিসাবে নেওয়া হইয়াছে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়কে নিয়া। সবচাইতে বড় কথা সময় হিসাবে তিনমাস যত কম সময়ই হউক, এই সময়কালের মধ্যে উপদেষ্টা পরিষদ সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও কে কতটা দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় রাখিতেছেন, গোটা জাতি তাহাও আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া যাইতেছে।

বস্তুতঃ আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না, অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে কাহারা এতসব দাবী-দাওয়া "ধৈর্য সহকারে শ্রবণের এবং উহা বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদানের" সুপরামর্শ দিতেছেন। আমরা বরং দাবী-দাওয়া পেশকারীদের প্রতি অনুরোধ জানাইব– তাঁহারা বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দলের নিকট তাহাদের দাবী-দাওয়া পেশ করণ। প্রয়োজনে ওই সব দাবী-দাওয়া কোন কোন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্যুতেও পরিণত হইতে পারে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের নির্ধারিত সময়ে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মত জাতীয় মূল উদ্দেশ্য সাধন ও মৌল দায়িত্ব পালনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কোনক্রমেই উচিত হইবে না। অন্তর্বর্তী সরকারেরও উচিত হইবে না ইহাকে প্রশ্রয়দান করা। কারণ, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে যে উচিত হইবে না, ইহা স্বয়ং অস্থায়ী প্রেসিডেন্টেরই ঘোষণা।[১৫১]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দৈনিক বাংলা বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। সম্পাদকীয়তে নব্বইর গণঅভ্যুত্থান সফল করে তোলার জন্য ছাত্র ও তরুণ সমাজের প্রশংসা করা হয় এবং গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে

আনার গুরুদায়িত্ব তাদেরই গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিজয় সংহত করতে হবে'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> স্বপ্নের সোনালী দিন হাতে পেয়ে জাতি আজ আনন্দ-উদ্বেল। স্বল্প বিরতির পর দেশবাসীর পাশে ফিরে আসার আনন্দে আমাদের আনন্দও আজ সীমাহীন। এ এমন এক আনন্দ যা কেবল উপলব্ধিই করা চলে-ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গোটা বাংলাদেশ আজ মুখর মুক্ত আত্মার উল্লাস ধ্বনিতে। এই আনন্দ-উল্লাসে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা অভিনন্দন জানাই নব্বইর এ নতুন ডিসেম্বরের স্থপতিদের, সালাম জানাই সকল শহীদান আর ত্যাগীবীর জনতার প্রতি।
>
> একটি গণতান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থার দীর্ঘ লালিত আর বার বার বিপর্যস্ত স্বপ্নের বাস্তবায়নের পথে নব্বইর এ ডিসেম্বরে যে বিজয় অর্জিত হল তা এ জাতির জীবনে অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। এই বিজয়ের এক মহান সৌন্দর্য গোটা জাতি আজ একটি প্রত্যাশাকে সামনে রেখে নজীরবিহীন ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। আজকের এই বিজয়ের পতাকাবাহী দুই জননেত্রীও তাই গণ-ঐক্যকেই এই সাফল্যের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাম্প্রতিক সকল বিবৃতি আর বক্তৃতায় এই ঐক্যকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যাশা, আজকের সকল আনন্দের সঙ্গে এই ঐক্যও অক্ষয় হোক আমাদের জীবনে।
>
> আনন্দ-উল্লাস প্রকাশের পাশাপাশি এই গুরুতর প্রসঙ্গের অবতারণা অহেতুক নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি বিজয়, সে যত বড়ই হোক, শেষ কথা নয়। ফসল ফলানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন আছে সে ফসল ঘরে তোলা আর সংরক্ষণের উপযুক্ত প্রস্তুতির। আমাদের ভরসা একটাই, ক্রান্তির এ সংকট কালে আমাদের নেতৃবৃন্দ সময়ের এ দাবীর ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন রয়েছেন, বিজয়ের প্রথম প্রভাতে প্রদত্ত ভাষণে দুই নেত্রীর আহ্বানে যার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁরা ঐক্য অটুটু রাখা আর শৃংখলার আহ্বান জানিয়েছেন।
>
> ব্যাপক পরিবর্তনের উদ্দাম মুহূর্তে শৃংখলাকে ঐক্য থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। আদতে সকল স্তর আর পর্যায়ের শৃংখলাই কেবল ঐক্যের ভিত মজবুত করে তুলতে পারে। আমাদের আজ মনে রাখতে হবে, বিশৃংখলার ছিদ্রপথ দিয়েই কেবল কুচক্র তার কালো থাবা বিস্তারের সুযোগ পায়। আর জনতার বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার কুচক্রের কখনো অভাব ঘটেনি। এখন কিংবা অদূর ভবিষ্যতেও যে হবে না এমন কথা জোর করে বলার উপায় নেই। আমরা তাই দুই নেত্রীর আহ্বানের প্রতি সকল শ্রেণীর নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অর্জিত বিজয়কে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হলে এই আহ্বানের সচেতন ও সতর্ক প্রতিপালন অপরিহার্য।

নব্বইর ডিসেম্বরকে সফল করে তোলার সাফল্য যদি এককভাবে কাউকে দিতে হয় তবে অবশ্যই তা আমাদের সচেতন ও দৃঢ়চেতা ছাত্র ও তরুণ সমাজকেই দিতে হবে। তাদের কঠোর শ্রম আর ত্যাগই বিজয়ের ভিত সুদৃঢ় ঐক্যকে সম্ভব করে তুলেছিল। আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, গা ছেড়ে দেয়ার সময় তাদের এখনো আসেনি। বলিষ্ঠতর নিষ্ঠা নিয়ে শান্তি ও শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখার গুরুদায়িত্ব আজ তাদেরই পালন করতে হবে।[১৫২]

১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর এ ধরনের আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। সম্পাদকীয়তে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অস্থায়ী সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করা হয় এবং প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য সরকারের তৎপরতা আশাবাদের সঞ্চার ঘটিয়েছে বলেও মন্তব্য করা হয়। এই পরিস্থিতিতে গণঅভ্যুত্থানের পূর্ণ বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে সকল স্তরের জনসাধারণকে নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে সক্রিয় হয়ে উঠার আহ্বান জানানো হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের স্বার্থে'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

স্বৈরাচারী শাসন অবসানের পর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পূর্ণতা প্রদানের প্রক্রিয়া সফল হয়েছে। এ ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচেষ্টা সকল শ্রেণীর মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ মঙ্গলবার সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই মহান দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস লাভ করেন। ঘরে কিংবা বাইরে যে কোন হুমকীর মুখে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, তাদের সতর্কতা আর সহযোগিতা গোটা জাতির দীর্ঘ লালিত প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কেবল সশস্ত্র বাহিনীই নয়, সকল স্তরের জনগণসহ আইন শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিটি ব্যক্তি ও সংগঠনকেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য অবদান রাখতে হবে। অস্ত্রবাজি আর গণতান্ত্রিক আন্দোলন পাশাপাশি চলতে পারে না। অস্বীকার করার উপায় নেই, যেভাবেই হোক, দেশে আজ বিপুলসংখ্যক অস্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বেআইনী অস্ত্রের ব্যবহার আর অধিকার উভয়ই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকার তাই বেআইনী অস্ত্রধারীদের জন্য কঠোরতর শাস্তির বিধানসহ একটি নয় অধ্যাদেশ জারী করেছেন। শাস্তি প্রদানের চেয়ে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারই এই অধ্যাদেশের মূল লক্ষ্য বলে আমরা মনে করি। আইন শৃংখলা

কর্তৃপক্ষ যদি উপযুক্ত গুরুত্বসহ এই অধ্যাদেশ প্রয়োগে ব্রতী হন, আমাদের বিশ্বাস, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ সহজতর হবে। তবে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং জোটকে আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে এর আগেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তৎপর হলে লক্ষ অর্জনে বিঘ্ন ঘটবে না।

নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলসমূহের আচরণবিধি প্রণয়নের দাবিও উত্থাপিত হচ্ছে। দেশের প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সফল করে তুলতে হলে এ বিষয়টিও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। একটি সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটেছে। এই বিজয় সংহত হওয়ার ব্যাপারটি পুরোপুরি নির্ভর করছে আসন্ন নির্বাচনের সাফল্যের উপর। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাতে সম্মিলিত লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয় ঐক্যে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে তা নিশ্চিত করা আবশ্যিক। একটি সুস্পষ্ট নীতিমালার আওতায় আচরণ নিয়ন্ত্রিত রাখার প্রয়োজন তাই অনস্বীকার্য। এভাবেই সকলের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চত হতে পারে।

উপসংহারে আমরা আবারো বলতে চাই, প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রশ্নে অন্তর্বর্তী সরকারের তৎপরতা একটি দৃপ্ত আশাবাদের সঞ্চার ঘটিয়েছে। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে বিজয়ী জাতি এ আশাবাদকে ব্যর্থ হতে দিতে পারে না। অবস্থান নির্বিশেষে সকলেই তাই নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে সক্রিয় হয়ে উঠবেন বলেই আমরা আশা করি। আমাদের মনে রাখতে হবে, পরিপূর্ণ বিজয়ের সুযোগ বারবার আসে না।[১৫৩]

পরদিন ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর এ ধরনের আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তা সমুন্নত রাখার জন্য উন্নত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অপরিহার্য। তাই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে কোন দল বা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে নিরপেক্ষভাবে জাতির সেবা করার আহ্বান জানানো হয়। শিরোনাম ছিল: 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ মঙ্গলবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কোন দল বা ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে না। তিনি আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে কোন দ্বিধা না করার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। কেননা, দেশে শান্তি শৃঙ্খলা এখন আমাদের জাতীয় সত্তাকে রক্ষা ও তাকে সমুন্নত রাখার জন্য অপরিহার্য। দেশ এখন স্বৈরশাসনের কবলমুক্ত। এর জন্য জনসাধারণকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। দেশবাসী এখন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এই লক্ষ্যে আগামী তিন মাসের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের এই প্রক্রিয়াকে সবাই মিলে সফল করে তুলতে হবে। এই নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ সেজন্য প্রয়োজন শান্তিশৃঙ্খলার নিশ্চয়তা। অন্যদিকে উন্নয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্যও শান্তিশৃঙ্খলা অপরিহার্য। গত কয়েক মাসে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়েছে; উৎপাদনও ব্যাহত হয়েছে। এতে যে ক্ষতি হয়েছে তা এখন পুষিয়ে নিতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে দেশে শান্তি চাই, শৃঙ্খলা চাই; পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা চাই। তাই এই সময় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তেমনি তাতে জনগণের সহায়তাও প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্ট আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে কোন দল বা ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন না করার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আইন অন্ধ ও তা সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। আমাদের মতে আইন ও শৃঙ্খলা যথাযথভাবে রক্ষার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের এই উক্তি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে বিশেষ করে আইন ও শৃঙ্খলারক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে মনে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে তা প্রয়োগ করতে হবে।

অতীতে বিভিন্ন সময় আইন ও শৃঙ্খলারক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হয় নাই। তাদেরকে কখনো কোন দল বা ব্যক্তির সেবা করতে বাধ্য করা হয়েছে। এর ফলে তাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব হয়নি। দল বা ব্যক্তির স্বার্থের যুপকাষ্ঠে প্রশাসনের নিরপেক্ষতাকে বলি দেয়ার ফলে জনগণের স্বার্থ বারবার বিপন্ন হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। ব্যাপক রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অর্থ হল বহু মত ও বহু দলের সহাবস্থান। এসব দলের কোনটার প্রতি পক্ষপাত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ তথা সামগ্রিক প্রশাসন এসব দল বা কোন ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নয়। তারা জনগণের সেবক। জাতির সেবক। কোন দলের প্রতিই তাদের আনুগত্যের প্রশ্ন ওঠে না। তাদের কাছে সব দলই সমান। সুতরাং অবশ্যই তাদের

আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং আইনলংঘনকারী কোন দল বা ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা চলবে না। অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই দেখতে হবে তা সে যে দলের লোকই হোক না কেন। এই নিরপেক্ষতা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তা সমুন্নত রাখার জন্য অপরিহার্য।

পাশাপাশি আমরা আশা করব যে, কোন দল বা যে ব্যক্তি অতীতের মতো যেন আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের উপর অন্যায় প্রভাব সৃষ্টি না করে, যেন তারা তাদের নিরপেক্ষভাবে জাতির সেবা করার সুযোগ দেয়।[১৫৪]

১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে আরও দু'টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। 'জাতীয় স্বার্থ ও ব্যবসায়' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে জাতীয় জীবনের বর্তমান সন্ধিলগ্নে ব্যক্তিগত মুনাফার চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ী সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ও পরিবহণ মালিক প্রতিনিধিদের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি সার্বিক অর্থনৈতিক তৎপরতা জোরদার করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যমূল্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক তৎপরতা জোরদার করার গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এর আগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও এ বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের নজর আকৃষ্ট করেছেন। ব্যবসায়ী ও ব্যবস্থাপক প্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্টকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন জেনে আমরা আশ্বস্ত বোধ করছি। তবে এ আশ্বাসকে কেবল কথার কথা না রেখে কাজে পরিণত করার প্রয়োজন রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট কোনো রাখঢাক না করেই জানিয়েছেন যে, তাঁর সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান। ফলে একান্ত বাধ্য না হলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁরা নেবেন না। এ অবস্থায়ও অর্থনীতিকে জোরদার করে তোলা ও দ্রব্যমূল্য কমানোর তাগিদই প্রমাণ করে বিষয়টি কত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদতে এ বিষয়টিকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান থেকে ভিন্ন করে দেখারও উপায় নেই। দ্রব্যমূল্য এমনিতেই জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এ পরিস্থিতির সামান্যতম অবনতি ব্যাপক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্যদিকে এমনিতেই দুর্বল অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ফলে একটা নাজুক অবস্থা তৈরী

হয়ে আছে। এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেয়া হলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই বিঘ্নিত হতে পারে। বিষয়টি তাই সকল বিবেচনাতেই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

অর্থনৈতিক অবস্থার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মূলত বিদেশী সাহায্য-নির্ভর। রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উন্নতি দেখা দেয়ার ফলে বর্ধিত সাহায্যের একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে প্রদত্ত সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত না হলে সাহায্যদাতাদের উদারতা কোনোক্রমেই স্থায়িত্ব পেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট যথার্থই ব্যাঙ্ক ঋণ আদায়ের উপর জোর দিয়েছেন। বিগত কয়েক বছর ধরেই ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবহার ও প্রদত্ত ঋণ অনাদায়ী পড়ে থাকা নিয়ে নানা ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সব অভিযোগ যে অমূলক নয় তারও নানা প্রমাণ রয়েছে। তবে রাজনৈতিক কারণেই তার কোনো সুরাহা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। যার ফলে সার্বিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। পটপরিবর্তনের ফলে এইসব অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলা দূর করে গোটা কর্মসূচীকে যথার্থ অর্থে উন্নয়নমুখী করে তোলার সুযোগ এসেছে। নির্বাচিত সরকারের অপেক্ষায় বসে থাকলে এ সুযোগ হারিয়ে যেতে বাধ্য। আমরা তাই মনে করি, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এর ফয়সালা হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কঠোরতম ব্যবস্থাও নন্দিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারটি উৎপাদন আর সরবরাহনির্ভর হলেও ব্যবসায়ী সমাজের এক্ষেত্রে যথেষ্ট করণীয় রয়েছে। লাভের অংশে সামান্য ছাড় দিয়ে বাজার-কারচুপি পরিহার করলে দ্রব্যমূল্য সহজেই জনসাধারণের আয়ত্তে আসতে পারে। জাতি আজ ব্যবসায়ী সমাজের কাছে এটুকু উদারতা ও সহযোগিতা দাবী করে। আমাদের ব্যবসায়ী সমাজ জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে এটুকু দেশপ্রেমের প্রমাণ রাখতে ব্যর্থ হবেন না বলেই আমাদের প্রত্যাশা। বস্তুত, ব্যক্তিগত মুনাফার চেয়ে জাতীয় উন্নতি ব্যক্তির স্বার্থেও অধিকতর কাম্য।[১৫৫]

একইদিন অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর এ ধরনের অপর সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় যে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী আনন্দ ও বিজয় উৎসবের বিপরীতে সমাজবিরোধী কিছু মানুষ নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সম্পাদকীয়তে সতর্ক করা হয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে গণঅভ্যুত্থানের অভীষ্ট লক্ষ্য বানচাল হওয়ার আশংকা রয়েছে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'সুযোগ সন্ধানীদের বিরুদ্ধে'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

দেশের আপামর মানুষ যখন আনন্দ ও বিজয় উৎসবে মেতে আছে তখন কিছুসংখ্যক সমাজবিরোধী মানুষ অপকর্মে লিপ্ত হয়ে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিকে নাজুক করার প্রয়াস পাচ্ছে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় দু' একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে। নিমতলীতে বাটার দোকানে হামলা করে কয়েকজন সশস্ত্র লোক ক্যাশের টাকা ও জুতা লুট করেছে। ধানমন্ডী এলাকায় একজন ছিনতাইকারী অর্ধলক্ষ টাকা হাতিয়েছে। তিনি অবশ্য ধরা পড়ে গেছেন। ঝিনাইদহ থেকে আমাদের সংবাদদাতা দুঃসাহসিক এক ডাকাতির খবর জানিয়েছেন। শহরের কাছেই বোমা ফাটিয়ে ডাকাতরা ব্যাংক এবং বাজার লুট করেছে।

সমাজে দুষ্কৃতকারীদের অস্তিত্ব সব সময়েই আছে। এরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এই বিশেষ আনন্দের সময়ে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পথে নেমে আসছে তখন সেই ভিড়ের মধ্যে গা মিলিয়ে সমাজবিরোধী ও সুযোগ সন্ধানীরাও তাদের কাজে নেমে পড়েছে। জনসাধারণকে তাই সতর্ক হতে হবে। আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে যারা আছেন তাদেরও কঠোর হতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ আইন-শৃংখলার পক্ষে। তারা নিরাপত্তা চায়, শান্তি ও শৃংখলা বজায় থাকুক এ রকম পরিস্থিতি কামনা করে। তবে একথা সত্যি যে সবার নাগরিকতাবোধ খুব প্রখর নাও হতে পারে। হুজুগের বশে দু'এক সময় কেউ কেউ কিছু বিশৃংখলা সৃষ্টি করেও ফেলতে পারেন। এই রকম আচরণের বিরুদ্ধেই সবাইকে সচেতন হতে হবে। কারণ সমাজবিরোধীরা এই জাতীয় বিশৃংখলাকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

জাতির জন্য এখন এক উজ্জ্বল মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে বিজয় দিবসের আনন্দোৎসবের সঙ্গে এখন মিলিত হয়েছে। গণতন্ত্রে উত্তরণের স্বপ্ন। এই বিশেষ সময় আইন-শৃংখলার রশি শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত জরুরী। চুরি ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা সব সময়েই ঘটেছে এবং ঘটতে পারে একথা সত্যি। তবে নিয়ন্ত্রণ কঠোর হলে সমাজবিরোধীরা মাথা তোলার বিশেষ সাহস পায় না। পরিস্থিতি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তাছাড়া কোন বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে দুষ্কৃতকারীরা জনস্বার্থ বিরোধী ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হবে এটা প্রত্যাশিত নয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য বানচাল হয়ে যাবার আশংকা আছে।[১৫৬]

১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর এ ধরনের আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায়। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অপরিহার্য। চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাতিকে আশাবাদী করে

তুলেছে। এই শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান সবসময় ধরে রাখার আহ্বান জানানো হয় এই সম্পাদকীয়তে। এর শিরোনাম ছিল: 'সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে আজ জাতির জীবনে নতুন প্রভাতের সূচনা ঘটিয়েছে। জনতার এই জয়ের প্রেরণাদৃপ্ত বিজয় দিবস উদযাপনেও এই ঐক্য চেতনার প্রভাব সকল মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভিন্ন মতের অনুসারীদের পাশাপাশি অবস্থান আর পারস্পরিক সহযোগিতাই বিজয় উৎসবের বিশাল আয়োজনকে সম্ভব করে তুলেছে। তবে তার চেয়েও বড় কথা এই সহনশীলতা আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আস্থাকে করেছে দৃঢ়তর। গণতন্ত্রের বিকাশের জন্যে এটুকু সহনশীলতা অপরিহার্য। কেননা সহনশীলতা আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই কেবল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গতিসঞ্চারে সক্ষম। আমরা সহনশীলতার এই বিকাশকে স্বাগত জানাই। বিজয়োৎসবে যে ঐক্য চেতনা পরিলক্ষিত হয়েছে দেশ ও জীবনের সর্বস্তরে তার বিস্তার ঘটুক।
> আমরা এই সত্যটির প্রতি আবারও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, জনতার যে ঐক্য একাত্তরের বিজয় সম্ভব করেছিল সেই ঐক্যই নব্বইর বিজয়কে সম্ভব করেছে, আর এ বিজয় চূড়ান্ত বিজয় নয়--লক্ষ্য অর্জনের পথে একধাপ অগ্রগতি। চূড়ান্ত লক্ষ্য গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা আর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন পর্যন্ত এ ঐক্যকে ধরে রাখতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, সহনশীলতা আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই কেবল ঐক্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম।
>
> ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা এই জনপদের দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন হলেও গণতন্ত্র এদেশে যথার্থ পরীক্ষার অবকাশও কখনো পায়নি। আমাদের আচরণে তাই গণতান্ত্রিকতার পরিপোষকতা সর্বক্ষণ উপস্থিত না থাকায় অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। নেই বলেই সচেতনতা প্রয়োজন। আশার কথা বিগত আন্দোলনে আমাদের তরুণ-সমাজ এবং নেতৃবৃন্দ এই সচেতনতার প্রশংসনীয় নজীর স্থাপন করেছেন। নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক আচরণের উপর এখনো জোর দিয়ে যাচ্ছেন। তার সুফলও পরিলক্ষিত হয়েছে। আজ তাই সর্বস্তরেই দেখা যাচ্ছে আশাবাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। এই ঔজ্জ্বল্যকে যাতে কোনো মালিন্য স্পর্শ করতে না পারে সে জন্যে এগুতে হবে আরো সতর্কতার সঙ্গে।
>
> গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে সকল মতের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। আর এই সহ-অবস্থানের পরিপূরক পরিবেশ কেবলমাত্র সহনশীলতা আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ দ্বারাই তৈরী করা সম্ভব।[১৫৭]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সংবাদ বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদে। সম্পাদকীয়তে গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ে আত্মহারা না হয়ে অশুভশক্তির চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে বৃহত্তর ঐক্যকে মজবুত করার পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বৈরশাসনমুক্ত স্বদেশে বিজয়ী ছাত্র-জনতার প্রতি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> আজ জনগণ বিজয়ী। ঐক্যবদ্ধ গণদাবী আর দেশবাসীর মরণজয়ী আন্দোলনের মুখে দীর্ঘ নয় বছরব্যাপী এক ব্যক্তির শাসন-নিপীড়নের অবসান হয়েছে। ১৯৮৭ সালে স্বৈরশাসনের পতনের লক্ষ্যে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' শ্লোগান বুকে-পিঠে লিখে তরুণ নূর হোসেন প্রাণ দিয়েছিল। তারও আগে ট্রাকের চাকার তলে দু'জন তরুণকে পিষ্ট করে মিছিলের গতি রুদ্ধ করতে চেষ্টা হয়েছিল। আজ গণঅভ্যুত্থান স্বৈরশাসকের সেই মৃত্যুবাণ ব্যর্থ করে দিয়েছে। এরশাদ শেষ পর্যন্ত কোটি জনগণের ধিক্কার নিয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।
>
> গত মঙ্গলবার রাতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগের দিন রাতে তিনি বলেছিলেন যে, নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু বিরোধী তিন জোট ও রাজনৈতিক দলগুলো তার এই ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছিল তৎক্ষণাৎ এবং আন্দোলন আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। তারা অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবীতে অনড় থাকে।
>
> এক সপ্তাহ আগে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এবং কার্ফু দিয়ে ক্ষমতাসীনরা আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু দাবানলের মত গ্রামে-গঞ্জে ও বন্দরে ছড়িয়ে পড়া গণআন্দোলন ততক্ষণে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। সপ্তাহকাল ধরে জরুরী অবস্থা ও কার্ফু ভেঙ্গে, মৃত্যুর ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে ছাত্র-জনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়। এই সময়ে সরকারবিরোধী আন্দোলনে ৭০ জনের ওপর প্রাণ দেয় এবং হাজারের ওপর লোক আহত হয়।
>
> জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে সকল সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ বন্ধ রাখা হয়। গণআন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত হয়ে স্বৈরশাসনের দুর্গে ফাটল ধরায় ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-জনতা সরকারের জরুরী অবস্থা ও কার্য অগ্রাহ্য করে সকল দমননীতি ও হত্যা সত্ত্বেও অবিচল থাকে। গণঅভ্যুত্থানের এই অপ্রতিহত শক্তিকে মোকাবেলা করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
>
> জনতার এই প্রবল জোয়ারে স্বৈরশাসনের তখত তাউস ভেসে গেল।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে শেষ ও প্রবল বাধা অপসারিত হল এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণার মধ্য দিয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও তিন জোটের বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এক জাতীয় ঐক্যে রূপান্তরিত হয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই প্রাথমিক বিজয় ঐতিহাসিক। আর বিজয়ের ধারাকে জাতীয় জীবনে দৃঢ়মূল করার দায়িত্ব আন্দোলনে শামিল সকল জোট ও গণ সংগঠনের। এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রক্রিয়া এবং এ রকম একটি সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার জন্য গণতন্ত্রের সংগ্রামে শহীদের রক্তে গড়া এই ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। যশোলোভ, ক্ষমতার লোভ, অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রলোভনকে জয় করে এই দেশের গণমানুষের স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হবে। গণতন্ত্রের অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠাই গণমানুষের স্বার্থরক্ষা, তাদের কল্যাণ সাধনের একমাত্র উপায়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি।

বিজয়ী জনগণকে এ জন্য আত্মহারা হলে চলবে না। যে শান্ত ও সুশৃংখল মনোভাব নিয়ে তারা বিজয় উল্লাসে রাজপথ প্লাবিত করেছে তা বজায় রেখে সকল ধরনের উস্কানির মুখে নিজেদের সংযত রাখতে হবে। গণতন্ত্রের অন্যতম সংজ্ঞা হল আত্মসংযম। অপরের মত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ও পরমত সহিষ্ণুতার সঙ্গে এই সংযমের ধারাকে যুক্ত করতে হবে।

বিজয়ের মুহূর্তে অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে বিভেদের শক্তি মাথাচাড়া দেয় শুভার্থীর ছদ্মবেশে। ঠিক যেমন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে জঙ্গী রূপ দেয়ার অজুহাত দেখিয়ে উস্কানিদাতা চরেরা উত্তেজনা সৃষ্টি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সহিংসতার পথে চালিত করার চেষ্টা করে। আমাদের মনোজগতে বিভেদের প্রাচীর তোলে বিদ্বেষের বিষবাষ্পে। তাই সর্বপ্রকার অশুভশক্তির চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থেকে এই বৃহত্তর ঐক্যকে আরও মজবুত করতে হবে। আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই। একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমের সকল ধাপে ধাপে এই ঐক্যের শক্তিকে অবশ্যই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

রাজনৈতিক দলসমূহ তথা তিন জোট, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এক কথায় ছাত্র-জনতা রাজপথে ঢেলে দেয়া তাদের রক্তমূল্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছে। একমাত্র ঐক্য বজায় রেখেই এই অর্জিত বিজয় ও সাফল্যকে উত্তরোত্তর কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

দেশবাসীকে এবং আন্দোলনে শামিল ছাত্র-জনতাকে মনে রাখতে হবে যে, একদা অশুভ শক্তির চক্রান্ত স্বাধীনতার স্বপ্ন একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার পথ বার বার বাধাগ্রস্ত করেছে। দেশবাসী কোন মেঘাচ্ছন্ন দিন কিংবা কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের

ক্ষণিক উদ্ভাসের জন্য রক্ত দেয়নি। চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার দায়িত্ব বহন গণতন্ত্র অনুশীলন ছাড়া সম্ভব নয়।

আমাদের গণতন্ত্রের আকাশে আর দুর্যোগের ঘনঘটাকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না এই সংকল্প ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-জনতার এবং রাজনৈতিক দলসমূহকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা কথায় নয়, ক্রমাগত কাজের মধ্যদিয়ে প্রমাণ করতে হবে।

যে সঙ্কল্প, সাহস ও দৃঢ়তা আজ জয়ী হয়েছে উদ্যত সঙ্গীনের মুখে তার ভিত্তি ব্যাপক ছাত্র-জনতার ঐক্য, যা এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মত সমগ্র দেশকে অবিচল রেখেছে ভয়ের ভ্রূকুটি ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করে, তাকে এক মুহূর্তের জন্য শিথিল না করার জন্য গণতন্ত্রকামী সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকে সচেতন থাকতে হবে।

এই ব্যাপকভিত্তিক ঐক্য সম্বল করে দেশবাসী দুর্গম পথ অতিক্রম শেষে আজ ঘোষণা করেছে জনতার জয়; দৃঢ় হাতে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে ভূলুণ্ঠিত গণতন্ত্রের পতাকা। প্রমাণ করেছে স্বৈরশাসকের সন্ত্রাস ও হানাহানির অন্ধকারে কখনো ইতিহাসের জয়ধ্বজা ওঠে না। প্রমাণ করেছে অপরাজেয় ঐক্যবদ্ধ জনতার শক্তি।

স্বৈরশাসনের শৃঙখলমুক্তির জন্য যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন সেই শহীদদের উদ্দেশ্যে ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি আর বিজয়ী অকুতোভয় জনতার প্রতি রইল আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন।[১৫৮]

১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর সংবাদে এ ধরনের আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দায়িত্বগ্রহণকারী অস্থায়ী সরকারের মুখ্য কাজ হচ্ছে একটি জবাবদিহিমূলক নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তাই এই কাজে অস্থায়ী সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য সকল দলমত, শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এই সম্পাদকীয়তে। এর শিরোনাম ছিল: 'আগে প্রয়োজন সাফল্যকে সংহত করা'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশে সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে। গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দলসমূহ ও ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলেই নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব হলো।
>
> রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি রাজনীতিকদের এবং ব্যাপক অর্থে দেশবাসীর নিকট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে সহায়তা করার আহ্বান জানান।

গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গণআন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ছাত্র-জনতার দাবী ছিল সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান।

সুতরাং তাঁর প্রধান ও প্রাথমিক কাজটি সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করাই সকল রাজনৈতিক দল, গণসংগঠন এবং সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী, ছাত্র-শ্রমিক-জনতার কর্তব্য।

দীর্ঘ ৯ বছরের স্বৈরশাসন ও এক ব্যক্তির খেয়ালখুশীমত দেশ পরিচালনার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনেক অনিয়ম, অব্যবস্থা চলেছে। শুধু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোই ধ্বংস হয়নি, অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়েছে। আর এসব মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন গণসংগঠন, রাজনৈতিক দল, শ্রমিক কর্মচারী ও কৃষকদের বহু দাবী-দাওয়া রয়েছে। এসব দাবী নিয়ে তারা বহু আন্দোলন করেছেন।

জনগণের ইচ্ছানুযায়ী একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের পর অনেকে মনে করতে পারেন যে, তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের এবং দুঃখ- দুর্দশা নিরসনের জন্য এখনই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তারা এখনই এসব দাবী-দাওয়া নিয়ে অস্থায়ী সরকারের নিকট হয়তো উপস্থিত হওয়ার আশা পোষণ করতে পারেন। তাদের এ ধরনের আশা অসঙ্গত কিছু নয়।

কিন্তু তাদের দুটো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমতঃ এই সরকার একটি অস্থায়ী সরকার এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সার্বভৌম জাতীয় সংসদের একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এর মুখ্য দায়িত্ব।

তাই এই অস্থায়ী সরকারের পক্ষে এ মুহূর্তে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের দাবী-দাওয়া পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব নয়। দাবী-দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন এ মুহূর্তে আন্দোলন শুরু করলে প্রাথমিক কাজটিই পণ্ড হবার সমূহ সম্ভাবনা। কারণ, দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে পক্ষ-বিপক্ষ থাকবে, আন্দোলনের রূপ ও ধারা নিয়ে বিভিন্ন মতের বিষয়টি সামনে আসবে। ফলে মূল দাবী অর্থাৎ জনগণের নিকট জবাবদিহিকারী একটি প্রকৃত জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের কর্মসূচী পিছনে পড়বে। নানারূপ স্বার্থের দ্বন্দ্ব বড় হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয়ত: অস্থায়ী সরকারের পক্ষে এই মুহূর্তে দীর্ঘকালীন স্বৈরশাসনের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্দশা, সামাজিক অস্থিরতার মূল কারণ, উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপর্যয়, অনিয়ম, শিল্পে অশান্তি ইত্যাদি দূর করা রাতারাতি সম্ভব নয়। এ জন্য চাই প্রথমত: শান্তি ও শৃংখলার পরিবেশ। সকলকেই এই পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করতে হবে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলসমূহ ও দেশবাসীর নিকট সেই সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরই সম্ভব হবে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে আর্থিক বিপর্যয়সহ বিভিন্ন অনিয়ম ও অন্যায়ের প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। বর্তমান অস্থায়ী সরকার সংবিধানে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যাতে তার এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন তার প্রতি সর্বপ্রথম নজর দেয়া কর্তব্য।

এই দাবী আদায়ের জন্য রাজপথে ছাত্র-জনতা চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে। বহু ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন।

সেই ত্যাগের মনোভাব নিয়েই শ্রমিক-কর্মচারী ও পেশাজীবীরা স্ব স্ব কার্যক্ষেত্রে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখবেন। কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবেন।

নতুন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ তাই স্ব স্ব কার্যক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তিন জোট, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ও গণসংগঠনসমূহও তাদের কর্মসূচী স্থগিত রেখেছেন এবং কলে-কারখানায় অফিস আদালতে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন।

শ্রমিক-কর্মচারী ও পেশাজীবীদের দাবী-দাওয়া আছে। সরকারী-কর্মকর্তাদেরও ক্ষোভ আছে, দাবী-দাওয়া আছে। কিন্তু এখন এই দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে গেলে তাদের অসন্তোষ ও ক্ষোভের সুযোগ নেবে গণতন্ত্রবিরোধী পরাজিত শত্রুরা, তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে দেশকে নৈরাজ্যের মধ্যে ঠেলে দেবে। আর এই নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি স্বৈরশাসনের জন্ম দেয়। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা অতীতের গণবিরোধী সরকার সর্বত্র যে বিপর্যয় ও ধ্বংসের সূচনা করেছে তার ক্ষত রাতারাতি নিরাময়যোগ্য নয়। সকলকেই ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে স্ব স্ব কর্মে নিয়োজিত থেকে এই ক্ষত নিরাময়ে সহযোগিতা করতে হবে।

আমাদের জনজীবনের দুর্দশা-কষ্ট নিরসন এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রার তথা অধিকার আদায়ের পথ নির্মাণই ছিল আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। তা হলো একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। সেই পথ নির্মাণ ব্যতীত জীবনের গতি স্বাভাবিক ও সুস্থ করার দ্বিতীয় পন্থা নেই।

তাই দাবী-দাওয়ার নামে কোন চক্রান্ত বা উস্কানি যেন দেশবাসীকে বিপথে চালিত করার সুযোগ না পায়, কোনরূপ উচ্ছৃংখলতা নিয়মের স্থান দখল না করে, তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। আগেই

বলা হয়েছে একটি জবাবদিহিমূলক নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই অস্থায়ী সরকার প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের একমাত্র দায়িত্ব। সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করেই আমরা রাষ্ট্রপতিকে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করতে পারি। তিনি দলমত, শ্রেণী ও পেশা নির্বিশেষে সবার কাছ থেকে সেই সহযোগিতাই চেয়েছেন।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সংগ্রামের দুর্গম পথের বড় বাধা অপসারিত হয়েছে। এখন সবার আগে প্রয়োজন সে সাফল্যকে সংহত করা। তার পরবর্তী কার্যক্রম পালনের ক্ষেত্রে ও গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে যে ঐক্য ও অঙ্গীকার কাজ করেছে তা বজায় রেখে এগিয়ে যাওয়াই এই মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের দায়িত্ব।[১৫৯]

১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর সংবাদে এ ধরনের আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের অপসারণ করার পর এই মুহূর্তে জেলা প্রশাসকদের দিয়ে পরিষদগুলোর ন্যূনতম দৈনন্দিন কাজকর্ম চালু রাখার অনুরোধ জানানো হয়। একই সঙ্গে পরিষদগুলোর প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ বা পুনর্গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সরকারের অপেক্ষায় থাকারও আহ্বান জানানো হয়। এই সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'মেয়র ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান'। এতে লেখা হয়:

পৌর কর্পোরেশনগুলোর মেয়র ও বিভিন্ন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের কেউই নির্বাচিত নন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এদের নিয়োগ করেছিলেন। দলীয় রাজনীতির স্বার্থ ছাড়া এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের অন্য কোন ভিত্তি ছিল বলে আমাদের জানা নেই।

এদের সবাই ছিলেন ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টির সদস্য। এরশাদশাহীর পতনের পর এদের সবারই হয়েছে ভাগ্যবিপর্যয়। সকল স্তরের মানুষ এখন তাদের মুখে চুনকালি দিতে চায়। তাই অনেকেই পলাতক কিংবা গা ঢাকা দিয়ে আছেন। এরা ঘুঘু দেখেছিলেন কিন্তু ফাঁদ দেখেননি। ফাঁদে পড়ে এখন তারা কোন প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন। বর্তমান অবস্থায় তাদের পক্ষে এসব পদের দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব।

তাই এসব ব্যক্তিকে বরখাস্ত করার দাবী উঠেছে। নৈতিক প্রশ্ন ছাড়া দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের সমস্যাও রয়েছে। যতদিন তারা নিজ নিজ পদে বহাল থাকবেন অথচ কার্যনির্বাহ করতে পারবেন না, ততদিন পৌর কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদগুলোর স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হবে। প্রশাসনিক দক্ষতার স্বার্থে দেরী না করে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত জরুরী।

গত বছরগুলোতে এক ব্যক্তির খেয়াল খুশীতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মূল করা হয়েছে। এক সময় পৌর কর্পোরেশনগুলোর মেয়র প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল। তারপর চালু করা হল পরোক্ষ নির্বাচন। কিন্তু তাতেও শান্তি পেলেন না আমাদের তদানীন্তন সরকার। ব্যবস্থা করা হল সরাসরি নিয়োগের। আর ঢাকা মহানগরীর মেয়র পদটি নিয়ে এরশাদশাহীর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কত খেলাই না খেলা হল।

কিন্তু পৌর কর্পোরেশনগুলোর মেয়রের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শহরবাসীদের ভাল-মন্দ নির্ভর করে পৌর কর্পোরেশনের তৎপরতার উপর। পৌর প্রশাসনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দিলে নানা ধরনের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে। তাই বর্তমানের মেয়রদের অপসারণ করে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করানোর জন্য তৎপর হওয়া উচিত। বিভাগীয় কমিশনারকে আপাততঃ মেয়রের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতের নির্বাচিত সরকার কর্পোরেশনগুলোর গণতন্ত্রায়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কাজকর্ম যেন ব্যাহত না হয় সেজন্য সবার নজর রাখা অত্যন্ত জরুরী।

জেলা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি এখন পর্যন্ত অপরীক্ষিত। এই পরিষদের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা নিয়ে সবার মনে সংশয়। এতদিন পর্যন্ত এই পরিষদগুলো ছিল দলীয় স্বার্থে সরকারী প্রসাদ বিতরণের ক্ষেত্র। পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ-বরখাস্ত নিয়েও কম খেলার অবতারণা করা হয়নি।

আমাদের মতে, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের অপসারণ করার পর এই মুহূর্তে জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব দিয়ে পরিষদগুলোর ন্যূনতম দৈনন্দিন কাজকর্ম চালু রাখার ব্যবস্থা করা হোক। এগুলোর আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা, অথবা প্রয়োজন থাকলে কিভাবে পরিষদগুলো পুনর্গঠন করে গণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য ভবিষ্যতের নির্বাচিত সরকারের অপেক্ষায় আমাদের থাকতে হবে।[১৬০]

পরদিন অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর সংবাদে এ ধরনের আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আগের কমিটি বাতিল করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে লেখা এক সম্পাদকীয়তে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আহ্বায়ক কমিটির প্রতি দুটি আহ্বান জানানো হয়, প্রথমতঃ মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয়তঃ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সপক্ষের শক্তির সহযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যক্রম নির্ধারণ করা। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ পুনর্গঠন'। এতে লেখা হয়:

> মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আগের কমিটি বাতিল করা হয়েছে। গত শুক্রবার সংসদের ১৯৭২ থেকে '৮১ সময়কালের চেয়ারম্যান ও মহাসচিবদের এক জরুরী সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সাময়িকভাবে সংসদের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ১৮০ দিনের মধ্যে কাউন্সিল ডেকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে।
>
> মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিয়ে অশুভ রাজনৈতিক খেলা চলছে গত প্রায় এক দশক ধরে। অতীতের স্বৈরশাসকরা তাদের অবৈধ ক্ষমতা ধরে রাখার হাতিয়ার হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে ব্যবহার করেছে। শাসকরা তাদের মর্জিমাফিক নিত্যনতুন হুকুম জারি করে সংসদের নেতৃত্ব বদল করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত প্রকৃত নেতাদের কখনও সংসদের নেতৃত্বে আসীন হতে দেয়নি। সংসদকে ব্যবহার করা হয়েছে স্বৈরশাসনের ক্ষমতার ভিত মজবুত করার অসৎ উদ্দেশ্যে।
>
> দুঃখজনক হলেও সত্য। বিগত দিনগুলোতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কোন কোন 'নেতা' এরশাদের স্বৈরশাসন টিকিয়ে রাখার জন্য পেটোয়া বাহিনী হিসেবে কাজ করেছে। গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে স্বৈরশাসনের ঘৃণ্য বরকন্দাজের ভূমিকা পালন করেছে।
>
> অনেক রক্ত, অশ্রু, আত্মদানের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট গণঅভ্যুত্থান স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছে। এই শুভলগ্নে স্বৈরশাসনের হাতিয়ার হিসেবে এতদিন ব্যবহৃত সেই মুক্তিযোদ্ধা সংসদটিকে পুনর্গঠনের প্রশ্নটি ছিল জরুরী। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
>
> অতীতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে নিয়োগ করা হয়েছে স্বৈরাচারী সরকারের তাঁবেদারিতে। এর দ্বারা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মান-মর্যাদাকে কলংকিত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবমূর্তি ধূলায় লুটিয়ে দেয়ার সেটা ছিল এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত।
>
> অথচ মুক্তিযুদ্ধ বাঙালী জাতির অস্তিত্বের শর্ত। মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মদানের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে স্বাধীনতা সংহত করা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের পতাকা সমুন্নত রাখার মহান দায়িত্ব বর্তায় দলমত-নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। কিন্তু জাতির ওপর চেপে বসা স্বৈরাচারের কালো শাসন মুক্তিযোদ্ধাদের সেই ইতিহাস নির্ধারিত ভূমিকা পালনে এতদিন বাধার দেয়াল সৃষ্টি করে রেখেছিল।
>
> স্বৈরশাসনের পতনের পর আজ আর একবার আমরা মুক্তির স্বাদ নতুনভাবে নিতে শুরু করেছি। মুক্তির এই লগ্নে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ পুনর্গঠনের প্রশ্নটি সেই কর্তব্যগুলোকেই সামনে হাজির করেছে যা এতদিন ছিল অসম্পূর্ণ। সদ্য গঠিত সংসদের আহ্বায়ক কমিটিতে যারা রয়েছেন তাদের সামনে আজ প্রধান কর্তব্য দু'টি। মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে গড়ে তোলা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সপক্ষের শক্তির সহযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যক্রম নির্ধারণ করা। এ দু'টি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।[১৬১]

১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর সংবাদে এ ধরনের আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পর জারি করা সামরিক আইনে জেনারেল এরশাদ বেশ কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মচারীকে সামরিক ট্রাইব্যুনালে দোষী সাব্যস্ত করে বরখাস্ত করেছিল। তাদের আপিল করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। 'সামরিক আইনে চাকরিচ্যুতদের সুবিচার পাওয়ার উপায়' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই সরকারি কর্মচারীদের আপিল করার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সম্পাদকীয়টিতে লেখা হয়:

> সামরিক আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী এরশাদ সরকার বেশ কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন।
>
> সামরিক আইনের উক্ত ধারাবলে চাকরিচ্যুত ব্যক্তি তৎকালে এমনকি পরবর্তীকালেও কোন আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেননি। সরকারের নিকট তারা বহু আবেদন-নিবেদন করেছেন। সরকারের এ ধরনের আদেশের পুনর্বিবেচনার প্রার্থনা জানিয়েছেন। পত্রপত্রিকায় চিঠি দিয়ে বেকার জীবনের মর্মান্তিকতা বর্ণনা করে সরকারের কৃপালাভের চেষ্টা করেছেন। সামরিক আইন প্রত্যাহার ও বেসামরিক সরকার গঠনের পর আইন-আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্মের অনুমতি দেয়। কিন্তু সামরিক আইনের চাকরিচ্যুত কিংবা সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচারে দোষী সাব্যস্ত কোন পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের আদালতে আপীল করার সুযোগ দেয়া হয়নি।
>
> ক্ষমতাচ্যুত সরকারের আমলে দীর্ঘ আট বছরকালের মধ্যে এইসব চাকরিচ্যুত সরকারী কর্মচারীর সাংসারিক অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে এখানে সেটা প্রধান বিবেচ্য নয়। তাদের সামরিক শাসনামলে যেভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, তা চাকরির নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেটাই বিচার্য। তারা অপরাধী কিনা তাও সঠিকভাবে যাচাই করার সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে।
>
> চাকরিচ্যুত পুলিশ কর্মকর্তাদের পুনর্বহাল দাবী করেছে সম্প্রতি তাদের এসোসিয়েশন। এরকম অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা যারা সামরিক

আইনের ৯ নং ধারা অনুযায়ী চাকরিচ্যুত হয়েছেন, তারাও যাতে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে আদালতে সুবিচার প্রার্থনা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার।

কারণ কোন অভিযুক্তকে সাজা দেয়ার আগে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদান আইনের বিধান। কিন্তু সামরিক শাসন বা মার্শাল ল' কোন আইনের আওতার মধ্যে পড়ে না। সুতরাং এ ধরনের অভিযোগ একতরফা এনে শাস্তি বিধান করা হয় যা আইনের চোখে অবৈধ।

আমরা একথা বলি না যে, চাকরিচ্যুত সবাইকে নির্বিচারে পুনর্বহাল করা হোক। তার পরিবর্তে যদি আদালতে আপীল করার সুযোগদানের ব্যবস্থা করা হয় তবে সেটাই হবে তাদের প্রতি সুবিচার করার সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা।

সামরিক শাসনামলে যাদের সামরিক আইনের ৯ নং ধারায় চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেয়ায় তাদের বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ খণ্ডন করা সম্ভব হয়নি।

নিরপরাধ অনেকে এজন্য অন্যায়ভাবে শাস্তির শিকার হয়েছেন। অথচ পরে প্রতিবিধান করার কোনরূপ সুযোগ অতীতে বেসামরিক শাসনামলে দেয়া হয়নি।

মার্শাল ল' চলাকালীন কোন গৃহীত ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করা যাবে না কিংবা বাতিল করা যাবে না। বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর একথা বলা হয়েছে। যদিও স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিতেই বলা যায় আদালতে এসব কেস চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, এমর্মে সরকার যে আইন পাস করেছে আইনের দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই।

আমরা অস্থায়ী সরকারের নিকট আবেদন জানাই যে, সামরিক আইনের ৯ নং ধারায় চাকরিচ্যুত সকলকে আদালতে আপীল করার সুযোগ দিলে তাদের ক্ষোভ ও মনোকষ্ট দূর এবং চাকরি হারিয়ে তারা যে অবর্ণনীয় দুর্দশা ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, তার নিরসন কিছুটা হলেও সম্ভব হবে।

সর্বোপরি সামরিক আইনে চাকরিচ্যুত হওয়ার কারণে তাদের সুনাম যেভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে আদালতের রায় মোতাবেক তারও পুনরুদ্ধারের পথ খোলা থাকবে। ন্যায়বিচারের স্বার্থেই এটা একান্ত প্রয়োজন।[১৬২]

পরদিন অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংবাদ নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর অস্থায়ী সরকারের করণীয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টিতে সরকারি মালিকানাধীন রেডিও-টেলিভিশনের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার স্বার্থে এই দুটি শক্তিশালী গণমাধ্যমকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পরিণত করার গণদাবির প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং অস্থায়ী সরকারকে

এই দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন'। এতে লেখা হয়:

> সংবাদ ও প্রচার মাধ্যম হিসেবে আমাদের দেশে বেতার ও টেলিভিশনের গুরুত্ব যথেষ্ট। একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে এ দু'টি মাধ্যম তাদের বিশিষ্ট অবদান রাখুক, সবাই এখন এই আশা করতে শুরু করেছে।
>
> বিগত সরকারের বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও দেশে সাক্ষরতা বাড়েনি। ছাপার অক্ষর থেকে সংবাদ ও চিত্তবিনোদনের মাল-মশলা সংগ্রহ দেশের তিন-চতুর্থাংশ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। আবার যারা পড়তে শিখেছেন, তাদের অধিকাংশেরই খবরের কাগজ কেনার সামর্থ্য নেই। তাই দেশের এক বিরাট জনসংখ্যা সংবাদ ও চিত্তবিনোদনের জন্য এখন নির্ভরশীল রেডিও- টেলিভিশনের ওপর। এ কথাগুলো সকল স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জন্যই সত্য।
>
> কিন্তু সকল উন্নয়নশীল দেশের মত আমাদের দেশেও রেডিও ও টেলিভিশনের ওপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার ও কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্ব থেকেই এসেছে মাধ্যম দু'টির অপব্যবহারের প্রবণতা। তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ আমরা পেয়েছি বিগত সরকারের আমলে।
>
> গত বছরগুলোতে আমরা রেডিও-টেলিভিশনে শুনতে ও দেখতে পেলাম এক ব্যক্তির প্রশস্তি। সংবাদের সিংহভাগ দখল করে থাকল 'সাহেব-বিবি-গোলাম'দের অর্থহীন তৎপরতার বিবরণ। অনেক বিনোদন ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রামে তল্পিবাহকদের আনাগোনা। নির্বাসিত হল অনেক সৎ শিল্পী।
>
> সভা-সমিতি-রাজপথে সরকারের যারা বিরোধিতা করতেন, তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হল। সব মিলিয়ে মাধ্যম দু'টি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলল। এক ব্যক্তির তোষণে চোখ- কান ঝালাপালা হয়ে গেল। জনগণের অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান দু'টিতে জনগণের খবর পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল।
>
> স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় যেমন হয়, অনেকে স্বেচ্ছায় অতি উৎসাহে চাটুকারিতায় মেতে গেলেন। অনেকে আবার চাকরি যাওয়ার ভয়ে, পেটের দায়ে সুর মেলালেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটির প্রচারযন্ত্র হয়ে দাঁড়াল মাধ্যম দু'টি। কথায়-ছবিতে ছয়কে নয়, নয়কে ছয় করা হল।
>
> হত্যা করা হল সৎ সাংবাদিকতা। প্রতিটি প্রোগ্রাম সম্পর্কে খুঁটিনাটি নির্দেশ আসতে থাকল সরকারী মহলের উপরতলা থেকে। পেশাগত মান এত নিচে নেমে গেল যে, গণমাধ্যম দু'টির কাণ্ডকারখানা দেশের মানুষের জন্য লজ্জার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। আর দেশের সঙ্কটের সময় মানুষ নির্ভর করতে শুরু করল বিদেশী রেডিও থেকে প্রচারিত সংবাদের ওপর।

রেডিও ও টেলিভিশনের অপব্যবহারে আমরা স্বৈরাচারের যে রূপ দেখতে পেলাম, তার থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণের সময় এসেছে। শক্তিশালী গণমাধ্যম দু'টি ভবিষ্যতে কোন ক্ষমতাসীন সরকার তাদের দলীয় স্বার্থে যেন ব্যবহার করতে না পারে, দলমত-নির্বিশেষে সকলের মতামত ও আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন প্রতিফলিত হয়, তার জন্য মাধ্যম দু'টির পরিচালনায় কাঠামোগত পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী।

সংবাদপত্রে যেমন ব্যক্তি ও বেসরকারী মালিকানার অবকাশ আছে, রেডিও-টেলিভিশনের ক্ষেত্রে সে ধরনের সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। অতএব সরকারী মালিকানায় থেকেও প্রতিষ্ঠান দু'টিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে তুলতে হবে। বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে। জনগণের অর্থে পরিচালিত মাধ্যম দু'টিকে জনসাধারণের আস্থা অর্জনের পথ সুগম করতে হবে।

এ লক্ষ্যে কোন কোন মহল থেকে রেডিও ও টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করার দাবী করা হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ঐসব স্বায়ত্তশাসিত রেডিও-টেলিভিশন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখেছে। নিরপেক্ষ থেকে দেশ-বিদেশে আস্থা অর্জন করেছে। আমরা কেন পারব না?

আমাদের সমাজে সবাই যখন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বদ্ধপরিকর তখন সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের জন্য মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী। তাই আমরা আশা করব, রেডিও-টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বিরোধী দল হিসেবে যখন মাধ্যম দু'টিতে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, তখনই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রেডিও-টেলিভিশনের নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি দিয়ে নানা কথা বলেন। অথচ ক্ষমতায় গেলে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে তারা ঐসব আপ্তবাক্য ভুলে যান। সম্প্রতি ভারতে আমরা এই ধরনের দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছিলাম। বাংলাদেশে যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়। তাই আমাদের প্রত্যাশা, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের দু'টি শক্তিশালী গণমাধ্যমকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে দেশবাসীর বহুদিনের দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন।[১৬৩]

একইদিন অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংবাদ এ ধরনের আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। গণবিচ্ছিন্ন স্বৈরশাসকরা জনসাধারণ থেকে বঙ্গভবনকে বিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে বঙ্গভবনের আশপাশের রাস্তা ও পার্কে প্রবেশ ও চলাচল নিষিদ্ধ করেছিল। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বঙ্গভবনের আশপাশের রাস্তা ও পার্কে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট

কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গভবনের দক্ষিণে আর পশ্চিমে'। এতে লেখা হয়:

> বঙ্গভবনের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হয়েছে। সেখানে স্বৈরতন্ত্র হটিয়ে গণতন্ত্র তার আসন নিয়েছে। এখন বঙ্গভবনের দক্ষিণে আর পশ্চিমে অবরুদ্ধ রাস্তা ও পার্ক মুক্ত হবার অপেক্ষায়। গণবিচ্ছিন্ন স্বৈরশাসকরা বঙ্গভবনের উঁচু দেয়ালের ভেতরেও বোধহয় যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করতে পারেনি। তাই স্বেচ্ছাচারী হুকুম জারি করে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল রাস্তা ও পার্ক। জনসাধারণের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। হাঁটা-চলাফেরা ছিল বন্ধ। জনতার উত্তাল গণআন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গেছে সেই স্বৈরশাসন। এখন কি আশা করা যায় খুব শিগগিরই সেই রুদ্ধ রাস্তা ও পার্ক খুলে দেয়া হবে জনসাধারণের জন্য?
>
> এতে বিপুল সংখ্যক মানুষের যে খুব উপকার হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওয়ারী, নারিন্দা, সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়ার কয়েক লাখ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার লক্ষ্যে এ রাস্তা দু'টি অবিলম্বে জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া প্রয়োজন।
>
> মতিউর শিশুপার্ক। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদ মতিউরের স্মৃতিবিজড়িত। খোলা আলো হাওয়ায় একটু দম ফেলার সুন্দর জায়গা ছিল এ পার্ক। গাছপালা ফুলফলে সুশোভিত করা হয়েছিল পার্কটি। বাচ্চাদের খেলাধুলার ব্যবস্থাও রয়েছে। অপশাসনের রোষানলে পড়ে এই পার্কও বন্ধ হয়েছিল।
>
> একেবারে বেহুদা এই রাস্তা ও পার্ক বন্ধ করা হয়েছিল। পেছনে কোন সঙ্গত কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কিছু খোঁড়া অজুহাত দাঁড় করানো হয়েছিল। শোনা যায় কে নাকি কবে পার্ক থেকে বোমা ছুড়েছিল। জনসাধারণের কাছে সে সংবাদ পৌঁছেনি। মানুষ কেবল জানতে পেরেছে, দক্ষিণের রাস্তায় কোন যানবাহন চলবে না। পার্কে আর কেউ সকাল-বিকেল হওয়া খেতে যেতে পারবে না।
>
> এইসব তোগলকি সিদ্ধান্তের ফল হয়েছিল মারাত্মক। সূত্রাপুরের কয়েক লাখ মানুষের যাতায়াতের চাপ গিয়ে পড়ে একদিকে টিকাটুলি-হাটখোলা মোড়ে, অন্যদিকে নবাবপুর পুরানো রেলক্রসিং-এর মোড়ে। এই দুই এলাকায় সকাল-সন্ধ্যা যানজটের আগ্রাসন লেগেই থাকে।
>
> অথচ রাস্তা দুটো খুলে দিলে এই যানজটের চাপ অনেক কমানো সম্ভব। অন্ততঃ বঙ্গভবনের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে রাস্তাটি তো অবশ্যই সাধারণ যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া দরকার। নবাবপুর মোড় থেকে টিকাটুলি, নারিন্দার দিকে যাতায়াতের জন্য তাহলে পাশাপাশি তিনটি রাস্তা পাওয়া যাবে। বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট কার ও রিক্সা সব যানবাহনের জন্য পরিকল্পিতভাবে এই রাস্তাগুলো ব্যবহার করা হলে

মানুষ দৈনন্দিন যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক ভোগান্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

বঙ্গভবনের সামনের রাস্তাটি স্বাধীনতার পর প্রাইভেট কার চলাচলের জন্য খোলা রাখা হয়েছিল। এখন আবার সেরকম ব্যবস্থা চালু করা যায়। প্রাইভেট কার চলাচলের জন্য এ রাস্তা খুলে দেয়া হলে নবাবপুর-গুলিস্তান মোড়ে যানজটের বাড়তি বোঝা কমিয়ে আনা সম্ভব।[১৬৪]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে করণীয় সম্পর্কে অভিমত জানিয়ে সংবাদ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, ছাত্র-জনতা এবং স্বাধীনতার সপক্ষ রাজনৈতিক দলসমূহের তিনটি জোট স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে শরিক হয়েছে। তারা ব্যাপক জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছে। সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তি নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। এই ঐতিহাসিক গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে একাত্তরের ঘাতক ও দালালরাও এসে পায়ে পায়ে এসে শরিক হয়েছে। এই সম্পাদকীয়তে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে প্রশ্রয় না দেওয়ার অঙ্গীকার করার আহ্বান জানানো হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে'। এতে লেখা হয়:

আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পরাজয় যখন নিশ্চিত, তখন তাদের নীল-নকশা অনুযায়ী তাদের এদেশীয় দোসরদের ঘাতক বাহিনী আলবদর-আলশামস শ্রেষ্ঠ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে আমরা প্রতিবছর এই দিনটি পালন করি। হানাদার বাহিনী এদেশের ওপর আক্রমণ চালাবার সময় প্রথমেই বেছে নিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের। শত্রু তার আক্রমণের প্রথম মুহূর্ত থেকেই লেখক, সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে গণহত্যা শুরু করে। একই সঙ্গে গড়ে তোলে তাদের সহযোগী ঘাতক বাহিনীকে। সেদিন স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল উগ্র ডান এবং উগ্র বাম রাজনৈতিক দলগুলো।

আজ যখন একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে স্বৈরাচারী সরকারের পতন এবং জনতার বিজয় হয়েছে তখন একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা শুধু ব্যথা অনুভব করি না, লজ্জা হয় আত্মবিস্মৃতির জন্য, মেরুদণ্ডহীন জাতীয় চরিত্রের জন্য। কারণ এই বিজয় দিবসে গণতান্ত্রিক শক্তির পাশাপাশি সেদিনের ঘাতক রাজনৈতিক শক্তির উত্থান হয়েছে। তাদের উত্থানে আমাদের মধ্য থেকেই বাড়িয়ে

দেয়া হয়েছিল সাহায্যের হাত রাজনীতিতে তাদের পুনর্বাসন সম্পন্ন করার জন্য।

তাদের আহূত সভায় আমাদের কোন কোন বুদ্ধিজীবী যেয়ে তাদের পেশার দক্ষতা, দায়িত্বের নাম করে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মুখরোচক কথা বলার ছলে স্বাধীনতার মহান ব্যক্তিত্ব ও সৈন্যাপত্যদানকারী শক্তির বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে থাকেন।

যে স্বৈরাচারী শক্তি একটি নির্বাচিত সরকার উৎখাত করে দেশের রাজনৈতিক বিকাশের স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করেছে, তার স্বরূপকে দেশবাসী বহু দুঃখ-দুর্দশা ও বেদনার মধ্য দিয়ে চিনেছে।

তাই এদেশের ছাত্র-জনতা স্বাধীনতার সপক্ষ রাজনৈতিক দলসমূহের তিনটি জোট স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই আন্দোলনে শরিক হয়েছে। আর অভিজ্ঞতা দিয়ে ক্রমান্বয়ে তারা কাছাকাছি হয়েছে। বহু আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে, নানা ছলনার নিপুণ ফাঁদ এড়িয়ে তারা ব্যাপক জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছে।

সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তি এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে। সেখানে একাত্তরের ঘাতক ও দালালরাও এসেছে পায়ে পায়ে।

দীর্ঘ ১৫ বছরের সংগ্রামে, বহু দুঃখ-দুর্দশা ও রাজপথে শহীদের রক্তদানের বিনিময়ে আজ আমরা গণতন্ত্রের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি। এই ত্যাগ, দুঃখ, অশ্রু যদি ঘাতকদের চিনতে না শিখায়, যদি ৭১-এর ঘাতক ও দালাল, ১৯৭৫ সালের চক্রান্তের শক্তি ও হোতাদের চিনতে না শিখায়, আমাদের দৃষ্টিকে যদি স্বচ্ছ না করে তাহলে এই শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আমরা তাদের আদর্শ, মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমকে অপমান করতে চলেছি। কোন আনুষ্ঠানিকতা ও আবেগাপ্লুত ভাষণ আমাদের চরিত্রের দীনতা, কাপুরুষতাকে আড়াল করতে পারবে না।

১৯৯০-এর রাজপথে গণতন্ত্রের আন্দোলনে যদি আমরা স্বৈরাচারের স্বরূপ, তার হিংস্র বর্বরতাকে চিনে থাকি তার সঙ্গে একাত্তরের ঘাতক ও দালাল এবং ৭৫-এর ঘাতক ও চক্রান্তকারীদের পার্থক্য কোথায় তা গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে বিজয় মিছিলে, কিংবা কোন সেমিনারে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে এদেশবাসী অবশ্য প্রশ্ন করতে পারে। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সাহসী সৈনিক সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এবং তিনজোটকে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া আজ প্রয়োজন এ বিজয়কে শংকামুক্ত করার স্বার্থে।

আমাদের শহীদ বুদ্ধিজীবীরা জীবিতকালে দেশের মানুষের আত্মিক উন্নতির জন্য তাদের অবদান, তাদের ত্যাগ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসই জাতির হৃদয়ে এক অমরত্বের আসন তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছে। ঘাতকদের সাথে মতবিনিময় কিংবা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ মিলানোর ধারা তাদের ঐতিহ্যের অনুসারী নয়।

এই দীনতা তথা ছদ্মবেশী ঘাতকের সুহৃদরাই নানাভাবে স্বৈরাচারের সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করেছে। এ উপলব্ধি যদি দীর্ঘ রাতের যন্ত্রণা ও দুর্দশা জাতির জীবনে না এনে দেয়, তবে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন, তাদের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করাই আমাদের জাতিকে সুস্থিত হতে দেবে না।

আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আমরা যেন কোন হত্যাকারীর সঙ্গে গণতন্ত্রের বিজয় মিছিলে হাত না মিলাই, তাহলে সে হাত বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে গিয়ে তাদের বিদেহী আত্মাকে অপমানিত করবে। আর শহীদদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তা হবে মর্মান্তিক উপহাস।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসটি এবার এক তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে আমরা পালন করতে চলেছি। শত্রু পরাজিত। কিন্তু উচ্ছিষ্টভোজী বুদ্ধির দীনতা, এখনও আমাদের পিছু ছাড়েনি। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা শুধু আন্তরিক হওয়াই যথেষ্ট নয় তা নিষ্কলুষ চিত্তের অর্ঘ্যও হতে হবে।[১৬৫]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বিজয় দিবস অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বরেও করণীয় প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। সম্পাদকীয়তে স্বৈরাচারমুক্ত স্বদেশে একাত্তরের আদর্শকে সমুন্নত রাখার আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে শহিদের আত্মার কাছ থেকে শত্রুকে চেনার এবং স্বজনকে আলিঙ্গন করার দীক্ষা গ্রহণেরও আহ্বানও জানানো হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এবারের মহান বিজয় দিবস'। এতে লেখা হয়:

আজ মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনটিতে অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয়।

প্রতি বছর আমরা এই মহান বিজয় দিবসটি পালন করি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের শপথ নিয়ে। এবার বিজয় দিবস এসেছে সত্যিকার অর্থে বিজয়ীর বেশে দীর্ঘকাল আমাদের দেশ স্বৈরশাসনে নির্দিষ্ট ছিল। একটি অগণতান্ত্রিক সরকার বাহুবলে ক্ষমতা দখল করেছিল সংবিধান লঙ্ঘন করে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে দিয়ে। বাইরে রক্তপাত ঘটেনি। কিন্তু জাতির হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সেদিন থেকেই শুরু।

এই সংবিধান লঙ্ঘনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার মাধ্যমে অবসান ঘটেছিল বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিকতার। সেই নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পুনরায় সরকার পরিবর্তনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে। জনগণকে এই গণসংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে

মূলত: তিনটি রাজনৈতিক জোট এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এক বৃহত্তর ও ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে।

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে। আর এই দ্বিতীয় বিজয় এনে বিজয় দিবসের সঙ্গে এক মোহনায় মিশেছে। সুতরাং এবারের মহান বিজয় দিবস আমাদের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করেছে। পুনরায় গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

শত্রুর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে এ দেশবাসী। এই বিজয় একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে নতুন আদর্শ, নীতি ও নির্ধারণ করেছিল। তাহল গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে এক নতুন সমাজব্যবস্থা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি।

একমাত্র গণতন্ত্রই সন্ধান দিতে পারে এবং নির্ধারণ করতে পারে জনগণ কীভাবে অগ্রসর হবে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে, শোষণ থেকে মুক্তিলাভের পথ নির্মাণে।

জনগণের এই ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় নির্বাচিত একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের মাধ্যমে। সেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পরিপূর্ণতা দেয়ার লক্ষ্যে আদর্শ হিসাবে অসাম্প্রদায়িক ও ভাষাভিত্তিক একটি জাতীয় রাষ্ট্র চাই। আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ এই দাবীর ভিত্তিতে হয়েছে।

পাকিস্তানের সঙ্গে এই মৌলিক পার্থক্য বাংলাদেশের সংবিধানে চার নীতির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

সেই মূল্যবোধগুলোকে অস্বীকার করে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তন করার যে চক্রান্ত বিদেশী শক্তির সহায়তায় একদা সফল হয়েছিল, তার সম্পর্কে সচেতন থেকেই এদেশের সাধারণ মানুষ স্বৈরাচার উৎখাতের সংগ্রামে বার বার রাজপথে স্বাধীনতার পর রক্ত দিয়েছে। স্বৈরাচারী শক্তি গায়ের জোরে ক্ষমতায় থাকায় সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে উৎসাহিত করেছে এবং স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তিকে সরকারের মধ্যে এ যাবৎ স্থান দিয়েছিল। এভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পাকিস্তানের ভাবাদর্শের অনুকরণে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা চালু হয়।

আজকে সেই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণ বিজয়ী হয়েছে। স্বাধীন স্বদেশভূমিতে স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রাম গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরেই এসেছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।

এবারের গণঅভ্যুত্থানের পথেই স্বৈরাচারের শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করেছে জনসাধারণ।

এই পটভূমিতে মহান বিজয় দিবসে আমরা ৩০ লাখ শহীদের আত্মদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। ব্যথিতচিত্তে স্মরণ করি ২ লাখ মা-বোনের লাঞ্ছনার কথা। কিন্তু এই শ্রদ্ধা ও স্মরণ ক্রমাগত অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে, কারণ এদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দোসরগণ সেই একই মানসিকতা নিয়ে প্রতিপদে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধকে উপহাস করেছে, রাষ্ট্রনীতিতে তাদের বিকৃত ও মানবতাবিরোধী আদর্শকে লালিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আর তারা যে অনুপাতে সফল হয়েছে, ঠিক সেই অনুপাতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধকে ক্রমাগত খর্ব করা হয়েছে। সংবিধান পরিবর্তন করা হয়েছে পরাজিত শত্রুদের আদর্শ এদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে।

আজকে মহান বিজয় দিবসের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন, উৎসব-আনন্দ এবং স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে দ্বিতীয়বার বিজয় অর্জনে উৎফুল্ল জনতাকে এ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের বিজয় উৎসবে ও মেলার ওপর সেই অশুভশক্তির ছায়া অপসারিত হয়নি। বরং সেই অশুভশক্তি আমাদের তরুণদের তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিত্তকে বিষতিক্ত করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ঘাতকরাও গণতন্ত্রের সম্মোহনবাণী আবৃত্তি করছে। হত্যার রাজনীতির দর্শনে বিশ্বাসী অস্ত্রবাজ রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ আত্মস্বীকৃত খুনীরা এখনও জনগণের ওপর তাদের কালো থাবা বিস্তার করে রেখেছে সগর্বে।

গণতান্ত্রিক শক্তি যদি তাকে ধিক্কার দিতে এবং বর্জন করতে না শিখে তবে জাতির জীবনে এই দ্বিতীয় সূর্যোদয় এবং গণতন্ত্রের ভোরের রক্তিম অরুণচ্ছটা যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীর মুখের রক্তোচ্ছ্বাসের মতই আমাদের জাতির প্রাণশক্তিতে তলে তলে ঘূণ ধরাবে।

গত ১ বছর স্বৈরাচারী শক্তিও মুখে গণতন্ত্রের বুলি নিয়ে রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছে, মিছিলের ওপর ট্রাক চালিয়ে দিয়েছে, আর লুটপাট করে জাতীয় অর্থনীতিতে ধস নামিয়েছে, নিরক্ত করেছে জাতিকে।

গণতন্ত্রের বুলিসর্বস্ব স্বৈরাচারকে উৎখাত করা হয়েছে গণতন্ত্রের লেবাসধারী ঘাতককে স্বজন বিশ্বাসে আলিঙ্গন করার জন্য নয়।

তাই কোন রাজনৈতিক শক্তি বা দল বা গোষ্ঠী গণতন্ত্রের নামে হত্যার রাজনীতির চোরাকারবারকে প্রশ্রয় না দেয় বিজয়ী জনগণকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

এই বিজয় দিবসে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে জয়ী বাংলাদেশের জনগণ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবে। সেখানে যেমন '৭১-এর ঘাতকদের স্থান নেই, তেমনি দীর্ঘ ৯ বছর পর রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক অনুশীলনে তো তাদের স্থান থাকার কথা নয়। কারণ, তারা তো গণতন্ত্রের দর্শনে বিশ্বাসী নয়, তারা গণতন্ত্রের সুযোগ গ্রহণের অভিলাষীমাত্র।

এদেশে অতীতে মেকি গণতন্ত্র তাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে আলিঙ্গনে বেঁধেছে এবং প্রকৃত গণতন্ত্র কখনই সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে না। এবং সেই ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

মহান বিজয় দিবস শুধু মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বিজয় উৎসবের দিন নয়, এই দিনটি এ যাবৎকাল অর্জিত সম্পদ, বিশেষভাবে আত্মিক সম্পদ কীভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে তারও হিসাব-নিকাশের দিন।

স্বাধীন দেশে কেন আর একবার আমাদের তরুণদের যুদ্ধে যেতে হল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, কেন প্রাণ দিতে হল রাজ পথে, কেন একাত্তরের শহীদদের রক্তের ধারায় মিশেছে ১৯৯০ সালের শহীদের রক্তস্রোত সেই আত্মজিজ্ঞাসা এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই, যদি আমরা তাদের আত্মদানের নিকট কৃতজ্ঞ থাকতে চাই, যদি '৭১-এর আদর্শকে বহন করতে চাই আন্তরিকভাবে।

আজ বিজয় দিবস দেশকে শত্রুমুক্ত করার অনির্বচনীয় আনন্দের সঙ্গে মিলিয়েছি স্বৈরাচারমুক্ত স্বদেশকে। তাই এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা নিয়ে কবরে শায়িত শহীদের আত্মার নিকট থেকে দীক্ষা নিতে হবে শত্রুকে চেনার এবং স্বজনকে আলিঙ্গন করার আনন্দের। ১৯৭১-এর বিজয় দিবসের সঙ্গে আজকের বিজয়ের রাখি বেঁধে দিয়েছে শহীদের রক্তস্রোত। গণতন্ত্রের উজ্জীবন ধারায় স্নাত দেশবাসীর মুক্তির পথযাত্রা নির্বিঘ্ন হোক মিলিত বাহুর আন্দোলনের শক্তিকে ধারণ করে। মহান বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের প্রার্থনা।[১৬৬]

১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর সংবাদ নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর অস্থায়ী সরকারের করণীয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। স্বৈরাচারী শাসন আমলে প্রশাসনে জবাবদিহিতার অভাবের নানা নজির উপস্থাপন করে সম্পাদকীয়টিতে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে দেশে যে কোনো সরকারই আসুক তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। গণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের প্রতি স্তরে জবাবদিহির ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত জনগণের বিজয় থেকে জনগণের কোনো লাভই হবে না। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'প্রশাসনিক জবাবদিহি ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা'। এতে লেখা হয়:

> এরশাদশাহীর আমলে কারো কাছে কোন জবাবদিহির বালাই ছিল না। কর্তা ছিলেন একজন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সম্পন্ন হতো। বেশীর ভাগই অপকর্ম। কৈফিয়ৎ দেয়ার কোন রেওয়াজ ছিল না।

আগের সরকারগুলোর সকল কাজকর্ম যে পুরোপুরিভাবে পাকসাফ ও পূত-পবিত্র ছিল, সে কথা বলার মত বুকের বল বোধহয় কারো নেই। কাজ করতে গেলে ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। জবাবদিহির ব্যবস্থা যথাযথ হলে তার প্রতিকারও সম্ভব। কিন্তু দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সরকারটির আমলে জবাবদিহির প্রথাটা একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল। তার ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে হিসেব আমরা কেবল শুরু করেছি মাত্র।

শেয়াল পালালে সবার বুদ্ধি বেড়ে যায়। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের শেয়ালগুলো সব পালাতে পারেনি। মুরগী খেয়ে মোটাসোটা হয়ে এতদিন তারা লাফালাফি করছিল। এখন অনেকেই বেকায়দায় পড়েছে। অনেকে আবার রং বদলাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছেন। ভোল পাল্টাবার নানা কসরৎ। ফাইল গায়েবেরও নাকি হিড়িক পড়েছে। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।

বিগত সরকারের ক্ষমতার উৎস জনসাধারণ ছিল না। জনগণের আস্থা-অনাস্থার পরোয়া তারা করেননি। ফলে বরাদ্দবহির্ভূত ব্যয়, খরচপত্রে নানা অসঙ্গতি, গোঁজামিলের ছড়াছড়ি, এখানকার টাকা ওখানে খরচ, টাকা-পয়সা তহবিল গায়েব। এক ব্যক্তির দুর্নীতি জন্ম দিয়েছিল হাজার হাজার দুর্নীতির।

এসব করতে যেয়ে প্রশাসনিক কাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। আমরা যদি দেশের প্রশাসনিক নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে না পারি, তবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যটি অর্জন করা সম্ভব হবে না।

সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কাঠামোগত কোন পরিবর্তন এই অস্থায়ী সরকারের কাছ থেকে কেউ আশা করে না। তবে বর্তমানে যে সব বিধিবিধান ও নিয়ম-কানুন সরকারী বই-পুস্তকে লেখা আছে, সেগুলো যাতে ঠিকমত মানা হয় এবং যারা মানেননি তাদের বিরুদ্ধে যেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়, তার উদ্যোগ নেয়ার দাবী করাটা বোধহয় অন্যায় নয়।

জাতীয় সম্পদ ও দেশের টাকাকড়ি নিয়ে কি ধরনের খেলা করা হয়, তার দিকে নজর রাখার জন্য আমাদের সংবিধানে ব্যবস্থা রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী একজন মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আছেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের সকল হিসাব নিরীক্ষা করবেন। আইন অনুযায়ী তিনি সরকারের সকল কাগজপত্র ও সম্পত্তি পরীক্ষা করবেন। তার রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারবো আমাদের টাকা-পয়সা সরকার ঠিকমত খরচ করছে কিনা। কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি। নিয়মবহির্ভূত ব্যয় করা হলে উঠবে অডিট আপত্তি। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে এই প্রথাটি প্রায় অচল করে ফেলা হয়েছিল।

গত জুলাই মাসে যে সংসদ অধিবেশন হয়, তাতে ১৭টি অডিট ও বাণিজ্যিক হিসাবের রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। তার একটি ছিল ১৪ বছর আগেকার। অন্য কোনটিও হাল আমলের নয়। প্রতিরক্ষা বিভাগের উপযোজন হিসাবটা ছিল ১৯৮৭-৮৮ এবং এটাই ছিল 'সর্বাধুনিক'। কাজেই অভিযোগ করা অসঙ্গত নয় যে, বিচার বিভাগীয় মর্যাদা ও সাংবিধানিক ক্ষমতার অধিকারী মহাহিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে অকেজো রেখে ব্যয় চলছে।

প্রশাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশকে অবমাননা করা হয়েছিল, সরকারের পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতিকে ঢাকা দেয়ার জন্য। অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী খরচপত্র অব্যাহত রাখার জন্য। হাজার হাজার অডিট আপত্তির কোন সদুত্তর দেয়া কেউ প্রয়োজন মনে করেননি। হিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয় সরকারের নথিপত্র দেখার সুযোগ পায়নি। অথচ এসবের ব্যাপারে তাদের অবারিত দ্বার হওয়ার কথা।

কেচো খুঁড়তে যেয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভয়ে যথাসময়ে অডিট করানো হয়নি। অডিট রিপোর্ট পেশ করা হয়নি। বর্তমানের অস্থায়ী সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে যদি মহাহিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন তবে বিগত সরকারের অনেক কুকর্মের একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠারও সহায়তা হবে।

শুধু তাই নয়। আমাদের দেশে ভবিষ্যতে যেকোন সরকারই আসুক না কেন, তারা যেন জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে কুণ্ঠাবোধ না করে তার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। পুরানো জঞ্জাল পরিষ্কার করে না দিলে তারাও আটকে যাবেন পাঁকে। দেশে আইন-কানুন থাকলেই যে সরকার সেই আইন মেনে চলবেন এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবেন না। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ থাকলে, যেকোন সরকারের পক্ষে আইন অমান্য করা কঠিন হয়ে পড়বে। দেশে গণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের প্রতি স্তরে জবাবদিহির ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত জনগণের বিজয় থেকে জনগণ কোন ফায়দা পাবে না।[১৬৭]

একইদিন ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর সংবাদ নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর অস্থায়ী সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি পেশকারীদের করণীয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টিতে অস্থায়ী সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করাকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং দাবি-দাওয়া পেশকারীদের এই প্রবণতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়। তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, অস্থায়ী সরকারের পক্ষে এই মুহূর্তে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের দাবি-দাওয়া পূরণ করা সম্ভব নয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'প্রয়োজন ধৈর্য ও শৃঙ্খলা'। এতে লেখা হয়:

নয় বছরের স্বৈরশাসনের আমলে দেশের অর্থনীতিতে যথেচ্ছ লুটপাট চালানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য করে ফেলা হয়েছে। প্রশাসনে অনিয়ম। ক্ষমতার অপব্যবহার। উৎপাদনে বিপর্যয়। শিল্পে অশান্তি। সমাজে মস্তানতন্ত্রের আমদানী। ঘুষ-দুর্নীতির রাজত্ব। দ্রব্যমূল্যের পাগলাঘোড়া। সবখানে অরাজকতা। এসবই স্বৈরশাসনের মোট ফলাফল।

এসবের বিরুদ্ধে দেশবাসী দীর্ঘ রক্তঝরা সংগ্রাম করেছে। আজ স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। দেশবাসীর সংগ্রাম জয়ী হয়েছে। এটা স্বাভাবিক যে, মানুষের বাঁচার দাবী-দাওয়া আদায় এবং দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার প্রশ্নটি এখন বিবেচনার বাইরে রাখা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এসবের তাৎক্ষণিক কোন সমাধান দাবী করা যায় কিনা। সর্ব অঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথা। দেশের অবস্থা এখন এ রকমই। যে ক্ষত সৃষ্টি করা হয়েছে নয় বছর ধরে– সেটা সারিয়ে তুলতে কিছু সময় অবশ্যই লাগবে।

যে মানুষ কলকারখানা, অফিস-আদালত বন্ধ করে দিয়ে রাজপথে নেমে এসেছিল স্বৈরাচার হঠাবার জন্য, তাকে এখন ফিরে যেতে হবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে। কাজের ক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে। উৎপাদনে নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে হবে। অর্থনীতিতে নিয়ম-নীতি নিশ্চিত করতে হবে। এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী হচ্ছে যার যার কর্মক্ষেত্রে স্ব-আরোপিত শৃংখলা, আরও কাজ, কঠোর শ্রম ও কর্তব্যপরায়ণতা। জনবিচ্ছিন্ন স্বৈরাচারী সরকারের আমলে এসবই বিসর্জন দেয়া হয়েছিল। এখন কলকারখানা, অফিস-আদালতে আবার সেগুলো ফিরিয়ে আনার কর্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

অস্থায়ী সরকারের পক্ষে এই মুহূর্তে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের দাবী-দাওয়া পূরণ করা সম্ভব নয়। দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন সংগঠনের আন্দোলন শুরু করার সময়ও এটা নয়। কারণ দাবী-পাল্টা দাবীর সংঘাত শুরু হয়ে গেলে এই নাজুক পরিস্থিতির সুযোগ স্বৈরাচারের দোসররাই নেবে। কলে-কারখানায়, কর্পোরেশনে অমুককে হটাও, তমুককে সরাও দাবী তুলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হলে আমাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে যাবার বিপদ সৃষ্টি হবে। রাজপথে ছাত্র-জনতা চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে। সেই ত্যাগ স্বীকারের পর্ব চুকে গেছে মনে করা হলে সেটা হবে ভুল। জনগণ কষ্ট স্বীকার করে হলেও বর্তমান মুহূর্তে আজ এ-দাবী, কাল ও দাবী তোলার বিপজ্জনক প্রবণতা থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকবেন। অফিস-আদালত ও কল-কারখানায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাজ নিশ্চিত করা হবে। এটা সকলের প্রত্যাশা।[১৬৮]

পরদিন ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর সংবাদ নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর সরকারের করণীয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টিতে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের কাজের দায়িত্ব ও আওতা কতটুকু হওয়া উচিত সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয় এবং প্রেসিডেন্টের সচিবালয়কে অতিরিক্ত ফাইলের বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের পরামর্শ দেওয়া হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বিকেন্দ্রীকরণ'। এতে লেখা হয়:

> রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের কাজের দায়িত্ব ও আওতা কতটুকু হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রশাসন যেন স্বাভাবিক ধারায় গতিশীলতা নিয়ে কাজ করতে পারে সে জন্যেই এটা প্রয়োজন। কয়েকদিন আগে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশী ফাইল অনেকদিন ধরে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। এর পরদিন রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, ফাইলের সংখ্যা পাঁচ হাজার নয়, দেড়শ' এবং এগুলো সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে প্রায় দু'সপ্তাহ যাবৎ।
>
> ফাইলের সংখ্যা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু বিষয়টি সংখ্যা নিয়ে নয়। সাবেক সরকারের আমলে 'ওয়ান ম্যান শো'র যে ব্যবস্থাটি চালু করা হয়েছিল তা নিয়ে এবং এ রকম ব্যবস্থা চালু রাখা হলে আজ দেড়শ' ফাইল জমলেও কাল যে পাঁচ হাজার ফাইল জমবে না তার কোন গ্যারান্টি নেই ।
>
> স্বৈরাচারী সরকারের আমলে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের নামে বাগাড়ম্বরের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু কথার আড়ালে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সব চাবিকাঠি জড়ো করা হচ্ছিল এক ব্যক্তির হাতে, তথা রাষ্ট্রপতির হাতে। রাষ্ট্রপতির সচিবালয়কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এমন পর্যায়ে যেন সেটা 'সচিবালয়ের সচিবালয়'। মন্ত্রী ও সচিবদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা কাটাকাটি করতে করতে প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছিল। প্রায় সব ধরনের ফাইলই পাঠাতে হতো রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে, বড় হুজুরের অনুমোদনের জন্য।
>
> স্বৈরাচারী শাসনের এখন অবসান হয়েছে। সাবেক শাসনামলের অনেক নিয়মনীতিই বদলানোর দরকার আছে। সে সাথে এ বিষয়টিও জরুরী বিবেচনার দাবী রাখে। সম্প্রতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠককালে সচিব ও অতিরিক্ত সচিবরা এই প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেছেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিও বলেছেন অপ্রয়োজনীয় ফাইল তাঁর কাছে না পাঠাতে। এখন প্রয়োজন এ বিষয়ে অতীতের নিয়মনীতি, লিখিত-অলিখিত নির্দেশগুলো বাতিল করে সুস্থ স্বাভাবিক ধারা চালু করা।

বিশেষভাবে এখন তো রাষ্ট্রপতির সচিবালয়কে অতিরিক্ত ফাইলের বোঝা থেকে অবশ্যই মুক্তি দেয়া দরকার। কারণ অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আগামী কয়েক মাস দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারেই ভীষণভাবে ব্যস্ত থাকতে হবে। এখনও যদি আগের প্রথামত সব ফাইল রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে যেতে থাকে, তা হলে সেটা হবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সময়ের উপর অহেতুক চাপ।

এই পরিবর্তন প্রয়োজন শুধু অস্থায়ী সরকারের জন্যেই নয়, ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক সরকারের জন্যও। মন্ত্রী বা সচিব পর্যায়ে যার যতটুকু কাজ তাকে ততটুকু কাজ করতে দেয়া উচিত। সেটা যদি করতে দেয়া না হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে স্বাভাবিক গতিশীলতা ফিরে পাবে না। গাফিলতি ও দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা উৎসাহিত হবে। দক্ষ প্রশাসনও কখনও গড়ে উঠতে পারবে না। ছোটখাট সব ব্যাপারেই সিদ্ধান্তের জন্য সকলে একব্যক্তি নির্ভর হয়ে পড়বে। এটা হবে এক অর্থে সমস্ত প্রশাসনকে পঙ্গু ও অথর্ব করে ফেলার সামিল।

এই ভয়াবহ পরিণতির কবল থেকে প্রশাসনকে রক্ষা করার জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হোক। এটা সকলেরই কাম্য।[১৬৯]

একইদিন ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর সংবাদ সরকারের করণীয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টিতে বিনাবিচারে বা বিচারাধীন বন্দীদের সমস্যা জরুরীভাবে পর্যালোচনা করার আহ্বান জানানো হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বিনাবিচারে কারাবন্দী'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> বিনাবিচারে ও বিচারাধীন কারাবন্দীর দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে মাঝে মাঝেই পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। লেখালেখি করা হয়। বিভিন্ন সভা-সমিতি-সেমিনারে তাদের সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশ করা হয়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না।
>
> গত শনিবার আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত মোহাম্মদ হোসেইন আহমদের চিঠি থেকে এই ধরনের একজন কারাবন্দীর কথা জানা গেল। জনৈক মোহাম্মদ খলিলুর রহমান দীর্ঘ চার বছর যাবৎ কারাবন্দী। ১৯৮৬ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিন বছর পর এ বছরের জানুয়ারী মাসে তার বিচারকার্য শুরু হয়। কিন্তু প্রায় এক বছর পরেও মামলার কোন নিষ্পত্তি হয়নি। অজুহাত দেয়া হচ্ছে, সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে আসছে না। সমন ও ওয়ারেন্ট জারি করেও কোন লাভ হয়নি। মামলার রায় দেয়া যাচ্ছে না। খলিলুর রহমান জেলে পচছে।
>
> খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যাসত্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। নির্দিষ্ট অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে তাকে

গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমাদের দেশে আইন-শৃংখলার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগ তদন্ত করে সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করার পর তাকে আদালতে সোপর্দ করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের বিচার হবে। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দোষ বলেই ধরে নিতে হবে। এক্ষেত্রে তার উল্টোটাই ঘটছে। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগেই সাজা ভোগ করতে হচ্ছে।

আমাদের দেশে খলিলুর রহমানের মত হাজার হাজার কারাবন্দী বিচারাধীন বা বিনাবিচারে আটক। কেউ কেউ নাকি ছয়-সাত বছর ধরে ঐ অবস্থায় অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে। তাদের পরিবার- পরিজনের ওপর নেমে এসেছে বিপর্যয়। অনেকের পরিবার অর্থনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে।

খলিলুর রহমানের উদাহরণটি থেকে দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ-তদন্ত, চার্জশীট প্রদান, সাক্ষীসাবুদের ব্যবস্থা ও আদালতে মামলা শুরু করাতে তিন বছর সময় চলে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাক্ষীদের আদালতে হাজির করানো যায়নি। এসব ব্যাপারে আমাদের পুলিশ বাহিনীরই প্রধান ভূমিকা। তারা তাদের ভূমিকা ঠিকমত পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

অবশ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা বলবেন যে, তাদের জনবলের অভাব। যানবাহনের অভাব। আধুনিক চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা তাদের আয়ত্তের বাইরে। এসব অসুবিধা ধরে নিয়েও প্রশ্ন করা যায়, তিন বছর এক সুদীর্ঘ সময়। উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তির জীবন থেকে তিনটি বছর নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো। আরো কত অভিযুক্ত ব্যক্তির জীবন থেকে কত বছর খসে যাচ্ছে কে জানে? এখানে পুলিশ বাহিনীর সততা ও দক্ষতার প্রশ্নটি একেবারেই অবান্তর।

ফৌজদারী মামলার তদন্তের সময়সীমার ব্যাপারে আইনগত কড়াকড়ির অভাব। এই শিথিলতার ফাঁকে দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জেলে আটক রাখা হয়। তাই অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে একটা সময়সীমার পর স্বতঃসিদ্ধ জামিনের দাবী করা হয়েছিল আইনজীবীদের মহল থেকে। ঐ ধরনের কোন বিধি থাকলে খলিলুর রহমানের মত বিনাবিচারে কারাবন্দীদের দীর্ঘদিন জেলে পচতে হতো না।

আর মামলার নিষ্পত্তি। এ ব্যাপারে বার বার সময়সীমা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির কোন কূলকিনারা হচ্ছে না। আট বছর আগে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে আদালত ভেদে ৩০ ৬০ দিন সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছিল। তা কয়েকবার বাড়ানোর পর অবস্থাবিশেষে ২৪০ দিন বা ২৭০ দিনে দাঁড়িয়েছে বলে আমরা জানতে পারি। কিন্তু আলোচ্য মামলার ক্ষেত্রে এই দীর্ঘ সময়ও যথেষ্ট নয় বলে মনে হচ্ছে।

আমরা আগেও যেমন বলেছি, তেমনি এখনও বলছি, বিনাবিচারে কাউকে দীর্ঘদিন আটক রাখা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি বিচারের নামে বিনাবিচারে আটক রাখাও নিন্দনীয়। আমাদের আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষ এসব ব্যাপারে তৎপর হয়ে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করুক। আদালতও তার বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করুক স্বাধীনভাবে। জামিন দেয়া হোক উদারভাবে। মামলা খারিজ করা হোক সময়মত চার্জশীট দিতে বা সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে না পারলে। মোটকথা, বিনাবিচারে বা বিচারাধীন বন্দীদের সমস্যা জরুরীভাবে পর্যালোচনা করা দরকার হয়ে পড়েছে।[১৭০]

১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর সংবাদ নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন সরকারি অফিসে পদচ্যুত করা ও পদায়নের জন্য অস্থায়ী সরকারের কাছে দাবি পেশকারীদের করণীয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর অস্থায়ী সরকারের কাছে অফিসে অফিসে দাবীর প্রতিযোগিতা শুরু করা কতটা সমীচীন সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, দাবির পেছনে আবার পাল্টা দাবিও আছে। এই প্রেক্ষাপটে সম্পাদকীয়টিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারকে যৌক্তিক সময় দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'একে সরাও, ওকে বসাও'। এতে লেখা হয়:

অফিস-আদালতে দাবী উঠতে শুরু করেছে। একে সরাও, ওকে বসাও। কেউ ছিল এরশাদশাহীর দালাল। লুটপাটের ভাগীদার। কাউকে অন্যায়ভাবে চাকরি দেয়া হয়েছিল। তাদের অপসারণের দাবী উঠছে। আবার সাবেক সরকারের আমলে কাউকে অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে সরানো হয়েছিল। তাদের চাকরি এখনই ফিরিয়ে দিতে হবে।

এসব দাবীর অনেকগুলো হয়তো ন্যায্য। দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন হয়তো আছে। প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে প্রয়োজনীয় রদবদলের কিছু জরুরী পদক্ষেপ সরকার ইতিমধ্যেই নিয়েছেন। হয়তো আরও নেয়া হবে।

কিন্তু এসব ব্যাপারে যদি অফিসে অফিসে দাবীর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, তা হলে সেটা বর্তমান অবস্থায় কতটুকু সমীচীন হবে? দাবীর পেছনে আবার পাল্টা দাবীর মিছিলও বের হবে। দশজনের দশ মত থাকা স্বাভাবিক। দাবী আর পাল্টা দাবীর হৈ-হুল্লোড়ে অনেক কিছু চাপা পড়ে যাবে। পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস সৃষ্টি হবে। এর সুযোগ নেবে সুযোগসন্ধানীরা। কাজের পরিবেশ নষ্ট হবে। সেখানে উদ্দেশ্যের সাধুতার ব্যাপার গৌণ হয়ে দাঁড়াবে।

বিগত প্রায় নয়বছরের অপশাসনের আমলে অনেক অন্যায় হয়েছে। অতীতে রাষ্ট্রপতি সাত্তারের আমলে যে ব্যাংক কর্মচারীরা ছাঁটাই হয়েছিলেন তাদের চাকরিতে পুনর্বহালের প্রশ্ন এরশাদের আমল জুড়ে ছিল। অনেককে বহাল করা হয় দফায় দফায়। সর্বশেষ জনৈক বহু ঘাটের পানি খাওয়া ব্যাংক কর্মচারী নেতার নেতৃত্বে সরকারী দলে নাম লিখিয়ে অনেকে চাকরি ফেরত পান। তাহলে যাদের চাকরি এখনও হলো না, ওরা কি দোষ করলো? স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর ভূমিকায় নামার পুরস্কার হিসেবে একদল চাকরি ফেরত পেল। আর যারা জনতার কাতারে রইল, ওদের চাকরি হবে না?

স্বৈরাচারের বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনি যখন বেজে গেছে, সেই শেষ মুহূর্তেও সাবেক বস্ত্রমন্ত্রী না কি কয়েকশ' শ্রমিক-কর্মচারীকে মিল-কারখানায় চাকরিতে নিয়োগ করে গেছেন। শূন্য পদ না থাকা সত্ত্বেও কেন ওদের চাকরি দেয়া হবে সেটা নিশ্চয়ই বিবেচনার দাবী রাখে।

ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদধন্য হয়ে অনেকে বিভিন্ন করপোরেশন ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হয়েছিলেন। তাদের খুঁটির জোর ছিল। সেই জোরে ক্ষমতার অপব্যবহার ও ইচ্ছেমত লুটপাট চালানো হয়েছিল। এসবের বিচার কি হবে না?

সেটা নিশ্চয়ই হবে। এবং হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য দরকার সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন । কোথায় কি অনিয়ম হয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখা দরকার। এরশাদের আমলে কারো চাকরি গিয়েছিল বলেই সে ধোয়া তুলসী পাতা– এমন ঢালাও বিবেচনা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনি কারো ব্যাপারে কোন অন্যায় হয়ে থাকলে সেটাও দেখা দরকার। আবার এটাও বিবেচনা করা দরকার কোন প্রতিষ্ঠানে কত জনশক্তি প্রয়োজন। আমাদের অর্থনীতির দৌড় তো সকলেরই জানা।

তাই বিষয়টা এটা নয় যে, শ্লোগান-মিছিল করে একে সরাতে হবে বা ওকে বসাতে হবে। অনিয়মের প্রতিকার করতে হবে নিয়মের মধ্য দিয়েই। সুস্থ পরিবেশে সবদিক বিচার-বিবেচনায় নিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে। সরকারকে সে সময় ও সুযোগ দেয়া আমাদেরই কর্তব্য।[১৭১]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বাংলাদেশ অবজারভার বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর অস্থায়ী সরকারের করণীয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ অবজারভারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল কাজ নব্বইদিনের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান হলেও এই সম্পাদকীয়তে চলমান উন্নয়ন কাজের

ধারাবাহিকতা রক্ষা, আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা, জাতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির গুরুতর সমস্যাগুলো সমাধানের দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। শিরোনাম ছিল: 'The Challenges Ahead'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> The challenges ahead of us as a nation are the ones for the new administration headed by Chief Justice Shahabuddin Ahmed. There is no doubt about the fact that ninety days are too short a period to change the course of things. We do not, therefore, expect of him more than what is possible. Our expectation is limited only to setting the stage for the starting of a clean-up operation in the administration and the continuation (possibly with some invigoration) of our development activities. At the international level, the maintenance of good relation with all the nations of the world is our policy and we have naturally to continue it. It is only on the home front that the challenges have to be accepted in stride. Although the caretaker government's main responsibility is to hold the national election, the more serious problems of the national economy and polity cannot elude its grasp.
>
> We are a fortunate nation particularly since we do not have communal problems similar to the ones defying solution in some other countries around the world. We can, therefore, concentrate our attention on economic and social development without any social hindrance. Our low income level, little educational progress and poor performance in the industries sector are the most important developmental challenges to be faced with the serious- ness that they deserve.
>
> Since addressing all these problems would inevitably require some time to solve, the more urgent matter of some clean-up operation in order to ensure a good law-and-order situation throughout the country seems incumbent on the caretaker government on a priority basis. In all the towns and villages of the country the ordinary peace-loving citizen lives a life of continuous tension on account of the menacing gazes of ruffians (widely known as 'mastans') who are organised in various ways and often equipped with various types of arms. Sometimes even modern sophisticated arms are

> reported to be found in their hands. They are often found to use these for obtaining illegal material benefits in an extortionate manner which are often fatal to those who would not easily yield to their rough-and-ready pressure. Hijacking is also one of their activities which may well be regarded as something of a pastime. Even the national metropolis is not free from their activities. Even in a posh area like Gulshan some of them were reported to go so far as to murder a lady returning home from her shopping activity in broad daylight. The Siddheswari Lane murder case involving a lady going to bring her children from school in the daytime, the Rima murder case and many other criminal cases judgments on which are yet to be finalised call for an urgent disposal. We are mentioning these not only because we are drawing the attention of our President who is a member of the judiciary but because the disposal of these and many other criminal cases would have a reassuring impact on the citizenry and would have a tremendous impact upon our economic life. A good law-and-order situation is a basic prerequisite for inducing both local and foreign investors and lenders to come forward for using their resources for promoting our industries without the development of which it is impossible to tackle the huge unemployment problem which is constantly worsening our law-and-order situation. We would, therefore, expect that our present administration will pay proper attention to these matters of supreme urgency. [১৭২]

১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর এ ধরনের আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ অবজারভারে। স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বার্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। শিরোনাম ছিল: 'Independence Of The Judiciary'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> The Independence of the judiciary is of paramount importance in building stable democratic institutions. A viable judicial system is the bedrock of democracy. It cannot be tinkered with through piecemeal reform, however well-intentioned the motive. Its evolution has been carefully crafted through codification of laws and decisions of past judicial committees and parliamentary

legislation. It cannot be subject to or subverted by political expediency. "Taking justice to the doorstep of the people" is one example of simplistic slogan mongering that betrays both misunderstanding of the functions of the courts and ignorance of the delicate and complex processes involved in erecting the judicial system.

Bangladesh is a small country and its capital Dhaka is conveniently placed in the centre. On the excuse that justice must be made available to the people who cannot travel to the capital, High Court Judges have been put on extended circuit against existing norms and practice of virtually all countries in the world including Bangladesh. What is more relevant is that this completely disregards the fact that law courts exist in every district and sub-district. The practice of extended tours was imposed as an alternative to the even more unconstitutional attempt by ordinance to impose regional Supreme Courts. This was roundly rejected by the highest court of Appeal in the land.

This attempt to decentralise the judicial system by the executive was seen not only as self-serving and to compromise judicial independence but also to permit delay in the disposal of cases. Extended tours by High Court Judges left their Chambers in Dhaka unused and unoccupied. This has contributed to a serious back-log of cases recognised to be so heavy that it would take half a century to clear the slate. It also begs the question as to the functions of the High Court compared to those of the lower courts. Additional District Judges, Munsifs etc. are fully competent to finalise cases within their own jurisdiction.

The higher court's function is to review verdicts in line with the finer interpretative points of law which can best be done in the capital through easy access to all sources of precedent law. Conversely, the present decentralised practice may compound the problem of back-log through increased litigation on the simple grounds of the availability of High Court Judges. Certainly wasteful expenditure, diversion of energies and mounting arrears have been an inevitable result.

Remedial action is imperative on many fronts. District and sub-District Courts must be strengthened both in terms of manpower through appointment of adequate number of judges and Munsifs required and through construction of better accommodation facilities. An immediate task will be to clear up the back-log of cases through time-bound disposal procedure that are strictly adhered to.

No doubt delays in settlement of private and civil disputes poison our society and can lead to even violence. We can get an idea regarding the number of additional judicial personnel needed at the centre and elsewhere by looking at neighbouring West Bengal.

Consideration may also be given to the creation of an Ombudsman. The functions of the Ombudsman must be oriented to serving the essential purpose of helping parliament determine whether the existing laws are good and whether injustice has been done in the name of justice. [১৭৩]

১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ অবজারভারে। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন চলাকালে শিক্ষাক্ষেত্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। সম্পাদকীয়টিতে গণঅভ্যুত্থানের পর ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য এই দুই ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। শিরোনাম ছিল: 'Where To Start'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

The three-month transition, while it will be a period for the acting President, Chief Justice Shahabuddin Ahmed, and his Advisory Council mainly to work towards holding a fair and free election, for the alliances leaders and for others at the leadership level it could be one for home-work enough to study the problems and find answers to them. They (the problems) are legion. The nearly two-decade history of independence (with ten Presidents and three Acting Presidents) has seen government come and go more as intermittent efforts at grabbing power than as a sustained one to solve the people's problems. The most fundamental of them have rather aggravated than eased, producing a cumulatively desperate situation.

These are (i.e. the basic ones): poverty, erosion of social values, corruption (in the administration and outside), absence of freedom and the rule of law, last but not least, the absence of accountability. Each of these needs spelling out separately. The government that is in the making and is to take over following the election have to address them not one by one, but- and that is going to be the most challenging part of its job-almost simultaneously.

It has been an era of more a less choked ideas and speech the past three or four decades. The present upheaval should be one to usher in an era of freedom of speech and open debate. Repeal of the Education Ordinance and the Health Policy marks a right beginning. If we mean democracy in the true sense this must come into force immediately.

Among other immediate measures to be launched is the rule of law and its unhindered operation by a judiciary enjoying absolute freedom from the executive or from any other force. It covers nearly 90% of the institutional needs of a democracy, from crime control to the protection of fundamental rights and individual freedom.

Respect for law and the principle that all offences, personal, political, professional or other, should be put in the process of law should be the supreme principle. And that has to be quick and efficient. The practice of taking the law into one's hands which has become pretty common among us should be rigorously stopped, to keep society sliding into anarchy.

Another common breach of the law among us is the practising of personal or partly vendetta. This, like blood finds, can keep society permanently at war with itself. Magnanimous leadership should rise above it.

Accountability whose absence is at the roof of alleged ubiquitous corruption in the administration and in society has to be restored with the utmost rigour of the law-and it must appear to have been restored. There is in fact no other way to raise standards of efficiency and root out corruption than a rigorous demand made on everyone to account for what he does.

This naturally links up with the question of recognising honesty in services and rewarding the honest. Talent and creativity should receive their due recognition and reward in place of nepotism, sycophancy, influence or favour which has been so far a well practised art amidst us. The proper man in the proper place and promotion to higher place on merit alone should be the principle in matters of appointment and promotion.

Production in education and industry that has suffered seriously so far would also need priority attention. Campuses and factories must be reactivised as a special post-Ershad step to improve things. These and the rule of law as the chief instrument to bring society and the administration into line are, we know, easier enumerated than enforced. But given character and sincerity at the level of leadership at least a beginning can be made. These are, in fact, so critically related to social, political and economic rehabilitation that without them national recovery in the broad and true sense will remain a pie in the sky.[১৭৪]

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ অবজারভারে। সম্পাদকীয়তে নব্বইয়ের বিজয় দিবসকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বর্ণনা করা হয় একং আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর যে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে তাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'The Victory Day'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

December 16, 1971, stands as a prominent landmark in human history not only because it was the day on which a population of about 75 million (about 114 million now) broke the shackles of an oppressive rule indulging in injustices of various sorts (and in genocide during the last nine months of it), but also because it was the day on which the fighters for liberation from alien rule, oppression and injustice finally became victorious and asserted their birthright of an honourable existence as an independent and sovereign nation. Oppressed and

subjugated people everywhere and at all times will ever draw inspiration from this memorable event. An estimated three million valuable lives were lost during the nine-month-long war of liberation.

Every year this day is an occasion of remembering all these. At the same time, it is an occasion of reminding ourselves of the onerous responsibility that devolves on us on account of the supreme sacrifice made by the millions of the children of the soil in order to achieve the goal of liberation from the yoke of alien domination. Our responsibility is mainly in terms of ensuring that this land is developed into a land of political liberty and economic prosperity. The former is to be attained by means of firmly establishing democratic institutions and the latter mainly by means of achieving agricultural and industrial progress.

The objectives of political and economic development are sought to be attained particularly because there are no alternatives to them for ensuring the liberation of the human soul which always hankers after liberty and the freedom of self-expression. Material wants and political repression inseparably obstruct them.

The last nineteen years of our national life have not been quiet and eventless. Indeed, tumultuous events causing loss of many lives have characterised them off and on. We lost two of the greatest sons of the soil in 1975 and 1981. Their contributions to our national life can never be forgotten. The period of the last eight years and eight months was characterised by the rule of a particular type. The people's grievances against it led to its downfall. The new administration aims at holding the Jatiya Sangsad (National Assembly or Parliament, as it may also be called) on March 2, 1991.

With this objective openly declared, the new (caretaker) administration is off to a healthy start. We– and certainly every honest citizen– wish them Godspeed.

A free and fair election involves a great responsibility not only for the administration but for every citizen and organization. The political parties have a special responsibility in the matter. They now have the occasion to demonstrate to the people that their preachings and

behaviour are not at variance with one another. While it is an undeniable truth that "eternal vigilance is the price of liberty," it must also be remembered that tolerance of everybody's opinion is also an indispensable foundation of democracy.

Alongside, it is also necessary that we try our utmost to ensure that we attain economic development. Economic development, it must be remembered, is a matter of the social or the national level. Individual prosperity, without all-round economic development of the nation, does not indicate a healthy economic condition of the natio. Nay, it may be an indicator of the unhealthy situation in which some people have the opportunities for attaining prosperity while others are deprived.

We have to get rid of such a situation in order to ensure social justice. While election cannot be a cure-all for the entire spectrum of social and economic malaise that we have, it is a sine qua non of a healthy political life in today's world where democracy is the song of every soul. The national parliament (Jatiya Sangsad) is the guardian of the people's rights and has the responsibility of enacting laws to ensure them. Every political and economic problem of the nation is expected to be taken care of by it. Hence the great urgency of a fair election of our representatives to it.

The present interim government has the onerous task of seeing that the election is fair and free from all sorts of blemishes.

The interim government does also have the responsibility of standing against corruption of all sorts. The people who are guilty of it should not have a respectable place in society. The government is expected by the people to ensure that such people do not go unpunished. Tolerating guilt is considered to be a guilt by itself. But the time constraint of the interim government (90 days) must also be remembered. Preparations for the JS (Jatiya Sangsad) election has to be afoot without delay. And it is a big job. Over and above, the people expect the interim government to with problems of corruption, development et al.

It seems to us that in cases in which the time constraint is the only factor standing in the way of dealing adequately with a problem, the people would like to see the government at least to start dealing with it. A good beginning may well be reassuring to the people.

Alongside, of course, the moral development of the citizens (that is, ourselves) is an urgent necessity. We, the people, look to the government for its discharging the responsibilities. There is nothing wrong with this. But let us eschew the habit of expecting the government to do almost everything for us. We, as citizens, have to do our bit too. That is the way to development and prosperity. So help us God.[১৭৫]

বাংলাদেশ অবজারভারে ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের করণীয় সম্পর্কে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকারকে আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'A Free Press'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

Yesterday, the President of our interim government. Chief Justice Shahabuddin Ahmed, addressed the editors of the national dailies and assured them that he was very serious about the freedom of the press with responsibilities devolving upon it for ensuring the publication of objective news and views. Next to neutrality of government which, we believe, the Acting President is competent enough to ensure is the freedom of the press. Linked to it is the principle of objective, non-partisan journalism to make the national press a commendably credible news media. The change that has been brought by a mass movement and the spirit behind it should logically lead to both these results: one, as the fundamental right of the press and people; and the other as part of the ethics of journalism.

Unfortunately for us, though, for as long as the past three decades or more the press has smarted under many inhibitions and is yet to see them removed.

The Dhaka Union of Journalists (DUJ) in a recent rally of journalists at the Dhaka Press Club at the call of

the Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ) urged the Acting President to scrap black laws such as the Special Powers Act 1974 and the Printing Press and Publications Act. The demand cannot have come too soon; nor the administration addressed the issue too early.

This is the universally recognised ingredient of a democratic beginning to which the government (care-taker or elected) is committed. Needless to say the repressive laws coming in handy for the administrations so far, to curb the freedom of the press has not only blocked the free growth of objective and creative journalism in this country, it has been the main road-block on the path to democracy. An un-free or partially free press is a contradiction of democracy. And we have lived with it for so long.

The communication media as a whole needs to be so recast as to make possible free flowering of the nation with the widest possible opportunity for all to benefit by it. The primary need is one concerning policy and principle rather than action individuals— persons or personnel, except where there are specific charges of abuse of office or authority or any similar culpable offence. This is a point well worth consideration in the particular context of individual employees in any of the government, semi-government or non-government organisations, or generally in society.

Freedom of the press does imply the obligations that go with it. A free press will and should learn to behave responsibly almost on its own, barring a lapse here and a slip there which is human and speedily corrected.

But the great advantage is that only through a universal national debate on any question of national interest, launched by a free press, can democracy thrive. The successful democracies in the west or even the partially successful ones in the Third World owe their strength and viability fundamentally to a free press.

An objective press also means that there can be nothing like 'Trust papers'. This idea and institution was introduced as a concomitant of a dictatorial regime in the mid-fifties and has no reason or claim to continue into a freer and democratic transition that is under way.[১৭৬]

গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো। সংবাদপত্রগুলোতে তাঁর সাফল্যও কামনা করা হয়। ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'সফলতা কামনা করি'। এতে লেখা হয়:

> সকল বিরোধী দলের পক্ষ হইতে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে এবং তিনি সেই দায়িত্ব পালনে সম্মত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তাহার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং তিনি এতদসংক্রান্ত শপথও গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন জানাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার উপরে ন্যস্ত জাতীয় দায়িত্ব পালন শেষে পুনরায় তাঁহার পদে ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই।
>
> বিচারপতি সাহাবুদ্দীন যে মুহূর্তে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দেশ বলিতে গেলে সরকারবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সারাদেশে আন্দোলনের বিজয় উৎসব চলিতেছে বটে; কিন্তু দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি যেমন নাজুক, তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও নিশ্চল অবস্থায় নিপতিত। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এই দুইটি ব্যাপারে তিনি যে সচেতন রহিয়াছেন তাঁহার বক্তব্য হইতেও তাহা স্পষ্ট। আমরা আশা করিব, যে সব রাজনৈতিক মহল এবং জোট তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন- দেশ পরিচালনায়ও তাঁহারা তাঁহাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করিবেন। আমরা ইহাও আশা করিব যে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে অবিলম্বে দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিবে এবং পুনরায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা হইবে।
>
> বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তাঁহার এবং তাঁহার সরকারের মূল দায়িত্ব হইতেছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রদান এবং যে নির্বাচনের উপর হইতে দেশবাসীর আস্থা নির্মূল হইয়া পড়িয়াছিল সেই আস্থার পুনরুজ্জীবন। এজন্য তাঁহাকে যেমন ইলেকশন কমিশনের সার্বিক সংস্কার সাধন করিতে হইবে; তেমনি জাতীয় জীবনে নির্বাচনের পবিত্রতাও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহা গণতন্ত্রের জন্য তো বটেই, আমাদের জাতীয় রাজনীতির ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্যও অপরিহার্য। একটা কথা অনস্বীকার্য যে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অত্যন্ত কঠিন সময়ে এক গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। যথাসময়ে একটা অবাধ, সুষ্ঠু

> ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে রাজনৈতিক পরিবেশ, আইন-শৃংখলাজনিত যে স্থিতিশীল পরিস্থিতি অপরিহার্য, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা তাহাকে দিতে হইবে।
>
> দেশের বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যে একটা বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হইয়া গিয়াছে যে, শুধু আগামীর নির্বাচন নয়, দেশের পরবর্তী যেকোন নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠু ও অবাধ হইতে পারে– এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অতঃপর নির্বাচন যাহাতে একটি সুশৃংখল নিয়ম ও পদ্ধতির মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলনকারী 'প্রতিষ্ঠান' হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে– সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আবশ্যক। জাতীয় এই চিন্তাভাবনাকে বাস্তবে রূপদানের প্রাথমিক দায়িত্বই আজ পালন করিতে হইবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে- অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে। এ বিষয়ে একটা কথা সকল পক্ষকেই মনে রাখিতে হইবে যে, অতীতে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানকে পেশী শক্তির আখড়ায় পরিণত করার ব্যাপারে এক শেণীর তথাকথিত রাজনীতিক এবং আমলা ও সরকারী কর্মকর্তার ভূমিকা মোটেও নগণ্য ছিল না।
>
> এই বর্ণচোরা মহল যে নিষ্ক্রিয় থাকিবে তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং গোটা দেশবাসী, বিশেষতঃ গণতন্ত্রকামী ছাত্র-জনতা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের এ বিষয়ে অবশ্যই সজাগ থাকিতে হইবে। বস্তুতঃ আমাদের দেশের জন্য এখন এমন একটা ব্যবস্থাই নীতি ও পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোন দল বা মহল যেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে না পারে। আমরা বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে তাঁহার নূতন দায়িত্বভার গ্রহণ উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই এবং তাঁহার সার্বিক সফলতা কামনা করি।[১৭৭]

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আমাদের অভিনন্দন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্তি লাভের পর পরই প্রেসিডেন্ট পদ থেকে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগপত্র ও অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের এই দায়িত্ব গ্রহণ এ জাতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। আমরা দেশের সংগ্রামী গণমানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁকে স্বাগত আর প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই।
>
> প্রবল গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী সরকারের প্রধান জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা ত্যাগে সম্মতি দিতে বাধ্য হওয়ার পর অস্থায়ী সরকারের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবেন এই প্রশ্নে জাতি যখন প্রায় দিশেহারা সে মুহূর্তে তিন জোটের পক্ষ থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে-সকল শ্রেণীর মানুষ স্বাগত

জানায় এ সিদ্ধান্তকে। এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন এ দেশের আপামর মানুষের মনে কি বিপুল শ্রদ্ধার আসন জুড়ে আছেন। কর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা আর চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমেই তিনি এ শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন এবং আজকের এই ক্রান্তিলগ্নের দুরূহ দায়িত্ব পালনের জন্যে নিষ্ঠা আর দৃঢ়তারই প্রথম প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রত্যাশা নিয়ে সংগ্রাম বাংলাদেশের মানুষের জন্যে নতুন কিছু নয়। দূর অতীত থেকেই আমরা সংগ্রাম করে আসছি, রক্তও দিয়েছি। বিজয়ের মুখও দেখেছি একাধিক বার। তবে কুচক্রের কালোহাত প্রতিবারই ছিনিয়ে নিয়েছে বিজয়ের সোনালী ফসল। দীর্ঘ সংগ্রাম আর অমেয় ত্যাগের বিনিময়ে স্বৈরশাসনের পতন ঘটিয়ে এ দেশের সংগ্রামী মানুষ প্রত্যাশা পূরণের পথে আরেকটি সম্ভাবনার উন্মোচন ঘটিয়েছে। এই সম্ভাবনাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাওয়ার কঠিন দায়িত্ব মেনে নিয়েই অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ। এই সাহসী উদ্যোগের জন্যে আমরা বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের কাছে কৃতজ্ঞ এবং বিশ্বাস করি জাতীয় ইতিহাসে তাঁর এ ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সাথেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই দায়িত্ব গ্রহণের অল্প পরেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান এক সুস্পষ্ট ঘোষণায় জানিয়েছেন, গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা পূরণের যে সুযোগ আজ সৃষ্টি হয়েছে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেই তিনি তাঁর স্বপদে ফিরে যাবেন এবং নির্ধারিত তিনমাস সময়ের মধ্যেই তিনি তা করবেন। এমন একটি অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন তৃতীয় বিশ্বের জন্য হবে এক নতুন ইতিহাস। আমরা বিশ্বাস করি, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অনুরূপ ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন। এ ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য যে কেবল তাঁকেই গৌরবান্বিত করবে তাই নয়, দুর্ভাগ্যের চক্র আবর্তন থেকে মুক্তি দিয়ে জাতীয় ইতিহাসের অগ্রযাত্রাও সুগম করে তুলবে।

দীর্ঘ স্বৈরাচারী শাসনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটানো কোন সহজ দায়িত্ব নয়। আমরা আনন্দিত যে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের কঠোরতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন আছেন এবং গণআন্দোলনের দুই প্রধান নেত্রীর মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন। আমরা মনে করি, এই সহযোগিতার মাত্রার উপরও নির্ভর করবে অর্জিত বিজয়কে সংহত করে তোলার সাফল্যের পরিমাণ। এ দেশের সচেতন নেতৃত্ব আর সংগ্রামী ছাত্র জনতা এ সহযোগিতা সম্প্রসারণে ব্যর্থ হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা তাই পরিপূর্ণ আস্থা আর আনন্দের সঙ্গে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে অভিনন্দন জানাই আর প্রত্যাশা করি তাঁর উপর অর্পিত এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের নিরঙ্কুশ সাফল্য।[১৭৮]

সংবাদে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আমাদের অভিনন্দন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানরূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আমাদের অভিনন্দন।
>
> দুর্বার গণআন্দোলনের জোয়ারে এরশাদশাহী ভেসে যাওয়ার লগ্নে তিন বিরোধী জোট অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য তাঁকে মনোনীত করে। তাঁর প্রধান দায়িত্ব সার্বভৌম সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই গুরুদায়িত্ব পালনে আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি।
>
> এই সম্পাদকীয় কলামে এক বছরের মধ্যে আমরা বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে দ্বিতীয়বার অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথমবার ছিল প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর নিয়োগ উপলক্ষে। তিনি প্রবীণতম বিচারপতি ও যোগ্য প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও গত ৩১শে ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর অবসরগ্রহণের পর প্রধান বিচারপতি পদটি দুই সপ্তাহ ধরে শূন্য রাখা হয়। এতে সৃষ্টি হয় নানা সংশয়। অবশেষে সকল মহলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে নিয়োগ করা হয়।
>
> এবার বিচারপতি আহমদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনয়নে কারো মনে কোন সংশয় নেই। তাঁর মনোনয়ন সকল মহলের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছে। সংগ্রামী জনসাধারণ দেশে নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বিচারপতি আহমদের উপর অর্পণ করেছেন। বিচারপতি হিসেবে তিনি যেভাবে জনগণের আস্থা অর্জন করেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেও তিনি সেই ধরনের আস্থা অর্জন করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।
>
> প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের পর তিনি সংবিধান ও আইনের শাসনকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেও সেই সংকল্পে তিনি অটল থাকবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনই হবে তাঁর ক্ষমতার উৎস।
>
> গত নয় বছরের স্বৈরশাসনের ফলে দেশের শাসনব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে বিশৃংখলা। নিয়ম-কানুনবহির্ভূত হস্তক্ষেপের ছড়াছড়ি। এক ব্যক্তি ও তার তল্পিবাহকদের স্বেচ্ছাচার ভেঙ্গে ফেলেছে নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো। ব্যক্তি তোষণের নীতি জন্ম দিয়েছে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি। সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করতে গেলে এসবের মোকাবেলা করতে হবে।
>
> স্বৈরতন্ত্র দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছে সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে। বিচার বিভাগকে করেছে ধ্বংস-বিধ্বস্ত, প্রশাসনকে করেছে লণ্ডভণ্ড, সংসদকে পরিণত করেছে রাবার

স্ট্যাম্পে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে করেছে ভূলুণ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবার সযত্নে গড়ে তুলতে হবে, ক্ষতগুলোকে সারিয়ে তুলতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে স্বমহিমায়। গণতন্ত্রেরই স্বার্থে। দেশের শাসনযন্ত্রকে গণমুখী করে তোলার যেকোন উদ্যোগে জনসাধারণের সমর্থন থাকবে।

বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় হুকুমদারি পদ্ধতির মাধ্যমে দুর্নীতি ও অপচয়ের যে পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে, তারও প্রতিকার করতে হবে। যারা কলকাঠি নাড়তেন তারা চলে গেলেও তাদের দোসর ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। এদের নিরস্ত্র করতে না পারলে সবকিছুই ভেস্তে যাওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। এই কঠিন দায়িত্ব পালন কারো পক্ষেই সহজ হবে না। এ ব্যাপারে সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী।

স্বৈরশাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অনেকগুলো কালাকানুন। ঐসব গণধিকৃত কালাকানুন যতদিন থাকবে ততদিন গণতন্ত্রকামী মানুষের মন থেকে আশংকার অবসান হবে না। কালাকানুনগুলো বাতিল করার ব্যাপারে তিন জোটের যুক্ত ঘোষণায় ঐকমত্য ব্যক্ত করা হয়েছে। এমনকি এরশাদ সরকারের কর্মকর্তারাও এ সব কালাকানুনের সপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি যোগাড় করতে পারেননি। মৌলিক অধিকার খর্বকারী এসব কালাকানুন বাতিল করা হলে অবাধ নির্বাচনের জন্য সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা সহজ হবে। এ ব্যাপারে অবিলম্বে উদ্যোগ নিলে সবাই আশ্বস্ত হবে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অস্থায়ী সরকার হলেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছাড়াও তাদের ওপর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত থাকবে। যতদিন নির্বাচিত সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না হয়, ততদিন ন্যস্ত থাকবে শাসনভার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।[১৭৯]

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Administration And Development'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> There is no denying the fact that basic to all the requirements of socio-economic development is a sound administration impervious to the lures of corruption the agents of which constantly try to entice the good elements to its folds. For a number of years now our national development has been hampered by many setbacks on account of the allegedly strong influences of corruption in its various forms. If this is the case, we can easily hope to be off to a good start in national development once we overcome those.

The way bad influences obstruct development is exemplified clearly by our history since the end of the British rule in 1947. The ideologies of Islam at that time and of socialism in 1972 were much talked about but not faithfully followed. Consequently people was thinking whether even the British rule with its lack of development efforts were better on account of an administration that featured the policy of denying opportunities to people without discriminating between the corrupt and others. When we notice the tremendous economic and social progress achieved by many nations in the world of today we cannot but blame ourselves for our failure to utilise the opportunities offered by independence for achieving such progress.

The caretaker government with Chief Justice Shahabuddin Ahmed as the head will, we believe, succeed in setting the pace for a sound, incorruptible administration for all its successors to follow. With its stipulated brief tenure it may not be able to do anything more than setting a model of the type of government we all like to have. But the impact of it will, we like to believe, be long-lasting enough for taking the nation unmistakably to the path of development hampered so long by factors at the roots of which lies what may briefly be called corruption.

The paucity of resources has undoubtedly been a prime factor obstructing our development. But even when resources have been made available by way of foreign aid, we failed, on many occasions, to prove that we can utilise them well. At the international level, consequently, we all but lost face. What a painful experience for the nation this is can only be imagined by those who know. When a team of experts are sent by aid-givers to monitor inter alia what we do with the resources provided by them it is enough of a censure. We believe that a cause for such censure will not exist in the future.

The nation does surely have a shortage of financial resources. But the other resources that it does have are not well taken care of. The human resource is the foremost among them. It is unbelievable that our economists and planners are not capable of preparing development plans

> featuring the proper utilisation of the human resource. Developing it in such a way that its utilisation is ensured right now can take us only a part of the way to economic progress. For the rest, we have to undertake a thorough exercise of addressing our problem of economic and social backwardness with the help of the resources we can command (from within the country and outside). But resources are not all that we need for development. The veracity of this statement can be checked from recent economic history, particularly with reference to South Korea, Hong Kong, Singapore and Taiwan, not to speak of Japan the story of the development of which is a century old. Given the world market with some demand for the types of commodities we are in a position to produce and supply-in both the manufacturing and the agriculture sectors–and the vast possibilities likely to be opened to us if we can nurture and train our manpower in an appropriate manner, there is no reason why we should continue to lag behind so many other nations of the world in the matter of socio-economic development.[১৮০]

বাংলাদেশ অবজারভারে এই প্রসঙ্গে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর। সম্পাদকীয়তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিয়োগকে প্রকৃত গণতন্ত্র ও জাতির আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং তাকে দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Restoring Democracy'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> General (Retd.) H. M. Ershad has resigned. The euphoria over his fall has run its due course. The country must now come down to brass tacks. The task facing Justice Shahabuddin the unanimous choice as President of the caretaker government, is formidable. This is not least because of the time constraint of 90 days imposed by the constitution to fulfil his mandate. The key goal of the mandate is to provide for free and fair elections.
>
> The immediate steps entail the fixing of an appropriate date for the elections and the selection of a Chief Election Commissioner who under the constitution must be independent. The context of "independence" is important if unfortunate past precedents are to be avoided.

> The Acting President in consultation with all parties concerned must select a qualified person who commands respect, is free form any predilection in favour of any party or any candidate and is not barred by any provision of the constitution. A retired judge for example is automatically excluded since under the constitution he cannot hold an office of profit. The same circumspection must apply to nominating impartial co- commissioners.
>
> Obviously, the modalities of conducting free and fair elections are critical. All of us are aware of the endemic ills that have characterised such elections in the past including violence, intimidation, ballot-rigging, electoral fraud etc. With an electorate of over 30 million voters the problems cannot be minimised. Nor can we be complacent by thinking that this is an acceptable fact of life. Popular concern and interest must be mobilised. All ways and means to ensure transparency and visibility must be adopted including the presence of neutral observers from abroad. The mass media must be alert and impartial. Law enforcement agencies must play a critical supportive role to ensure a peaceful atmosphere.
>
> The political parties themselves have perhaps the most important role to play. They must establish an example this time that can serve as an enduring tradition. They have a duty to present to the electorate credible and endorsed candidates. Numerous parties with innumerable candidates can only create chaos and confusion. Like-minded parties can join hands to present a viable roster of candidates. Perhaps the most notable example that comes to mind is that Jukto Front of 1954 when the Awami League, KSP and Nizam-e-Islam party jointly submitted candidates who were to win a landslide victory because voters believed in their credibility.
>
> Yet it is not enough merely to have an impartial election commission and workable modalities for carrying out a free and fair election, though these are essential. We need to keep in mind one vital step beyond. What is the purpose of a free and fair election? It is to build stable institutions. Governments are ephemeral. Presidents or prime ministers may come and go but stable institutions must go on forever. The essence of democracy is not the

ability to install a good government. People do not always choose the best leaders. Real democracy is the ability to remove a bad government. Far more important are the institutions of government itself and the need for maintaining the fundamental checks and balances between the three different arms viz the executive, the legislature and the judiciary. The absence of these balances have led to an inexorable slide towards autocracy. Each of this arms must be independent of the other. The executive in particular must not be allowed to interfere with the judiciary and the legislature. The judiciary is the last bastion that protects the constitution and the rights of the individual. The right of judicial review and the independence of judges must be assured. The legislature must uphold and maintain accountability of the government exchequer.

Perhaps even more fundamental to the electorate is to define the constitution under which the country must operate. Arbitrary laws have been passed by the successive governments that have significantly altered the provisions of the 1972 constitution through the vehicle of the fourth schedule.

Presidential/Martial Law Orders, proclamations, rules and ordinances passed by autocratic executives have become incorporated into the constitution fundamentally altering its substance and content. The independence of the judiciary has been compromised and its entire context changed to make it subservient to the executive. The judicial infrasture remained totally imbalanced and its backbone broken by executive imposition. The back-log of cases has become virtually insurmountable. The original constitution must be restored and its provisions made transparent and visible. Free and fair elections must ensure that this objective is attained.

The unanimous appointment of Justice Shahabuddin is the first welcome step towards the restoration of true democracy and the nation's self-respect. We must do everything in our ability to assist him in fulfilling his crucial mandate.[১৮১]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা করেও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর এ ধরনের একটি সম্পাদকীয়

প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। এই সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে যে রদবদল করছেন তাতে প্রশাসন গতিশীল হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'প্রশাসনের সুষ্ঠুতার স্বার্থে'। এতে লেখা হয়:

> তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসনকে চাঙ্গা করিবার স্বার্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে এই সরকার সকল সরকারী ব্যাঙ্ক ও বীমার পরিচালনা বোর্ড বাতিল করিয়াছেন, মেয়র ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের অপসারণের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। ইহাছাড়াও প্রশাসনের ক্যাডারেও বহু রদবদল সাধিত হইয়াছে। বহু সেক্রেটারীকে অন্যত্র বদলি কিংবা ওএসডি করা হইয়াছে। কাহাকেও কাহাকেও দেওয়া হইয়াছে ইহার নূতন নূতন দায়িত্ব। ইহার কারণও একাধিক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, পররাষ্ট্র সার্ভিস অনিয়মে ভরা। তবে শুধু পররাষ্ট্র সার্ভিস নয়, সব কয়টি সার্ভিসেই একই দশা। এই অনিয়ম কোন যে শুধু এক ব্যক্তি এক মহলের চেষ্টায় হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও অসত্য নয় যে, ইহার সহিত মদদ যোগাইয়াছে সংশ্লিষ্ট সার্ভিসেরই কোন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। কুড়াল গাছ কাটে। কিন্তু সেই কুড়ালের বাঁট তৈয়ার হয় গাছের ডাল দ্বারাই।
>
> গত সাড়ে ৮ বৎসরের স্বৈরশাসনের আমলে ক্ষমতাসীন সরকারের বহু অবৈধ ও বেআইনী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করায় বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারী চাকুরীচ্যুত কিংবা সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছে। বহু সাহসী ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা বা কর্মচারী বহুভাবে হয়রানি ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। অন্যত্র কম গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি কিংবা ওএসডি হওয়ার মত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অসহায় শিকারে পরিণত হইয়াছেন--এমন সৎ, দেশপ্রেমিক ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। বিগত সরকার 'দুর্নীতির' জন্য কাহাকেও শাস্তি দিয়াছেন, ইহা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। যাঁহারা এই কারণে চাকুরী হারাইয়াছেন তাঁহাদের ব্যাপারেও তদন্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু মাসের পর মাস যাহাদেরকে ওএসডি ইত্যাদি করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের আর ঝুলাইয়া রাখা অর্থহীন।
>
> মোট কথা, যে সব সৎ নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী স্বৈরতার সহযোগিতা না করার দায়ে নানা হয়রানি ও হেনস্তার শিকার হইয়াছেন, তাঁহাদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদায় পূর্ব পদে বহাল করাও প্রশাসনের সুষ্ঠুতার স্বার্থেই অপরিহার্য বলিয়া আমরা মনে করি। কাস্টমস, ব্যাংক, যুব উন্নয়নসহ এমন কোন দফতর বা মন্ত্রণালয় নাই--যেখানে এহেন অনিয়ম ঘটে নাই। আমরা মনে করি, প্রশাসনের যে

সুষ্ঠুতার স্বার্থে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিভিন্ন দফতরে অফিসে রদবদল ঘটাইতছেন, সেই একই সুষ্ঠুতার প্রয়োজনেই এ ধরনের অনিয়ম ঘুচাইতে হইবে। তাহা হইলে জাতীয় এই সংকট সময়ে এই সব সৎ নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দেশের প্রশাসনের সুষ্ঠুতা ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে তাহাদের মেধা ও প্রতিভা, দক্ষতা ও যোগ্যতা সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্র ও অবকাশ লাভ করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইবে; ইহাই প্রত্যাশা।[১৮২]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে তিন বাহিনীর প্রধানের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। সাক্ষাৎকারে তাদের বক্তব্য প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল নূরউদ্দীন খান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল আমীর আহমদ মোস্তফা এবং বিমানবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার কমোডর ইরফান উদ্দীনের বক্তব্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয় এবং তাদের অভিনন্দন জানানো হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনী'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল নূরউদ্দীন খান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল আমীর আহমদ মোস্তফা এবং বিমানবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার কমোডোর ইরফান উদ্দীন টেলিভিশনে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রীয় অবস্থায় সশস্ত্রবাহিনীর অবস্থান এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থার কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা তিন প্রধানের এই বক্তব্যকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনন্দনযোগ্য মনে করি।

ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান অন্য যেকোন সেনাবাহিনী থেকে ভিন্ন। একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে জনসাধারণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই বাহিনীর বিকাশ। এই দেশের বীর সন্তানদের নিয়ে গঠিত এ সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাই জনগণের প্রত্যাশা থেকে ভিন্ন কিছু হতে পারে না। যে গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রত্যাশা ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা, আমাদের সশস্ত্রবাহিনী ভিন্ন কিছুর প্রত্যাশী হতে পারে না। বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে তিন বাহিনীর প্রধানদের বক্তব্য এ সত্যকেই পরিষ্কার করে তুলেছে যে আজকের বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও আপামর মানুষের এ প্রত্যাশার অংশীদার এবং এর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধাশীল। তিন প্রধানের বক্তব্য তাই দেশের সকল স্তরের মানুষকে কেবল আশ্বস্তই করেনি, উদ্বুদ্ধ এবং আনন্দিতও করেছে।

এক প্রশ্নের জবাবে জেনারেল নূরউদ্দীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন, বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র গণতন্ত্রের জোয়ার এসেছে। একনায়কের পতন হয়েছে বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধেরও সূচনা হয়েছিল গণতান্ত্রিক অধিকার দাবীর মাধ্যমে। তখন সামরিক বাহিনীও সর্বস্তরের জনগণের সাথে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। বর্তমানেও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার ক্রান্তিলগ্নে সশস্ত্রবাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা করে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সহজতর ও ত্বরান্বিত করেছে। জেনারেল নূরউদ্দীনের এই বক্তব্যেরই সমর্থন শোনা গেছে নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর প্রধানদের কণ্ঠে। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রোজ্জ্বল স্মৃতির সঙ্গে এ ভূমিকা আরেকটি সংযোজন যা জাতি চিরদিন শ্রদ্ধা আর গর্বের সঙ্গে স্মরণ করবে।

নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল আমীর আহমদ মোস্তফা সশস্ত্রবাহিনীর সম্ভাব্য ভূমিকা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, অন্য যেকোন গণতান্ত্রিক দেশের সশস্ত্রবাহিনীর ভূমিকার সঙ্গে আমাদের সামরিক বাহিনীর ভূমিকা হবে অভিন্ন। তা হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। তবে অন্যান্য দেশে বেসামরিক ও আধা-সামরিক কর্মকাণ্ডের জন্যে আলাদা সংস্থা আছে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যেই আমাদের তা নেই। কাজেই বিভিন্ন দুর্যোগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আহ্বান এনে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীকেও প্রয়োজনমত ভূমিকা নিতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, অতীতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের সেনাবাহিনী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে গৌরবজনক অবদান রেখে দেশবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িয়েছে। বস্তুত, বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ তার বীর সন্তানদের কাছ থেকে অনুরূপ সাহায্যকারী ভূমিকাই আশা করে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী সেনাবাহিনী গণতন্ত্রের দৃঢ় সমর্থকের ভূমিকা নেবে এটাই হচ্ছে সাধারণ প্রত্যাশা। আমাদের সশস্ত্রবাহিনীও অভিন্ন মতের অধিকারী, গোটা জাতির জন্যে এ এক আনন্দ সংবাদ।[১৮৩]

এই প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, তিনবাহিনী প্রধানের বক্তব্য জাতিকে আশ্বস্ত করেছে, সশস্ত্রবাহিনীও চায় দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকুক। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'তিন বাহিনী প্রধানের বক্তব্য'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

সম্প্রতি বাংলাদেশ টেলিভিশনে তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎকার তথা বক্তব্য সম্প্রচারিত হইয়াছে। সাধারণ কোন অবস্থায় যতই অস্বাভাবিক মনে হউক না কেন, স্বৈরাচার বিরোধী অভূতপূর্ব গণআন্দোলন ও গণজাগরণের প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনীতিতে যে পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, উহার নিরিখে তিন বাহিনী প্রধানের এই

সাক্ষাৎকার ও বক্তব্য প্রচারকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। জেনারেল এরশাদ ক্যান্টনমেন্টে থাকিয়া সরকার পরিচালনার কারণে সামরিক বাহিনীর বর্তমান চিন্তা-ভাবনা কি সে সম্পর্কে জনগণকে আশ্বস্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

অনেক রক্ত, অনেক ত্যাগ ও অনেক তিতিক্ষার পর গণআন্দোলনের যে বিজয় সূচিত হইয়াছে সে বিজয় সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার ব্যাপারে জনগণের আশা-আকাংক্ষারই বিজয়। এতদিন ধরিয়া একদিকে গণতন্ত্রের নামে, অন্যদিকে সেনাবাহিনীর ছত্রচ্ছায়ার অজুহাতে যাহা কিছু করা হইয়াছিল, তাহাতে গণতন্ত্রের যেমন লেশমাত্র ছিল না, তেমনি উহার সহিত সেনাবাহিনীরও কোন সম্পর্ক ছিল না। ত্রয়ী প্রধানের বক্তব্যে তাহাই বলা হইয়াছে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল নূরউদ্দিন খান তো স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সৈনিক, রাজনীতি তাঁহাদের কাজ নয়। তাহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা গণতন্ত্রকামী জনগণেরই কথা। অধুনা দুনিয়া জুড়িয়া স্বৈরতার যে পতন এবং গণতন্ত্রের যে জয়যাত্রা--সে সম্পর্কেও ত্রয়ী বাহিনী প্রধান যে সচেতন, সে বিষয়টাও তাঁহাদের বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িয়াছে।

ইহার প্রয়োজন ছিল। কারণ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায়শঃ দেখা গিয়াছে যে, গণতন্ত্রাশ্রয়ী রাজনীতি এবং রাজনীতিকদের নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং গণতন্ত্র প্রদানের নাম করিয়া দেশে দেশে যেভাবে ও যে প্রক্রিয়ায় উচ্চাভিলাষী সমর নেতাদের দ্বারা সেনা-শাসন কায়েম করা হয়, উহার পরিণতি কাহারও জন্য শুভ হয় না। জনসাধারণ মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং একান্ত অকারণেই দেশ ও জাতির গৌরব সেনাবাহিনীকে ক্ষমতাসীন মহলের দুঃশাসনের দায়ভাগ বহন করিতে হয়। এভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি মলিন করার কাজটা যাঁহারা করেন, তাঁহারা আসলে দেশ ও জাতির সর্বনাশ করেন। দেশ রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর দক্ষতা ক্ষুণ্ণ করেন।

বাংলাদেশ সেই সর্বনাশের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ছাত্রঐক্য, রাজনৈতিক জোট, দল ও বিভিন্ন পেশাজীবী মহলের সম্মিলিত আন্দোলন সময়ে গণজোয়ারে পরিণত হইয়া সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। গোটা জাতি এখন গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত। এই প্রস্তুতিপর্বে তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান প্রকারান্তরে জাতিকে এই মর্মে এই আশ্বাসই প্রদান করিয়াছেন যে, সেনাবাহিনীও চায়, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক; সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকুক এবং গণতন্ত্রের সমুদয় মূল্যবোধ সমাজের বুকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করুক। অতীতে যে কোন কারণেই হউক, এদেশে আইন ও বিচার বিভাগকে নানান হেনস্তার শিকারে

পরিণত করা হইয়াছে; দেশের সংবাদপত্রসমূহের কণ্ঠরোধে কোন রকম দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ করা হয় নাই; রাজনীতির নামে পেশী-শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে পরিণত করা হইয়াছে চরম এক প্রহসনে। কিছু লোক আইনের ঊর্ধ্বে থাকিয়া সব রকম দুর্নীতি করিতে সাহস পাইয়াছে।

অথচ স্বাধীন একটি দেশে সামাজিক শান্তি, অর্থনৈতিক সুবিচার ও স্থিতিশীলতার স্বার্থেই গণতান্ত্রিক আদর্শের এইসব মূল্যবোধকে আবশ্যিকভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হয়। অধুনা লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, অনেক ঠকিবার এবং ঠেকিবার পর তৃতীয় বিশ্বের সেনাবাহিনীর সদস্যবর্গ এবং তাহাদের প্রধানবৃন্দও গণতন্ত্রের এই মূল্যবোধকে সমভাবে মূল্য ও মর্যাদা দিতে শুরু করিয়াছেন। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ত্রয়ী প্রধানের বক্তব্যেও গণতন্ত্রের প্রতি সেই মূল্য ও মর্যাদাই প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদের ইহাই আশা যে, সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশের বুকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গণতন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকিবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বদের ভুল-ভ্রান্তি হইলেই দেশের জনগণকে ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ধ্বংস করা হইবে ইহা বর্তমান সময়ের সভ্য সমাজের কথা নয়।[১৮৪]

দায়িত্ব গ্রহণের পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এই ভাষণ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। দৈনিক বাংলায় পর পর দু'দিন এই প্রসঙ্গ নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর। নির্বাচন প্রসঙ্গে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়া দরকার। কারণ, এর ওপর কেবল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই নয়, জাতির ভবিষ্যতও নির্ভর করছে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: ' গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে বলেছেন, তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান কর্তব্য হল দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্য তিনি সর্বস্তরের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

আমাদের জনগণের গণতন্ত্রপ্রীতি সর্বজনবিদিত। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল সমাজের

সর্বক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা কায়েম। বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তাদের স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেল। তাই বাধ্য হয়ে তাদের আবার পথে ও ময়দানে নামতে হল মূলত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্দোলনকালে তাদের উপর চরম দলননীতি চলেছে। তাদের মিছিলে ও সভা-সমাবেশে লাঠি, গুলি ও কাঁদানে গ্যাস চলেছে। বহু লোককে দীর্ঘ দিনের জন্য ফেলে রাখা হয়েছে কারাপ্রাচীরের আড়ালে অন্ধকারে। উপনিবেশবাদী পাকিস্তান সরকারের কঠোর দমননীতির ফলে বহু অমূল্য প্রাণ অকালে ঝরে গেছে। স্বাধীনতার পরও কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র পায়নি এদেশবাসী। ১৯৮২ সালে নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ স্বৈরশাসন কায়েম করেছিলেন। দীর্ঘ আট বছরের অব্যাহত ও সংকল্পবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণ এই স্বৈরতন্ত্র থেকে দেশকে মুক্ত করেছে। তাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য একটাই দেশে পরিচ্ছন্ন ও গণকল্যাণমুখী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আট দল, সাত দল ও পাঁচ দল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, গণতন্ত্র কায়েমই তাদের মূল্য লক্ষ্য। এই লক্ষ্য রূপায়ণের জন্য তারা বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথম সুযোগেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছেন। আশা করা যায়, সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশবাসী পাবে তাদের ভোটে নির্বাচিত একটি সার্বভৌম ও কার্যকর জাতীয় সংসদ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি সরকার। জাতির কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা অপরিহার্য। জনগণ, ভোটার, রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ-- সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এই সহযোগিতা দানে। গণতন্ত্রে জনসাধারণই মূল শক্তি। তারা যাকে চাইবেন, তারাই সংসদে যাবেন, সরকার গঠন করবেন এবং স্থানীয় স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বচনের জন্য পরমতসহিষ্ণুতা অপরিহার্য ও একান্ত জরুরী। সকল রাজনৈতিক দল তাদের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মসূচী জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করবে। সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক জনগণ। তারাই বেছে নেবেন তাদের প্রতিনিধিদের। এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনকে। কুৎসা রটনা, গালাগালি, মারামারি ও হানাহানির কোন সুযোগ নেই। এ ধরনের কিছু করলে গণতন্ত্র দূরঅস্তাই থেকে যাবে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। ভোটারদের রায় মোতাবেকই ঘোষিত হতে হবে

নির্বাচনের ফল। কেউ যাতে দুর্নীতি ও হিংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত হতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে পুলিশ বাহিনীকে। আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়া দরকার। কারণ, এর উপর কেবল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই নয়, জাতির ভবিষ্যতও নির্ভরশীল।[১৮৫]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলায় অপর সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর। এই সম্পাদকীয়তে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণে অর্থনৈতিক বিষয়ে বক্তব্যেও রেশ ধরে মন্তব্য করা হয় যে, জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এখন আর শৈথিল্যের পিছনে ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই। জাতি হিসাবে টিকে থাকবার জন্যে আমাদের এখন অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপর সর্বাত্মক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যাতে কোন বাধা না আসে সে ব্যাপারেও সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন দায়িত্বভার গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন দেশের অর্থনীতি আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আমরা বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। আমাদের অর্থনৈতিক জীবন যাতে কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শনিবার সচিবদের উদ্দেশে ভাষণ দানকালেও তিনি একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। নিঃসন্দেহে আমরা একটি অত্যন্ত দরিদ্র জাতি। বিশ্বের সবচাইতে অনগ্রসর জাতির একটি। এ দেশের মানুষের কখনোই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা-এসব মৌলিক চাহিদা মেটে নাই। বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চরম দুর্নীতি ও ভুল অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এদেশের মানুষের দারিদ্র্য ক্রমশঃ প্রকটতর হয়েছে। এই অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তির প্রয়োজন। আর এই লক্ষ্য পূরণে আমাদের সবাইকে কাজে নামতে হবে।

দেশে গত কয়েক মাস ধরে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে, তার প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সেই লক্ষ্যে কাজও শুরু হয়েছে। অচিরেই তা অর্জিত হবে বলে আমরা আশা করছি।

বলা যেতে পারে যে, এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুস্থিতি এসেছে। তাই আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের, জনগণের দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিতে হবে। অন্যথায়, এতদিন ধরে যে গণআন্দোলন চলেছে তার মূল লক্ষ্য থেকে আমরা অনেক দূরে সরে যাব। কেন না, দেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশার অবসানই তো যে কোন -গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরম লক্ষ্য।

এখন তাই আমাদের অফিস-আদালতে পুরোদমে কাজ চালাতে হবে। সেখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ফিরে যেতে হবে তাদের দফতরে। কলেকারখানায় আবার উৎপাদন শুরু করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব প্রকল্পের কাজ চলছিল সেগুলো সমাপ্ত করার জন্য কাজ করতে হবে। জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এখন আর শৈথিল্যের পিছনে ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে ভঙ্গুর অর্থনীতি লাভ করেছি। এখন তা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। অবহেলা ও শৈথিল্যের দ্বারা আমরা তার আরো অবনতি ঘটাতে পারি না। জাতি হিসাবে টিকে থাকবার জন্যে আমাদের এখন অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপর সর্বাত্মক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আর এ ব্যাপারে যার যা দায়িত্ব আছে তা পালন করতে হবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যাতে কোন বাধা না আসে সে ব্যাপারেও সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা এখন আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য কাজ করাকেই এখনকার সবচেয়ে বড় কর্তব্য বলে মনে করি।[১৮৬]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ অবজারভারে সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর। এই সম্পাদকীয়তে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণে অর্থনৈতিক বিষয়ে বক্তব্যের সূত্র ধরে মন্তব্য করা হয় যে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশে তাঁর প্রথম ভাষণেই অর্থনৈতিক সংকটের ওপর জোর দিয়েছে যা নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সরকারি দপ্তরে ব্যয় কমানো, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে নানা পরামর্শ তুলে ধরা হয় এই সম্পাদকীয়তে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Austerity And The Price Spiral'। এতে লেখা হয়:

> Both austerity and the price spiral are subjects on which we did, time and again, draw the attention of the Government in these columns. These are matters of serious concern for the nation particularly in view of the fact that very little

was achieved by the previous government in ameliorating the situation about them. The main reason was, of course, the reluctance to move away from the traditional way of life. On the other hand, the pitiable economic condition of the country demands immediate action of an urgent nature. It is noticeable also that our President Chief Justice Shahabuddin Ahmed, in his very first address to the nation on Friday evening, underlined the condition of crisis of the economy. It is important, therefore, that the matter is taken up by everybody within and outside the government with the utmost seriousness.

Austerity in the government offices has been urged from time to time both by the administration and by outsiders like ourselves. It seems that specific measures to ensure that austerity is really enforced everywhere have to be enumerated. Cuts in the expenditure of all the ministries can well be enforced by the Finance Ministry for this purpose.

The price hike of commodities to be procured from the market acts as a countervailing force against economy measures enforced by way of financial controls. Price hike, therefore, tends to work against austerity measures.

Not only because of this fact but also on account of the general hardship caused to the general public price hike has to be fought against on all fronts. While increased production in both the agriculture and the manufacturing sectors is the only long-run measure that can effectively counter the forces promoting it, the temporary measure of allowing imports of particular commodities may be needed for alleviating the pressure of demand on their supplies. The long-run measure of ensuring an increased production of commodities is, of course, indispensable particularly in our case on account of the need for ensuring the accrual of income to both producers and workers when widespread unemployment is inextricably associated with poverty.

For containing the tendency of traders to resort to price hike for their personal profit, we would suggest- as we did before-that (i) the government would not only

monitor price trends but also have a permanent machinery for ensuring a check on price hike, and (ii) the Chambers of Commerce undertake the responsibility of seeing that traders behave in a responsible manner in charging the prices of commodities whether imported or manufactured at home. On the part of consumers one measure of their self defence, as we pointed out before, would be to organise themselves into more and more consumers' cooperatives.

We are repeating these ideas of ours here today just because we have a new government from which the common people expect much.

The price hike of consumers' items is often a cause of the rise in the production costs of commodities in both the manufacturing and the agriculture sectors. Unless it is contained at the initial stage, the price spiral may go beyond our grasp to take the economy down to a vortex of crisis. Hence the need for an appropriate urgent action.[১৮৭]

গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর তিন রাজনৈতিক জোটের আহ্বান ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণাভুক্ত পত্রিকা। দৈনিক বাংলা এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর। আনন্দ-উল্লাসের নামে আইন ভঙ্গ না করার জন্য আটদল, সাতদল ও পাঁচ দলীয় জোট জনসাধারণের প্রতি যে আহ্বান জানায় তার প্রতি সম্পাদকীয়তে সমর্থন জানানো হয়। সম্পাদকীয়তে তিন জোটের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানায় দৈনিক বাংলা। শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের আহ্বান'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> নিজের হাতে আইন তুলে না নেয়ার আহবান জানিয়েছে আট, সাত ও পাঁচদলীয় নেতৃবৃন্দ। এই তিনটি জোটের পক্ষ থেকে দেয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে জনগণের প্রতি এই আহ্বান জানিয়ে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টা সম্পর্কে তাদের হুশিয়ার থাকতে বলা হয়েছে। তিনটি জোটের এই আহ্বানকে আমরা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। চলমান আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য সবাইকে অবশ্যই শান্ত থাকতে হবে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে এবং গোলযোগ ও নৈরাজ্য সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টা সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে হবে। ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতাই হবে আমাদের এই মুহূর্তে কর্তব্য।

> পক্ষান্তরে, কেউ যদি নিজের হাতে আইন তুলে নেয়, তাহলে যে কোন ধরনের গোলযোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে; সুযোগ সন্ধানীরা এই অবস্থার সুযোগ নিতে পারে। এই অবস্থায় কেউ ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার অপচেষ্টায় মেতে উঠতে পারে। তাছাড়া, জনগণের শত্রুরাও তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত হতে পারে।
>
> দেশে এখন এক ক্রান্তিকাল চলছে। জাতি প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল, উন্মুখ। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের শুভ সূচনাও হয়েছে। পালাবদলের এই সময় ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে উশৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিলে, ধৈর্য ও সংযম হারালে চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়ার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। পরিণামে জাতীয় জীবনে পুনরায় হতাশা নেমে আসতে পারে।
>
> চলমান আন্দোলন বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে জনগণের উল্লাস ও উচ্ছ্বাস খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনরূপ প্রতিহিংসা ও ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করা, শত্রুতার কারণে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিসাধন কোনমতেই কাম্য হতে পারে না এবং তা আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
>
> আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বিচার-ব্যবস্থা রয়েছে। আছে আইনানুগ কর্তৃপক্ষ, আছে আইন ও শৃংখলারক্ষাকারী সংস্থা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তাদের উপরই। তারা সেই দায়িত্ব পালনও করছে। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তাদের ঐ সব কর্তৃপক্ষের হাতেই তুলে দিতে হবে। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে শাস্তি দেয়ার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে।
>
> তিন জোট কাউকে নিজের হাতে আইন তুলে না নেয়ার যে আহ্বান জানিয়েছে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাতে সাড়া দেয়ার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।[১৮৮]

গণঅভ্যুত্থানের পর তিন রাজনৈতিক জোটের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, জেনারেল এরশাদের সহযোগী ও তার দল জাতীয় পার্টির কোনো নেতা-কর্মিকে তিন জোট বা জোটভুক্ত কোনো দলে গ্রহণ করা হবে না। এই বিষয়ে ১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়তে তিন রাজনৈতিক জোটের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়। শিরোনাম ছিল: 'A United Front'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> There was a news item in last Sunday's newspapers that the three alliances (Eight party, Seven party & Five party) together have decided not to take within their folds any person associated in any way with the political articulation

(Jatiya Party) of the government of the former President (Mr. H. M. Ershad). We are wondering whether this is an indication of the formation of something like the United Front of 1954. The United Front of those days, it may be recalled, swept the polls in East Pakistan (which was the name of Bangladesh at that time) and succeeded in ousting the ruling Muslim League from its position of power.

It is natural, of course, for opposition parties to join themselves together into a United Front when there is a strong common enemy in the party in power. Right now, the general atmosphere is a bit different. In decrying the misdeeds of the previous regime the opposition parties are uttering slogans in unison. Some people belonging to these parties are supposing that the "Jatiya Party" is now a non-entity. But is it really so? Is there no need to think that it is enough of a power that counts so much to the opposition parties of yesterday to require standing unitedly against? On the other hand, the people of the Jatiya Party are rich in financial and all other resources on account of their having been in power.

The three (and more) alliances that stood against Mr. H. M. Ershad yesterday in spite of their mutual differences on many matters have to keep this fact in mind in order to obviate their own differences for organizing themselves into something like a United Front in order to use the resultant common platform for the purpose of remaining united against what they fought against. Their common enemy is out of power right now. But this is just a temporary arrangement under a caretaker government which will just hold an election in which there will be an urgent need for unity among all the alliances that are united today, namely the eight-party, the seven-party, the five-party etc. alliances and the other parties, groups and individuals who stand together right now. Their common enemy to fight against would be the Jatiya Party people and their allies that are very powerful in terms of material wealth which may well count much in tomorrow's election campaigns.[১৮৯]

গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও আটদলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাতদলীয় জোট নেত্রী খালেদা

জিয়ার বিভিন্ন আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণাভুক্ত পত্রিকা। দৈনিক বাংলা এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর। সম্পাদকীয়তে দুই নেত্রীর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং আশা প্রকাশ করা হয় যে, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয় পূর্ণতা লাভ করবে। শিরোনাম ছিল: 'দুই নেত্রীর আহবান'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> বৃহস্পতিবার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যপানে এখন জাতির এগিয়ে যাওয়ার পালা। আগামী তিন মাসের মধ্যে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার। বাস্তবায়িত হবে সংগ্রামী জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন।
>
> এই যুগসন্ধিক্ষণে চলমান আন্দোলনের দুই নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা জনগণের প্রতি যে আহবান জানিয়েছেন বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
>
> জননেত্রী বেগম খালেদা আইন-শৃংখলার পরিপন্থী কোন কাজ না করার আবেদন জানিয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনে জনগণকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকার অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের সরকারের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আহবান জানিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।
>
> পরিপূর্ণ ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই চলমান আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এর জন্য জাতিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। অনেক দুর্দশা পোহাতে হয়েছে। এর ফলেই আজ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। এখন এই বিজয়কে সুসংহত করতে হবে এবং চূড়ান্ত সাফল্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অবশিষ্ট পথটুকুও কুসুমাস্তীর্ণ নয়, মসৃণ নয়। সেখানে পদে পদে হোঁচট খাওয়ার আশংকা থাকে। গণবিরোধী শক্তিগুলো চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। বাধা আসতে পারে যথার্থ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পথে।
>
> প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে নানাভাবে। তবে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, গোলমাল বাধিয়ে, জনমনে ভীতি সঞ্চার করার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টির আশংকা সব চাইতে প্রবল। মনে রাখা দরকার যে অশুভ শক্তি এখনও তৎপর রয়েছে। তারা দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট করে নতুন সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

ইতিমধ্যেই বেশ কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে। অনেকে আইন হাতে তুলে নিয়েছে। কোথাও কোথাও হামলা হয়েছে। হামলা হয়েছে সংবাদপত্র অফিসেও। অথচ গণতন্ত্র অর্থই হচ্ছে সকল মত প্রকাশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাই গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি ও বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের নিন্দনীয় ঘটনা কারও অভিপ্রেত হতে পারে না।

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে চলমান আন্দোলনের বিজয় পূর্ণতা লাভ করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। নির্বাচনের কর্মসূচী, আশা করা যায়, অচিরেই ঘোষিত হবে। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই তার কর্তব্যপালনে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, এদেশের গণতন্ত্রকামী সচেতন জনতা সহযোগিতার এই আহবানে সাড়া দিয়ে চলমান আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।[১৯০]

জনসাধারণের প্রতি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও আটদলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাতদলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়ার আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। দুই নেত্রীর আহ্বানের সাড়া দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, স্বৈরাচার দমন করে জনতা লক্ষ্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আরেকটু ধৈর্য ও ত্যাগ চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করতে পারে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই মুহূর্তে কোন প্রকার শৈথিল্য না দেখানোর আহ্বান জানানো হয়। শিরোনাম ছিল: 'লক্ষ্য আজ চূড়ান্ত বিজয়'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের মানুষ একটি মহান বিজয় অর্জন করেছে সত্য, তবে বিজয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য এখনও দূরে। বিজয়ী জনতাকে সেই লক্ষ্যের পথে দৃঢ় পদে এগিয়ে যেতে হবে। স্বৈর শাসনের পতনের পর থেকে আন্দোলনের দুই নেত্রী তাদের সকল বক্তৃতা-বিবৃতিতে এ সত্যের প্রতি সবার মনযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরা মনে করি এই দিকটির প্রতি মনোযোগী হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কেননা জনগণের বিজয়কে নস্যাৎ করার চক্রান্তের অভাব অতীতে কখনও ঘটেনি এবং এখনই যে ঘটবে এমন নিশ্চয়তার কোন ভিত্তি নেই।
>
> সোমবার এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে আওয়ামী লীগ ও আটদলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহবান জানিয়েছেন। অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী দল ও সাতদলীয় জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত রাখার ডাক দিয়েছেন বিএনপি জাতীয় কমিটির বৈঠকে। আমরা মনে করি

> তাদের এই বক্তব্য পরিপূরক এবং এর মাধ্যমে কার্যত সময়ের দাবিই প্রকাশ পাচ্ছে। এইসব দাবির বাস্তবায়নই চূড়ান্ত লক্ষ্য তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব করতে পারে।
>
> স্বৈরশাসক এরশাদ ও তার দোসরেরা ক্ষমতার আসন থেকে অপসারিত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তথা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত। সন্দেহ নেই, লক্ষ্যের পথে এ এক বড় অগ্রগতি। অগ্রগতি তবে এটুকুই সব নয়। এ সময়ে তাই সতর্কতা আর দৃঢ়তা অপরিহার্য। দৃশ্য এবং অদৃশ্য নানা পথেই চক্রান্ত তার থাবা বিস্তারের চেষ্টা করতে পারে। জনতার সংগ্রামী ঐক্যই কেবল হতে পারে এইসব অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রকৃত রক্ষাকবচ। সকল পর্যায়ে শান্তি আর শৃংখলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই ঐক্যকে সংহত এবং কার্যকর করা সম্ভব। সময়ের এ প্রয়োজন সম্পর্কে শীর্ষ নেতৃত্বের সচেতনতায় আমরা আশ্বস্ত বোধ করি, তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, সকল স্তরের মানুষকেও সমানভাবে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। শেখ হাসিনা তার ভাষণে অপর একটি প্রয়োজনের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দ্রব্যমূল্য কমিয়ে জনসাধারণের আয়ত্তে আনার আহবান জানিয়েছেন। একটি অনুন্নত দেশে যেখানে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এমনিতেই সীমাবদ্ধ সেখানে দ্রব্যমূল্য জীবনকে সহজেই দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। আর এই পথ ধরে চক্রান্তের কালোহাত বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি সহজতর হয়ে ওঠে। আমাদের বাজার পরিস্থিতি এমনিতেই অসন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ অবস্থার যে কোন অবনতি জনতার চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পথে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ সতর্কতা তাই অপরিহার্য।
>
> আমরা এ ব্যাপারে আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের কাছ থেকে উদ্যোগী ভূমিকা আশা করি। বাড়তি মোনাফার লোভ সংবরণ করে এখনও দ্রব্যমূল্য কমিয়ে আনা সম্ভব। আর তেমন উদ্যোগ কেবল জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকেই সহায়তা করবে না, এর মাধ্যমে ব্যবসায়ী সমাজের প্রকৃত স্বার্থও নিশ্চিত হতে পারে। দ্রব্যমূল্যের গতিরোধের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ তথা ক্রেতা সাধারণও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। বিলাসিতা বর্জন আর সাময়িক কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনের মাধ্যমে চাহিদা কমিয়ে আনলেও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হ্রাস পেতে বাধ্য। আমরা এ দিকগুলোর প্রতি সবার নজর আকৃষ্ট করছি। স্বৈরাচার দমন করে জনতা আজ লক্ষ্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আরও কিছু ধৈর্য আর ত্যাগ চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করতে পারে। এ মুহূর্তে তাই আর যাই হোক, কোন প্রকার শৈথিল্যের অবকাশ নেই।[১৯১]

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণাভুক্ত পত্রিকা। ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। ছাত্রঐক্যের পক্ষ থেকে অভিযোগ

করা হয়, দুষ্কৃতিকারীরা সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নামে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের কঠোরভাবে দমন ও প্রতিরোধ করার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহবান জানায় ছাত্রঐক্য। দৈনিক ইত্তেফাকের এই সম্পাদকীয়তে ছাত্রঐক্যের আহ্বানকে সময়োচিত অভিহিত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'ছাত্রঐক্যের আহ্বান'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের পক্ষ হইতে একটি সময়োচিত বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, সাম্প্রতিক গণতন্ত্র আন্দোলনে অর্জিত ছাত্র-জনতার বিজয় নস্যাৎ করার ব্যাপারে একটি চিহ্নিত মহল এখনো সক্রিয়। ছাত্রঐক্যের তরফ হইতে আরো অভিযোগ করা হয় যে, এক শ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী মাস্তান সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নামে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর অপপ্রয়াস চালাইতেছে। তাহারা গাড়ী ছিনতাই, হুমকি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় ছাড়াও অবৈধ অস্ত্র নিয়া ঘোরাফিরা করিতেছে। বিবৃতিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এবং অপরাপর রাজনৈতিক দলও এই ধরনের চাঁদা আদায়কারী, মাস্তান ও দুষ্কৃতিকারীকে কঠোরভাবে দমন ও প্রতিরোধ করার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহবান জানাইয়াছে। প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে তাহারা সবরকম সাহায্য প্রদান করিবে বলিয়াও আশ্বাস দিয়াছে।
>
> ছাত্রঐক্যসহ রাজনৈতিক মহলের এই বিবৃতিকে আমরা অত্যন্ত সময়োচিত মনে করি। তাহা এইজন্য যে, বিগত সরকারের আমলে ছাত্র সমাজের মধ্যকার অপরাধপ্রবণ গুণ্ডা প্রকৃতির তরুণদের বিভিন্ন সময়ে প্রচুর অস্ত্র সরবরাহ করা হইয়াছে। শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রবাজি ও বাহিরে অস্ত্রের ভয় দেখাইয়া বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে অর্থ বা চাঁদা আদায়, রাস্তায় প্রকাশ্য ছিনতাইসহ নানা অপরাধে ইহারা লিপ্ত ছিল।
>
> ঢাকাসহ সারাদেশে এই শ্রেণীর অপরাধপ্রবণ তরুণের দৌরাত্ম্যে রাস্তাঘাটে- এমনকি নিজ গৃহেও সাধারণ নাগরিকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই সশস্ত্র ও অপরাধপ্রবণ ছাত্র নামধারী তরুণদের অপতৎপরতার কারণে সমাজে ছাত্রসমাজের যে আদর্শমণ্ডিত ঐতিহ্য ছিল তাহা ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল।
>
> সাম্প্রতিক গণতন্ত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়া দেশের ছাত্রসমাজ একটি একনায়ক ও স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাইয়া পুনর্বার এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবস্থায় সশস্ত্র মাস্তান দুষ্কৃতিকারী ছাত্র তরুণেরা অনেকে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে বটে; কিন্তু এই অভিযোগও পাওয়া যাইতেছে যে, তাহাদের অনেকে নাকি এখনও প্রকাশ্যে চলাফেরাও করিতেছে। শেষোক্তরা ইতিমধ্যে অস্ত্রের মাধ্যমে

> হুমকি প্রদর্শন করিয়া অর্থ আদায় শুরু করিয়াছে, ইহা সংবাদেও প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অবৈধ অস্ত্র যতদিন অপরাধী ও অপরাধপ্রবণ তরুণদের হাতে থাকিবে, ততদিন তাহার ব্যবহার রোধ করা যাইবে না এবং সমাজেও শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়া আসিবে না। সে জন্য ইতিমধ্যে আমরা ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র যে অবৈধ অস্ত্র ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে, কালবিলম্ব না করিয়া তাহা উদ্ধার করার জন্য পুলিশ বিভাগসহ সরকারী এজেন্সীগুলির প্রতি আহবান জানাইয়াছি।
>
> আমরা জানি, সরকারী আইন-শৃংখলা সংস্থাগুলি কোথায় কাহার হাতে অস্ত্র রহিয়াছে, তাহা জানে। এবং তাহারা ইহাও জানে যে, সমাজে সত্যিকার অর্থে কাহারা মাস্তান ও দুষ্কৃতিকারী, কাহারা বিভিন্ন মহল ও সংগঠনের নামে চাঁদা আদায় করে, ছিনতাই, দুষ্কার্য ও চাঁদা আদায়ের নামে কাহারা জনজীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। সুতরাং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যরা সক্রিয় হইলে এই এই অস্ত্র যেমন উদ্ধার হইতে পারে, তেমনি সমাজে শান্তি-শৃংখলাও সহজে ফিরিয়া আসিতে পারে।
>
> বিশেষতঃ আজ যখন সকল মহল হইতে দুষ্কৃতিকারীদের দমনের দাবী উঠিয়াছে, তখন দুষ্কৃতিকারীরা আর কোন ছত্রচ্ছায়া যে পাইবে না, ইহা অবশ্যই ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট মহলের তৎপরতা এই মুহূর্তে জরুরী।[১৯২]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৯০ সলের ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। দৈনিক ইত্তেফাক এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর। এই সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, গণঅভ্যুত্থানের পর এই গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো কোনো স্বৈরশাসকের পক্ষেই শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ভবিষ্যতে আর কোন সামরিক বা বেসামরিক স্বৈরশাসক যেন সেনাবাহিনীর মদদ না পায় এবং সেনানিবাসের সুসংরক্ষিত এলাকায় বসে জনগণের ওপর অপশাসন চালাতে না পারে- এটাই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মূল তৎপর্য। শিরোনাম ছিল: 'সেফ কাস্টোডিতে এরশাদ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> পদত্যাগকারী প্রেসিডেন্ট হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদকে গেরেফতার করা হইয়াছে, তিনি আর ক্যান্টনমেন্টে বাস করিতেছেন না। বিএসএস-এর সংবাদ মোতাবেক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র অনুযায়ী তাঁহাকে 'নিরাপত্তামূলক অন্তরীণে (প্রোটেকটিভ ডিটেনশন)' রাখা হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে আরো প্রকাশ, সাবেক প্রেসিডেন্টকে 'সেফ কাষ্টোডিতে' নেওয়া হইয়াছে। একটি বেসরকারী সংবাদ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী গেরেফতারকৃত সাবেক প্রেসিডেন্টকে গতকল্য দুপুরে তিন

গাড়ী পুলিশ ও তিন গাড়ী আর্মির বেষ্টনীতে সেনানিবাস হইতে গুলশানের একটি বাড়ীতে নেওয়া হয়। পূর্বাহ্নে তড়িগড়ি করিয়া বাড়িটি অন্তরীণের উপযোগী করা হয়। উক্ত বেসরকারী সংবাদ সংস্থার সূত্রে ইহাও প্রকাশ, বর্তমানে দেড় শতাধিক পুলিশ এই বাড়িটি ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে সেনানিবাসে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদের অবস্থানকে কেন্দ্র করিয়া সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিল। সামরিক বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হইল।

পদত্যাগকারী প্রেসিডেন্ট এরশাদের গেরেফতার ও অন্তরীণের এই ঘটনাটি ঘটিল তাঁহার পদত্যাগ করিবার ছয় দিনের মাথায়। ৬ই ডিসেম্বর তিনি পদত্যাগ করেন এবং ইহার পরেও তিনি তাঁহার সেনানিবাসস্থ বাসভবনেই অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দল এবং ছাত্রঐক্যসহ বিভিন্ন মহলের তরফ হইতে পদত্যাগকারী প্রেসিডেন্টকে গেরেফতার করার এবং সেনানিবাসে "আশ্রয় প্রদান" না করার দাবী উঠিতে থাকে। কেহ কেহ অবশ্য এই আন্দোলনের বহু পূর্ব হইতেই এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করিয়া- আসিতেছিলেন যে, যেহেতু ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট 'জনগণের ভোটে নির্বাচিত' হওয়ার দাবী করিয়া থাকেন, সেইহেতু পেশায় সৈনিক হিসাবে সেনানিবাসে তাহার অবস্থান উচিত নয়। কারণ, ইহার ফলে সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতার রাজনীতির সহিত জড়াইয়া ফেলা হয়।

কিন্তু সেই সৎ পরামর্শ কেহ শোনেন নাই। ফলে সামরিক বাহিনী সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি যে একেবারে হয় নাই তাহা নয়। বলা অনাবশ্যক যে, সেনাবাহিনী যে-কোন দেশের গর্ব ও গৌরবের বস্তু। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সহিত তাহারা জড়িত। দেশের ক্ষমতার ও দলীয় রাজনীতির সহিত তাহাদের জড়িত করা কোনক্রমেই উচিত নয়। ইহাতে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিই শুধু ক্ষুণ্ন হয় না-দেশ রক্ষার মত পবিত্র দায়িত্ববোধেরও অবমাননা করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তৃতীয় বিশ্বে যখনই কোন সমর সেনা ক্ষমতায় থাকিবার জন্য ক্ষমতা দখল করেন গণতন্ত্রের বুলিবচনে আকাশ-বাতাস ভরাইয়া তুলিলেও শেষ পর্যন্ত তাহারাই উর্দি খুলিয়া রাজনীতিতে নামেন এবং প্রকারান্তরে দেশের রাজনীতির সহিত সেনাবাহিনীর নাম জড়াইয়া ফেলেন। পদত্যাগকারী প্রেসিডেন্টের বেলাতেও এমনটি ঘটিয়াছে। যদিও বাহ্যত তিনি ছিলেন একটি দেশের প্রেসিডেন্ট ও একটি 'রাজনৈতিক দলের' চেয়ারম্যান কিন্তু কার্যতঃ তিনি হইয়া পড়িয়াছিলেন একজন সেনাপতি-শাসক। বিশেষ করিয়া কেন্টনমেন্টে থাকিয়া তিনি ইহাই সবাইকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সামরিক বাহিনী তাঁহার সরকারের সহিত আছে।

সবকিছুই তিনি গায়ের জোরে করিতে পারেন। বৃহত্তর জনসাধারণের নিকট কোন জবাবদিহির প্রয়োজন নাই। অবশ্য সামরিক হউক বা বেসামরিক হউক কোন স্বৈরশাসকের পক্ষেই শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। রক্তক্ষয়ী ও সুতীব্র গণআন্দোলনের মুখে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগ তাহাই প্রমাণ করে। ভবিষ্যতে আর কোন সামরিক বা বেসামরিক স্বৈরশাসক যাহাতে আর কোনদিন সেনাবাহিনীর মদদ না পায় এবং সেনানিবাসের সুসংরক্ষিত এলাকায় বসিয়া জনগণের উপর অপশাসন চালাইতে না পারে-এবারের এই গণঅভ্যুত্থানের মূল বক্তব্য সেটাই। কোন মহলের পক্ষেই এই বক্তব্যের মূল সুর না বুঝিবার কথা নয়।[১৯৩]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহুল প্রত্যাশিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর নির্বাচন প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। নির্বাচন প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ অবজারভার একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী নব্বই দিনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে সফল হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'As We See It'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> The revolutionary fervour that brought about Gen Ershad's downfall was tempered by an extraordinary call in all quarters for maintaining peace, neutrality, discipline and law and order. No doubt caution and circumspection are the order of the day in this highly fluid and uncertain period of transition.
>
> The natural anger of the people against the excesses of an autocratic regime has been manifested in diverse ways. The danger is ever present that in a period of volatility recourse may be taken to reprisals that will replicate the past cycle of excess and illegality. Due process of law must be strictly adhered to.
>
> Charges of corruption, bribery, misuse of power, misappropriation of funds and other illegal acts need to be investigated. There is often a tendency, however, to charge both guilty and innocent alike of having committed gross irregularities on purely subjective grounds. In recent days there has been a proliferation of allegations, some of which may be genuine, and others speculative. Many emanate from anonymous sources.

This sprial of charges has set in motion a self-feeding chain reaction. It is not possible to prove or to deny the charges or confront the truth by condemning everybody or condoning all. If any illegalities have been committed a proper process of enquiry should be initiated and pursued to a logical and just conclusion.

Passing judgment may not fall within the purview of the responsibilities of the interim government. This would place too great an onus on their already difficult mandate to pave the path to free and fair elections. It would give rise to expectations not in their power to resolve and dilute and divert from their real purpose. All that the transition government can do is to set up proper mechanisms for enquiry, judicial or administrative, in accordance with existing laws.

We are of the opinion that the task of the caretaker government in so far as the administration is concerned is a "holding" operation to deal with day to day exigencies including implementation of matters duly adjudicated and decided upon by the courts of the land. It must keep a strict watch on channelling allegations of corruption or specific charges of nonperformance of duties along ordered lines for subsequent follow-through by the duly elected government.

We also believe that the Advisers must strictly contain their functions to the portfolios allocated to them, check further deterioration in the efficiency of their respective Ministries and advise the government how to meet immediate abuses of power.

The operative words governing the mandate of the interim government are "caretaker', "neutrality" and "fairness". We think, therefore, that its pre-eminent function must remain that of seeing that elections are held within the appointed time of 90 days in a peaceful, free and fair manner in accordance with the laws and provisions of the Constitution.[১৯৪]

১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলা একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে নির্বাচন সফল করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো এবং সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে

সকল বাধা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। শিরোনাম ছিল: 'সংসদ নির্বাচনের তারিখ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> আগামী ২রা মার্চ বাংলাদেশের পঞ্চম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশ জুড়ে প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের ফলে স্বৈরশাসক এরশাদ পদত্যাগ করার আগে সংসদ বাতিল করতে বাধ্য হন। সংবিধান অনুযায়ী একটি সংসদ বাতিলের ৯০ দিনের মধ্যে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের সরকার সেই অনুযায়ী নতুন সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন।
>
> সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত এই ঘোষণাকে জাতি যে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা বিগত গণঅভ্যুত্থানের প্রধান দুটি লক্ষ্যের একটি ছিল এরশাদ ও তার সরকারের পদত্যাগ এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংসদ গঠন করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম লক্ষ্যটি অর্জিত হয়েছে। ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছেন এরশাদ। দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্জনের পটভূমিও রচিত হয়েছে। এখন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে। সমাধি রচিত হবে স্বৈরতন্ত্রের, প্রতিষ্ঠিত হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। গোটা জাতি আজ তাই সেই শুভদিনের জন্য উন্মুখ।
>
> কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা জাতির সামনে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবেও দেখা দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দায়িত্বভার নেবার সময়ই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ওয়াদা করেছেন এবং নির্বাচন সফল করে তোলার জন্য দেশবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন। নির্বাচনের জন্য যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রয়োজন, প্রয়োজন যে শান্তিপূর্ণ অবস্থার তিনি তার উল্লেখ করে দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির এবং আইন ও শৃংখলার প্রতি প্রতিটি নাগরিকের আনুগত্য বিধানের আশ্বাস জানিয়েছেন। গণতন্ত্রে উত্তরণের এই প্রক্রিয়ায় সংযম ও পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
>
> একই কথা বলেছেন ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, ৭ দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া। সাত দলের পক্ষ থেকেও আইন ও শৃংখলা রক্ষা এবং সংযমের কথা বলা হয়েছে। নির্বাচনকে মসৃণভাবে পরিচালনার জন্য দেশে যে শান্তি ও শৃংখলা অনিবার্য, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে কারো মনেই সন্দেহের অবকাশ নেই। আর দেশে যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আগামী নির্বাচন যে সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন করা প্রয়োজন, এ প্রশ্নে সবাই একমত হবেন। আমরা সবাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একটি জোরজবরদস্তিবিহীন ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক কাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রাপ্ত সুযোগটিকে কাজে লাগাতে চাই।

কোনভাবেই এই সুযোগটিকে কাজে লাগাতে চাই। কোনভাবেই এই সুযোগটিকে হেলায় হারাতে পারি না। তাই পরিকল্পিত নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটতে পারে এমন কোন কিছুই আমরা করতে পারি না, হতে দিতে পারি না। এটা এখন আমাদের একটি জাতীয় কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। এই কর্তব্য আমাদের পালন করতে হবে গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে। আমাদের প্রত্যেককেই হতে হবে সংযমী; পরমতের প্রতি হতে হবে শ্রদ্ধাশীল। সর্বপ্রকার উত্তেজনা ও বিদ্বেষবিষ সৃষ্টি হতে বিরত থাকতে হবে। একথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, গণতন্ত্রে উত্তরণের এই চ্যালেঞ্জ আমরা সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করতে পারি কঠোর আত্মসংযম ও পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখনো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। আইন-শৃংখলা যথাযথভাবে রক্ষা করতে না পারলে সেই ষড়যন্ত্রীরাই লাভবান হবে এবং গণতন্ত্রের জন্য ছাত্রজনতা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের সবাইকে আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে সফল করে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথের সকল অন্তরায় দূর করতে হবে।[১৯৫]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলা আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে নির্বাচনের ব্যাপারে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। শিরোনাম ছিল: 'অবাধ নির্বাচন'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ পুনরায় ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের মুখ্য দায়িত্ব হচ্ছে একটি সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংসদ গঠনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। সরকারের এই দায়িত্ব নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। সাম্প্রতিক গণআন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী তিন জোট প্রদত্ত এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক সমর্থিত যে রূপরেখার ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পন্ন হয় তারও মূল কথা হচ্ছে এই নির্বাচন। সে অনুযায়ী তিন জোট ও সকল রাজনৈতিক কর্মী এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর জোর দিয়ে আসছেন এবং অন্তর্বর্তী সরকারও নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে এই প্রধান দায়িত্ব পালনের কাজে হাত দিয়েছেন। যার ফলে এরই মধ্যে দেশে নির্বাচনী হাওয়াও বইতে শুরু করেছে।

সবকিছু সত্ত্বেও সরকারের এই প্রধান দায়িত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। প্রধানত একটি স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর সাধারণ মানুষের আবেগ যেমন

উচ্ছলিত হয় তেমনি তাদের প্রত্যাশাও আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে। সহজভাবেই আমরা আশা করতে শুরু করি জনসাধারণের আস্থাভাজন সরকারের হাতে সকল অপূর্ণ প্রত্যাশার পূরণ ঘটবে, দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত আবর্জনা অপসারিত হবে রাতারাতি। প্রত্যাশার পরিপূরণ যতই কাম্য হোক বাস্তব কারণেই তা ঘটার নয়। সকল স্তরে ধৈর্য আর সহনশীলতা তাই অপরিহার্য। এই ধৈর্য আর সহনশীলতা বিস্তারের জন্যে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব আর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অন্তর্বর্তী সরকারের উপর মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশার বোঝা চাপালে কেবল যে মূল দায়িত্ব পালনই বিঘ্নিত হবে তাই নয়, হতাশা বিস্তারের মত পরিবেশও দেখা দিতে পারে। যা অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের লক্ষ্যকেও বানচাল করতে পারে।

রূপরেখা অনুযায়ী মুখ্য দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপের অর্থ অবশ্যি এই নয় যে, অন্তর্বর্তী সরকার আর কিছুই করবেন না। আদতে একটি দায়িত্বশীল সরকারের করণীয় প্রতিটি কাজই এ সরকারকে চালিয়ে যেতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের তৎপরতার দিকে নজর ফেরালেই দেখা যাবে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন ও তাঁর সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর জোর দিলেও কোনো দায়িত্বই এড়িয়ে যাচ্ছেন না। প্রয়োজনীয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব প্রদান, তাই দায়িত্ব এড়ানোর কৌশল নয়– অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ মাত্র। আমরা বিশ্বাস করি সরকারের এই অবস্থান সম্পর্কে জনগণ সচেতন থাকলে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে মুখ্য দায়িত্বসহ সকল করণীয় সুচারুরূপে সম্পাদনের মাধ্যমে জাতির গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিশ্চিত করা সহজতর হবে।[১৯৬]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সম্মতি ও সহযোগিতায় যথাযথ নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়। সম্পদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'চাই নির্বাচনী আচরণবিধি'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

কেয়ার টেকার গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে। যথা ১০ই জানুয়ারী মনোনয়নপত্র দাখিল, ১২ই জানুয়ারী বাছাই, ২১শে জানুয়ারী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন এবং ২রা মার্চ ৯১ ইং তারিখে ভোট গ্রহণ। বস্তুতঃ দেশবাসী এক উত্তাল আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটাইয়া বর্তমান সরকারকে অস্থায়ী ভিত্তিতে ক্ষমতার আসনে বসাইয়াছে একটিমাত্র

উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আর তাহা হইতেছে দেশে যেন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রধান বিচারপতি দিয়া অস্থায়ী সরকার গঠন হইয়াছে নির্বাচনে সরকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের নিরপেক্ষতাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। এই পর্যায়ে গুরুত্বের সহিত দেখা দরকার. আইন-শৃংখলা অবস্থার উন্নতি বিধানে এরশাদ সরকারের সময়ে এক শ্রেণীর লোক যে বিপুল অর্থশক্তি ও অস্ত্রশক্তির অধিকারী হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে বর্তমান সরকার কি কি পদক্ষেপ নিতেছেন। ইতিপূর্বে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্র জমা দেওয়ার যে আহ্বান সরকার জানাইয়াছেন, উহাতে কি ধরনের সাড়া মিলিতেছে, তাহাও দেশবাসীর জানা দরকার। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থেই যে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার একান্ত আবশ্যক সেকথা আমরা গোড়া হইতেই বলিয়া আসিতেছি। অর্থাৎ ঘোষণা অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের বিষয়টাই মুখ্য এবং এ বিষয়টাকে সকল রকম বিতর্কের উর্ধ্বে রাখিয়াই সংশ্লিষ্ট সকলকে আগাইয়া যাইতে হইবে।

এই পটভূমিকায় আমরা আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিতে চাই। অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানি, কেবল আইন কিংবা বিধানই শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট নয়। পুরা ব্যাপারটা বহুলাংশে নির্ভর করিবে যেসব জোট ও দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবে তাহাদের আচার-আচরণের উপর। এই প্রেক্ষাপটে আমরা রাজনৈতিক দলসমূহের দ্বারা, দলসমূহের জন্য একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোড অব কণ্ডাক্ট বা আচরণবিধি প্রণয়নের উপরে গুরুত্ব আরোপ করিতেছি।

লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, ইতিমধ্যে নির্বাচনের ব্যাপারে প্রায় সর্বমহলে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। নির্ভেজাল গণতন্ত্রের প্রতি এবারের আন্দোলনের যে কমিটমেন্ট, এই উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যেও তাহার প্রতিফলন অবশ্যই ঘটাইতে হইবে। এই জন্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাজনৈতিক জোট ও দলের সমঝোতার ভিত্তিতেই এই নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণীত, গৃহীত ও পালিত হওয়া আবশ্যক। অতীতে আমরা দেখিয়াছি, পেশীশক্তির পাঁয়তারা, অস্ত্রশক্তির দৌরাত্ম্য, ভোট ডাকাতি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোটার হাইজ্যাক- এমনকি খুন-জখম পর্যন্ত গড়াইয়াছে। এভাবেই গোটা রাজনৈতিক অঙ্গন যেমন কলুষিত হইয়াছে, তেমনি নির্বাচনও পরিণত হইয়াছে প্রহসনে ; গণতন্ত্রের নামে বন-তন্ত্র শেকড় গাড়িবার মওকা পাইয়াছে। নির্বাচনের নামে অবৈধ টাকার ছড়াছড়ি দেখা গিয়াছে। সৎ এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে পাইতে হইলে নির্বাচনে টাকার খেলা অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে।

বলিতে গেলে এবারের আন্দোলনে বহুজনের রক্তে, ত্যাগে ও তিতিক্ষায় আমরা সর্বনাশা ধ্বংসের পথ হইতে পরিত্রাণের পন্থা খুঁজিয়া পাইয়াছি। আন্দোলনের শহীদদের এই রক্ত ও ত্যাগ বৃথা হইবে যদি ঘুরিয়া-ফিরিয়া এবারের এই নির্বাচনেও পূর্বেকার সেই সব কেলেঙ্কারির পুনরাবৃত্তি ঘটে। একারণেই আমরা চাই এমন এক নির্বাচনী আচরণবিধি--যাহা প্রণীত হইবে সকলের সমর্থনক্রমে, যাহা গৃহীত হইবে সর্বমহলের সম্মতিক্রমে এবং যাহা বর্ণে বর্ণে পালিত হইবে সকলের দ্বারা। একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক জোট বা দলের পক্ষ হইতে এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তরফ হইতেও উদ্যোগ গৃহীত হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। সংশ্লিষ্ট সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুভব করিয়া সেই লক্ষ্যেই আগাইয়া আসিবেন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অশুভ শক্তিসমূহকে প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণীত হইলে সকলের প্রচেষ্টায় আমরা আসন্ন নির্বাচনে গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারিব।[১৯৭]

স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন ও নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে অনেক মানুষ শহিদ হয়। আহতও হন অনেকে। এই শহিদ ও আহত পরিবার-পরিজনকে সাহায্যের জন্য সপ্রণোদিত হয়ে উদ্যোগ নেওয়ার খবর সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। এমন উদ্যোগের প্রশংসা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্র। ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর সংবাদ এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয়, এমন উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত হবে। আরও প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এ ধরনের উদ্যোগে এগিয়ে আসবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'প্রশংসনীয় উদ্যোগ'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

রূপালী ব্যাংক এবং বিসিআইসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁরা একদিনের বেতনের সমপরিমাণ টাকা দান করবেন স্বৈরাচারবিরোধী সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য।

এর আগে দেশের প্রকৌশলীরাও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন বা আহত হয়েছেন তাদের পরিজনের জন্য সকল প্রকৌশলীর একদিনের বেতন বা উপার্জন আর্থিক সহায়তা হিসেবে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের এক ঘোষণায় আরও জানানো হয় যে, স্বৈরাচারী সরকারের স্বেচ্ছাচার ও লুটপাটের ফলে উন্নয়ন ও উৎপাদনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা মুছে ফেলার লক্ষ্যে দেশের প্রকৌশলীরা প্রতিদিন কমপক্ষে ২ ঘণ্টা অতিরিক্ত শ্রমদান করবেন।

জনে জনে ব্যক্তি পর্যায়ে ত্যাগের এই মহান উদ্যোগ গণঅভ্যুত্থানের বিজয়কে আরও মহিমান্বিত করবে। আমরা একে স্বাগত জানাই।

যে জাতি স্বৈরাচার হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভীকভাবে জীবন দিতে জানে, সে জাতি আত্মদানকারী শহীদের মর্যাদা দিতেও জানে। এ মর্যাদা দান শুধু ফলক উন্মোচন বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শহীদ ও আহতদের বিপর্যস্ত পরিবারবর্গকে সম্ভবমত সবরকম বাস্তব সহায়তাদানের বিষয়টিও এতে রয়েছে। কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রকৌশলীদের সাম্প্রতিক উদ্যোগটি এদিক থেকেও বিচার্য।

সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানে নিহতের সংখ্যা প্রায় শত এর কাছাকাছি। আহত কয়েক হাজার। বিগত নয় বছরে স্বৈরাচারের বুলেট বেয়োনেটে প্রাণ দিয়েছেন আরও অগণিত ব্যক্তি। আহত হয়ে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন অনেকে। অবশেষে রক্তঝরা আন্দোলনে স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে। আজকের বিজয়ী গণঅভ্যুত্থান শত শহীদের রক্তের কাছে ঋণী। এখন আমাদের সে ঋণ শোধের পালা।

স্বৈরাচারের পতনের পর এখন সর্বপর্যায়ে গণতন্ত্রকে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার কর্তব্য আমাদের সামনে এসেছে। এ কর্তব্য দেশবাসীর কাছে দাবী করে সর্বোচ্চ দেশপ্রেম, যার যার কর্মক্ষেত্রে স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলা ও কর্তব্যপরায়ণতা। স্বৈরশাসনের দেয়াল ধসে পড়েছে। বৈরী শাসকদের কাছে প্রত্যাখ্যাত অনেক ন্যায্য দাবী-দাওয়া, পাওনা এখন আদায়ের প্রশ্ন হয়তো আছে। কিন্তু এখন সময় চাওয়ার বা পাবার নয়। এখনও সময় 'দেবার'। সেটা রক্তের রূপে না হলেও শ্রমের এবং ঘামের রূপে। এই চেতনা রক্তস্নাত গণঅভ্যুত্থান থেকেই উৎসারিত। কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রকৌশলীদের সাম্প্রতিক উদ্যোগ এ চেতনারই প্রতিধ্বনি।

এ উদ্যোগের সাথে আরও শতধারা মিলিত হবে– এটা দেশবাসীর প্রত্যাশা। একইভাবে অন্যান্য পেশা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের বেতন বা আয় দান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায়। এ রকম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যোগ আমাদের দেশে জনচেতনা ও একাত্মতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।[১৯৮]

উপসম্পাদকীয় ও নিবন্ধঃ

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে গণঅভ্যুত্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি নিয়ে বেশ কিছু উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। বেশির ভাগ উপসম্পাদকীয়তেই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় এই ধরনের একটি উপসম্পাদকীয়

প্রকাশিত হয়। উপসম্পাদকীয়তে ভবিষ্যত রাষ্ট্রনায়কদের গণঅভ্যুত্থানে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তি সম্পর্কে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং মন্তব্য করা হয় যে, রাষ্ট্র ক্ষমতাসীন হয়ে অনেকে সাধারণ মানুষের এই অমিত শক্তির কথা মাঝে মাঝেই ভুলে যান। প্রকৃতপক্ষে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণই ইতিহাসের নিয়ন্তা। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান এই কথাই আবার নতুন করে প্রমাণ করল। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'সেই সাধারণ মানুষ'। এতে লেখা হয়:

> গত কয়েক দিন ঢাকা নগরী প্রত্যক্ষ করেছে উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত, প্রতিবাদী এবং আপোসহীন জনতার রূপ। জনতা–এই একটি শব্দের মধ্যে কখনও কখনও চাপা পড়ে থাকে সাধারণ মানুষের শক্তি। কখনও কখনও আবার এই জনতা শব্দটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের অবিস্মরণীয় রূপ।
>
> নিতান্ত সাধারণ মানুষ আমরা। দিন আনি দিন খাই। জীবিকার ধান্ধায় থাকি। এই শহরের পথ ধরে মাথা নিচু করে চলি। দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারের নানা ভাবনা হৃদয়কে গ্রাস করে থাকে। সাধারণ মানুষকে আলাদা করে চেনা যায় না। পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার জন্যে তৈরি হয়নি সাধারণ মানুষের মুখ। টেলিভিশন ক্যামেরার লংশটে সাধারণ মানুষ জনতা মাত্র।
>
> তারা সভায় আসে। কখনও করতালি দেয়। কখনও ক্ষুব্ধ হয়, কখনও দাবিতে সোচ্চার হয়। আবার সভাস্থল ছেড়ে চলে যায়। তারা মিছিলে নামে। সবাই মিছিলের দৈর্ঘ্য মাপে। সংখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষের পরিচয়। কিন্তু এ সাধারণ মানুষ কি অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। কি অমিত শক্তিধর এই সাধারণ মানুষ, মুখচ্ছবিহীন মানুষের মিছিল কি অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য, তার প্রমাণ আবারও পাওয়া গেল গত কয়েক দিনের ঢাকা নগরীতে। জরুরী অবস্থা ছিল। কারফিউ ছিল, বিধি-নিষেধ ছিল, লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাস ছিল। জীবনের ভয় ছিল। মৃত্যুর আশংকা ছিল। কিন্তু সারা ঢাকা নগরী জুড়ে সাধারণ মানুষ ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে প্রাণের হিসাব-নিকাশ না রেখে অত্যাশ্চর্য এক ইতিহাস রচনা করল।
>
> জরুরী অবস্থা জারির পরদিন যাত্রাবাড়ী থেকে শুরু করে উত্তরা, মীরপুর থেকে শুরু করে মতিঝিল, সদরঘাট থেকে শুরু করে রামপুরা, ধানমন্ডি থেকে শুরু করে কমলাপুর, ফকিরাপুল থেকে শুরু করে শাহজাহানপুর– সারা শহর জুড়ে দলে দলে বেরিয়ে এল প্রতিবাদী সাধারণ মানুষ। যারা জীবিকার সন্ধানে উদ্যত, যারা সংসারের হিসাব মিলাতে গিয়ে পরাভূত, যারা শিশুর অন্ন সংস্থান করতে পারে না, যাদের সংসারে নিত্যদিন অনটন লেগে থাকে, যারা সন্ধ্যায় প্লাস্টিকের ব্যাগে

করে সামান্য বাজার নিয়ে সংসারের মধ্যে ফিরে যায়, সেই সাধারণ মানুষ অমিত তেজপুরুষরূপে, হিমালয়ের মত অভ্র-ভেদী হয়ে, সিংহের মত সাহসী হয়ে নিষ্পেষণকারী রাষ্ট্রযন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্যায়কে পরাভূত করে দিল। যে প্রবল রাষ্ট্রযন্ত্রের সামনে, প্রশাসনিক দম্ভের সামনে, আইন কানুনের মার প্যাঁচের সামনে সাধারণ মানুষকে নিতান্ত অসহায় বলে মনে হয়, থানা পুলিশে যে সাধারণ মানুষের খুব ভয়-ভীতি সেই সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে এই নগরী দখল করে নিল। রাজপথ সয়লাব করে দিল।

জীবন দিল। আহত হল। কিন্তু পরাভূত হল না। প্রবল রাষ্ট্রযন্ত্রকে হার মানিয়ে দিল। মুখচ্ছবিহীন মানুষের মুখ অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ইতিহাসের ক্যানভাসে ফুটে উঠল বীর জনতার ছবি। কেউ বয়সে ছোট, কেউ বড়, কেউ ক্ষীণকায়, কেউ স্থূলকায়, কেউ ক্ষুব্ধ, কেউ নমনীয়, কেউ হিসাবী, কেউ বেপরোয়া। সব মিলিয়ে একটাই মুখ সাধারণ মানুষ।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করেছেন এই খবর জেনে ঢাকা নগরীর সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে পড়েছেন রাজপথে। কেউ মিছিল করেছেন, কেউ রাজপথে ব্যারিকেড রচনা করেছেন। কেউ সাইনবোর্ড- ছবি টেনে নামিয়েছেন। স্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছে নগরী মধ্যরাতে। কেউ রাজপথে নেচেছেন, হাততালি দিয়েছেন। উল্লাস প্রকাশ করেছেন। কেউ বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। আবার কেউ সংযত হয়েছেন। অন্যকে সংযত করেছেন। গত চার তারিখ রাতে ঢাকা নগরী আন্দোলনের নগরী, উৎসবের নগরী, প্রতিরোধের নগরী, প্রতিশোধের নগরী, মিছিলের নগরী, উল্লাসের নগরীতে পরিণত হয়েছিল। ঢাকা নগরীতে তখন সাধারণ মানুষকে ঠিক চেনা গেছে।

রাষ্ট্রযন্ত্র বা ক্ষমতাসীন মানুষের অসুবিধা হচ্ছে তারা সাধারণ মানুষের এই অমিত শক্তির কথা মাঝে মাঝেই ভুলে যান। যে মানুষটি হাতে সামান্য একটি পোঁটলা নিয়ে পরাভূতরূপে স্ত্রী-পুত্র পরিজনের কাছে ফিরে যায়, সেই যে একদিন অপরাজেয় হয়ে উঠতে পারে সে কথা অনেক সময় কারও মনে থাকে না। 'ওরা চিরকাল টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল/ ওরা কাজ করে দেশে দেশান্তরে গুরু গুরু গর্জন/গুনগুন স্বর/ দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি। দিন যাত্রা করিছে মুখর/ দুঃখ সুখ দিবস রজনী/ মন্ত্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহা মন্ত্রধ্বনি/শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শীর্ষ পরে ওরা কাজ করে।'

'রক্তমাখা অস্ত্র হাতে রক্ত যত আখি। শিশু পাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি/ ওরা কাজ করে নগরে বন্দরে।' ওদের সব সময় চেনা যায় না। কিন্তু ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে ওরা সব কিছু বদলে দেয়। ওরা যারা কাজ করে সেই অসাধারণ মানুষ।

গত বছর পূর্ব ইউরোপে দেখা গেছে এই অভূতপূর্ব গণবিস্ফোরণ। রাজপথে যখন জনতার ঢল নামে তখন সব হিসাব ভণ্ডুল হয়ে যায়। জনগণ ক্ষমতার উৎস। জনগণই ইতিহাসের নিয়ন্তা। ঢাকায় গত কয়েক দিনের ঘটনা সে কথাই আবার নতুন করে প্রমাণ করল।[১৯৯]

১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে সরকার ও সাংবাদিকদের করণীয় সম্পর্কে আরেকটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। উপসম্পাদকীয়তে গণতন্ত্রকে সফল করা ও সচল রাখার স্বার্থে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত ও রক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়। এই লক্ষ্যে সরকারকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পরিপন্থি সকল কালাকানুন বাতিল করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। একইসঙ্গে সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। 'সমদর্শী' ছদ্মনামে লেখা এই উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'। এতে লেখা হয়:

গত ২৭শে নবেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত দিনগুলিতে জাতির উপর দিয়ে একটি বড় ঝড় বয়ে গেছে। এই সময়ে জরুরী অবস্থা আর সান্ধ্য আইনের শৃংখলে জনসাধারণকে বন্দী করে রাখার চেষ্টা চলেছিল। কঠোরতম সেন্সর ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছিল খবরা-খবর জানার অধিকার থেকে। জরুরী অবস্থায় ঐ সাতটি দিনে-এ দেশের মানুষ নানা রকম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। তাদের উপর চলেছে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও গুলি। সারাদেশে অর্ধশতেরও বেশী মানুষ মারা গেছে, আহত হয়েছে অসংখ্য লোক। তবে যে দুর্ভোগটি সবচেয়ে বড় ১৩ দুঃসহ ছিল, তা হল তথ্যবঞ্চনা। দেশে কী ঘটছে, বিরোধী দলগুলির কর্মসূচী, হরতাল অবরোধ আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য তাদের কান পেতে থাকতে হত বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার খবরের জন্য। এ এক অসহনীয় ও লজ্জাজনক তথ্য পরনির্ভরশীলতা।

ঐতিহাসিক কারণেই আমাদের দেশ গরীব ও অনগ্রসর। ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার, পুঁজি-প্রযুক্তির অভাব, ভ্রান্তনীতি, ব্যাপক দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রেই আমরা পরনির্ভরশীল। পুঁজি, আধুনিক প্রযুক্তি, খাদ্য, এমনকি অনেক তুচ্ছ ভোগ্যপণ্যের জন্যও আমরা পরমুখাপেক্ষী। বিদেশ থেকে টাকাকড়ি পেলেই উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ হয়, যন্ত্রপাতি এলে কল-কারখানা স্থাপিত হয়, এবং উৎপাদনের চাকা ঘোরে। পিএল ৪৮০ কর্মসূচীর চাল-গম এলে অগণিত অনাহারীর উদরের অন্ন জোটে। পরনির্ভরশীলতা রয়েছে আরও অনেক ক্ষেত্রে। সবগুলির কথা বলতে গেলে ফিরিস্তি অনেক লম্বা হবে।

জাতির একাত্তরের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা অর্জন। পরশাসনের শৃংখলমুক্তির পাশাপাশি আমরা চেয়েছি বুভুক্ষা, ব্যাধি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অনাশ্রয় ও অনগ্রসরতার অভিশাপ মোচন ও জাতির স্বতন্ত্র সংস্কৃতির বিকাশও ছিল একটি বড় অভীষ্ট উদ্দেশ্য। কারণ, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবসের পর দীর্ঘ দেড়যুগ পার হয়ে গেছে। আর সাত দিন পর বিশতম বিজয় দিবস। কিন্তু হিসাবের খাতা মিলাতে বসলে দেখা যাবে যে, একটি জাতীয় পতাকা আর একটি মানচিত্র ছাড়া খুব বেশী কিছু পায়নি এদেশের জনগণ। পরশাসনের কৃষ্ণ পক্ষে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে পরশাসক দেশের উপর নির্ভরশীল থাকলেও, বহু ব্যাপারেই ছিল আত্মনির্ভরশীল। আর আজ স্বাধীনতার শুক্লপক্ষেও পরনির্ভরতার পরিধি অনেক বেড়েছে, এমনকি নিজ দেশের তথ্যাদির জন্যও তারা পরনির্ভরশীল। বিবিসি, ভোয়ার খবর শুনে তাদের খবর জানার ক্ষুধা মেটাতে এবং দিনের কর্তব্য ঠিক করতে হয়েছে।

স্বাধীনতা শব্দটি আজকাল যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা সভ্যতারই সোনার ফসল। সভ্যতা মানুষকে একদিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপহার দিয়েছে, অন্য দিকে তেমনি নিশ্চিত করেছে বিভিন্ন ব্যক্তি- স্বাধীনতাও। এসব ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার খবরাখবর জানার অধিকার এগুলির অন্যতম। তবে এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই যে, 'লিবার্টি লাইসেন্স' নয়। সবকিছু জানার অধিকার কিন্তু সকল মানুষের নেই। 'ক্লাসিফাইড' বিষয়াদি-যেমন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সামরিক বিষয়াদি দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থেই গোপন রাখা হয়। এগুলি ছাড়া অন্য সবকিছুই জানার অধিকার রয়েছে নাগরিকদের। জাতিসংঘ সনদেও এই অধিকার স্বীকৃত। প্রায় সকল দেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অঙ্গ হিসাবে এই অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে।

তথ্য তথা 'ফ্রীডম অব স্পীচ' ও 'ফ্রীডম অব ইনফরমেশন', সভ্যতা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অঙ্গীকার হলেও গুটি কয়েক দেশ ছাড়া বাকি সব দেশেই তা মাত্রাভেদে খর্বিত ও খণ্ডিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা অনেকখানি নিরংকুশ। নিক্সন নিষ্ক্রমণের ঘটনায় এর সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ওয়াটারগেইট কেলেংকারি সম্পর্কে দুজন সাংবাদিকের অনুসন্ধানী রিপোর্ট সেদেশের মহা পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। মার্কিন সংবিধানে সংবাদ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার গ্যারান্টি রয়েছে বলেই সেদেশের সংবাদপত্রসমূহ ও সাংবাদিকগণ সাহসিকতার সঙ্গে তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যেতে পারছেন।

সংবাদপত্রে স্বাধীনতা সম্পর্কে বছর দুয়েক আগেও সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে বিশেষ বক্তব্য ছিল। বলা হত, সেসব দেশে পার্টির কর্ণধারগণ সর্বজনের হয়ে সর্বজনের কল্যাণে শাসনসহ সকল কাজ করে। সুতরাং ভিন্নমত বা বিরোধিতার প্রশ্নই ওঠে না। আসলে বাস্তব ব্যাপারটি যে তা নয়, তা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। শত বিধিনিষেধের মধ্যেও নিয়ন্ত্রিত সংবাদ সম্পর্কে সেসব দেশে ভিন্নমত ও বিক্ষোভ দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেব গ্লাসনস্ত অর্থাৎ খোলা নীতি ঘোষণার পর গোটা পূর্ব ইউরোপে সেই বিক্ষোভের ব্যাপক প্রকাশ ঘটে। পরিণতিতে যুগান্তর। সেই দেশগুলিতে -অবসান ঘটে কম্যুনিস্ট পার্টির একদলীয় শাসন।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেশগুলিতে সংবাদ নানা নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাঁধা। রেডিও-টেলিভিশনের উপর সরকারের একক কর্তৃত্ব। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও আধা নিয়ন্ত্রিত। এসব দেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অংশ হিসাবে সংবাদ প্রকাশ জানার স্বাধীনতারও স্বীকৃতি রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে নিয়ন্ত্রণের বিধানও। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার অনুসারেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেয়া হয়। যতটা বিরোধিতা ও ভিন্নমত সরকার সহ্য করতে পারেন, ঠিক ততটাই স্বাধীনতা দেন। সুতা কখনও শিথিল করেন, কখনও টেনে ধরেন কষে। কখনও কখনও নিয়ন্ত্রণ-নিস্পেশনের মাত্রা চরমে পৌঁছে। বিজ্ঞাপন ও নিউজপ্রিন্টের কোটা কমে। মামলা হয়। নিষিদ্ধ করা হয় পত্রিকার প্রকাশনা। জামানত তলব, ডিক্লারেশন বাতিল এবং সাংবাদিকদের জেল-জরিমানাও হয়েছে কোন কোন দেশে। দলীয় কর্মী বা মস্তান-বাহিনীর মাধ্যমে পত্রিকা অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে আমাদের দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু কালাকানুন রয়েছে। প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশনস অর্ডিন্যান্স ১৩ স্পেশ্যাল পাওয়ার অ্যাক্ট, '৭৪ এগুলির মধ্যে অন্যতম। এই কালা-কানুনগুলির সাহায্যে সরকার বহুবার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দলননীতি চালিয়েছেন এবং রোধ করেছেন সংবাদপত্রের কণ্ঠ। গত নবেম্বরের শেষদিকে জারি করা গত জরুরী অবস্থাকালে সংবাদ প্রকাশে জঘন্যতম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা হয়েছিল। সংবাদ ও মতামত প্রেসে যাওয়ার আগেই নির্দিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাকে দিয়ে সেগুলি পাস করিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন সরকার। এর আগে 'টেলিফোন ব্রিফিং' ছিল প্রায় নিত্য ঘটনা।

দেশের সাংবাদিক সমাজ এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা এর আগেও সকল প্রকার কালাকানুন বাতিল এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। এবার তারাও তাদের তূণীরের শেষ তীরটি নিক্ষেপ করলেন। জরুরী

অবস্থা ঘোষণার সময় থেকে কাজ বন্ধ করে দিলেন। একটানা আটদিন চলল কর্ম বিরতি। তাদের এই সাহসী পদক্ষেপ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে বিরোধী জোটসমূহ তথা জনসাধারণ যে অসহযোগিতা আন্দোলন শুরু করেছিল তাতে নতুন গতি সঞ্চারিত করলেন সাংবাদিক সমাজ। সমাজের সকল স্তরের মানুষ যোগ দিলেন অসহযোগিতা আন্দোলনে। জনবিক্ষোভ প্রবল গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হল। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাধ্য হলেন পদত্যাগ, পার্লামেন্ট বাতিল এবং বিরোধী দলগুলির মনোনীত ব্যক্তিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করতে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এসব পদক্ষেপ অবলম্বিত হয়েছে।

সদ্য গণঅভ্যুত্থানের ফলে দেশে সুন্দর এক আগামীকালের শুভ সূচনা হয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার উদ্দেশ্য একটাই- পরিচ্ছন্ন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। বিরোধী- দলগুলি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন করেছে, স্বৈর সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের মনোনীত ব্যক্তিকে। তিনিও ঘোষণা করেছেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই হবে তার প্রধান কর্তব্য।

আমাদের আশা এবার দেশে জনগণের আরাধিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে, দ্রুত বিকাশ ঘটবে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার। গণতন্ত্রকে সফল করা ও সচল রাখার স্বার্থে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত ও রক্ষা করতে হবে।

দেশে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন সংবাদপত্রের বিকাশ অত্যাবশ্যক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সমাজকে যেমন তার ভূমিকা পালন করতে হবে তেমনি সাংবাদিকদেরও সচেষ্ট থাকতে হবে দায়িত্বশীল, গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতায়। তথ্যে আমাদের আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে হবে প্রতিটি গণসংযোগ মাধ্যমের।[২০০]

১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় গণঅভ্যুত্থানের পর আসন্ন নির্বাচনে করণীয় সম্পর্কে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। উপসম্পাদকীয়তে সকলের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। সালেহ চৌধুরী লিখিত এই উপসম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল: 'আমি এইবার ভোট দিমু'। এতে লেখা হয়:

> 'আমি এইবার ভোট দিমু।' বাক্যটিতে উদ্ধৃতি চিহ্ন যোগ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি এবার ভোট দেবো-এ উক্তির সঙ্গে মিশে আছে আমাদের সকলের আনন্দ আর আশা। কোন ব্যক্তির ইচ্ছা নয়, গোটা জাতির প্রত্যাশা জড়িয়ে আছে এর উক্ত-অনুক্ত সকল ব্যঞ্জনায়।

উদ্ধৃতি চিহ্নের প্রয়োগ নেহাত সত্যের দাবি মেটানো। আদতে গ্রীন রোড এলাকার একজন সাধারণ মানুষের উক্তি এটি। উক্তিটি কানে আসার পর থেকেই নিজেকে আলোড়িত বোধ করছি– একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা কত সহজেই প্রকাশের পথ করে নিতে পারে সাধারণ মানুষের কণ্ঠে।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একটা পুরনো স্মৃতি। বাষট্টি সালে আইয়ুব খান তার 'সাধের সংবিধান' জারি করলেন। পরদিন ভোরের কাগজে বেরিয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ– জনগণের মেধা আর সাধ্য সংক্রান্ত আইয়ুবীয় তত্ত্বসহ। আমি তখন লাহোরে। রোজকার মত সকালের চা খেতে গেছি রাস্তার পাশে গুলখানের দোকানে। সোয়াতী পাঠান গুলখান আমাদের হোস্টেলের পাশে চায়ের দোকান চালাতো। তার চায়ের কদর ছিল। তো দোকানে পৌঁছে দেখি গুলখান একগাদা খবরের কাগজ সামনে নিয়ে বসে আছে।

কি হল খান? আমার এ প্রশ্নের জবাবে সেই প্রায়-অশিক্ষিত পাঠান একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল- হোনা আউর কিয়া। হওয়ার আর কি আছে বলেই সে কথার ছেদ টানল না। বলল, এর আগে মালকা দা বুদ-এ যা কিছু ঘটত তাতে আমারও হিস্যা ছিল। চায়ে চিনি ঢালতে ঢালতে কান রাখতাম ওখানে। এখন থেকে আমি আর তার কেউ নই। এখন থেকে আমি কেবল চা-ওয়ালা। চায়ে চিনি ঢেলেই যাব, ঢেলেই যাব-। যাব, বলতে বলতে সে চা বানানোয় হাত লাগল।

'মালকা দা বুদ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সম্রাজ্ঞীর মূর্তি। লাহোরে অবস্থিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান আইন পরিষদের ভবনটির সামনে এককালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার একটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তার থেকেই ওই এলাকা এবং ভবনটি মালকা দা বুদ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

জনসাধারণের মেধা আর ক্ষমতা সংক্রান্ত স্বীয় ধারণার আলোকে আইয়ুব রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের অধিকার অস্বীকার করে- মৌলিক গণতন্ত্র নামক অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে।

তার জারি করা নয়া শাসনতন্ত্রেও সুকৌশলে ভোটাধিকার পর্যন্ত অস্বীকার করা হয়। গুল খানের কণ্ঠে সে নিয়েই আক্ষেপ ঝড়ে পড়েছিল।

এ মুহূর্তে তাকে আক্ষেপ বলতে দ্বিধা জাগছে। মনে হচ্ছে, ওকে বোধ হয় প্রতিবাদের সূচনা বলাই সঙ্গত। তবে সুস্পষ্ট আর জোরালো প্রতিবাদ ফেটে পড়তেও খুব একটা সময় লাগেনি। আর সেই তীব্র প্রতিবাদের মুখে এক সময় যে তাবৎ ধ্যান- ধারণা নিয়ে আইয়ুব খানকেই বিদায় নিতে হয় তাই নয়, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির সংজ্ঞাও পাল্টে যেতে বাধ্য হয়। ভোটের অধিকার রক্ষার জন্যেই বাংলাদেশ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ ধরতে বাধ্য হয়।

এই যে 'ভোটের অধিকার' এ কেবল ভোট দিতে পারাই নয়। এখানে ভোট কথাটি তাবৎ গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতীক। গ্রীন রোড এলাকার সেই নাম না জানা মানুষটি যখন বলেন, আমি এইবার ভোট দিমু, তার উচ্চারণের সঙ্গে ফুটে ওঠে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের প্রত্যয়। নব্বইর ডিসেম্বরের যাবতীয় আনন্দ-উল্লাস সকল অর্থেই এই একটি গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার স্বপ্নকে সামনে রেখে বাংলাদেশ মরণপণ সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। রক্তসাগর পাড়ি দিয়ে বিজয়ের সোনালী প্রভাতও ছিনিয়ে এনেছিল। কিন্তু সে বিজয়কে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। চক্রান্তের পর চক্রান্ত নানা বিভ্রান্তি আর বিপত্তি সৃষ্টি করে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ী জাতিকে স্বৈরশাসনের অবাঞ্ছিত নিগড়ে আবদ্ধ করে ফেলে। দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে জাতি আজ সে নিগড় ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। উন্মুক্ত হয়েছে হৃত অধিকার ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা। আজ তাই সকল মানুষের উল্লাস-- আমি এবার ভোট দেবো।

এই উক্তিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বক্তব্য- বিগত বছর গুলোতে বাংলাদেশে মানুষের ভোট দেয়ার অধিকার ছিল না। স্বৈরশাসনের প্রত্যক্ষ রূপ সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে কিংবা সামরিক শাসনের আওতায়ই দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের একাধিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভোটাধিকার বলতে কিছু যে ছিল না এ কথা প্রায় সর্বসম্মত। এই বৈপরীত্যের জট ছড়ানোর জন্যে এ কথাগুলো স্মরণে আনা প্রয়োজন যে, নীল নকশার নির্বাচনে ভোট কথা বলার সুযোগ পায় না। ভোট দেয়া না দেয়ায় তাই অধিকার প্রয়োগের সম্পর্ক থাকে না। তাছাড়া নীতিগতভাবে ভোটের অধিকার থাকলেও বাস্তবে ভোট দেয়ার কোনো সুযোগই থাকতো না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। স্বৈর শাসনের প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াই কার্যত সকল অধিকার হরণ করে নেয়। বক্তব্য পরিষ্কার করার জন্যে প্রক্রিয়াটির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন।

একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসেন। এই ক্ষমতা গ্রহণটিই গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের লংঘন– জনসাধারণের এবং সাধারণ আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। বিশেষ আইনের জায়েজ করিয়ে নেয়া সকল উদ্যোগ সত্ত্বেও ব্যাপারটা তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে বরাবরই গ্রহণের অযোগ্য থেকে গেছে।

এই ক্ষমতা গ্রহণের কারণ হিসেবে এরশাদ তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে তার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে সরকারের পদস্থ ব্যক্তিদের দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের হয়রানি, নির্যাতন, জেলজুলুম এমনকি শারীরিক নিগ্রহের শিকারে পরিণত করেন। এ অবস্থা পালটাতে অবশ্যি বিশেষ বিলম্ব ঘটেনি। নিজের আসন পোক্ত করার জন্যে তাকে এদেরই কোলে টেনে নিতে হয়। এরশাদ প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব কার্যত এদের উপরই বর্তায়। কথা

আর কাজের এই অসংগতি তার নিজের গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রশ্নের বিষয়ে পরিণত করে। উচ্চ মার্গের বোলচাল তাৎপর্য হারায়।

গুণ-অনীহা অবশ্যি তার অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কেননা মুখে জনগণের দোহাই দিলেও শক্তির জন্যে এরশাদ জনগণের উপর নির্ভর করেননি, তার শক্তির উৎস ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। হয়ত আইয়ুবের পরিণতি সামনে ছিল বলেই মুখে গণতন্ত্রের বুলি আর সময় সময় জাতীয় মঞ্চের নির্বাচনী পালার অভিনয় অবলম্বন করেন। এই সব 'ভোটে' ভোট দাতার অস্তিত্ব একান্তই অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। এরশাদ একটি রাজনৈতিক দলও চালু করেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতা তার দল থেকে শক্তি সংগ্রহ করেন। এ ক্ষেত্রে সম্পর্কটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। দলই শক্তি পেয়েছে এরশাদের কাছ থেকে। এই শক্তির ব্যবহারও ধরেছে উল্ট পথ। দেশ ও জনগণের কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণই হয়ে উঠেছে দলীয় কর্মীদের সূর্যের তাপে উত্তপ্ত বালির জ্বালার মত এইসব দলীয় নেতা ও কর্মীর দাপট দুর্বিষহ হয়ে দেখা দিয়েছে, দুর্নীতি ছড়িয়েছে সময়ের সকল সীমা। সব স্তরের মানুষ তাই নিজেদের ভোটাধিকার তথা গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিতই মনে করেছেন।

নব্বইর ডিসেম্বরে সংগ্রামী ছাত্র-জনতার জয় স্বৈরশাসনের একটি পর্যায়ের অবসান ঘটিয়েছে। এরশাদকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছে। জনগণের ইচ্ছানুযায়ী গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকার। এ সরকার একটি যথার্থ নিরপেক্ষ এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সশস্ত্র বাহিনীও গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করে এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনাকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। প্রতিটি মানুষ তাই উদ্দীপ্ত যে আমি এবার ভোট দেবো।

এই ভোট প্রদান বা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগকে নিরঙ্কুশ এবং স্থির নিশ্চিত করে তোলার উপরই নির্ভর করছে জাতীয় জীবনের গতিধারা। উল্লাসের পাশাপাশি আজ তাই সতর্কতাও অপরিহার্য। কেননা গণতন্ত্রের পথ কখনো শত্রুমুক্ত থাকে না। আমাদের তো নয়ই। আমরা তাই নেতৃত্বের কাছে সতর্কতা আর বলিষ্ঠতা আশা করি যাতে আমার ভোট দেয়ার ব্যাপারটা যেনো প্রহসনে পরিণত হওয়ার অবকাশ আর না পায়।[২০১]

১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর করণীয় সম্পর্কে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। উপসম্পাদকীয়তে স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে যে নজিরবিহীন ঐক্য তৈরি হয়েছিল তা ধরে রাখার আহ্বান

জানানো হয় এবং মন্তব্য করা হয় যে, গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে রাজনৈতিক দল ও জোটের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের ওপর। এই উপসম্পাদকীয়টিও লিখেন সালেহ চৌধুরী। শিরোনাম ছিল: 'আকাশে বাতাসে বিজয়ের সুর'। এতে লেখা হয়:

ঢাকার বাতাসে এখনো বিজয়ের সুর–মন জুড়ে উৎসবের রেশ। উপলক্ষ্য যখন গণমানুষের প্রত্যাশা আজ আবেগের সঙ্গে মিলে যায়, উদযাপন তখন আন্তরিকতা আর উচ্ছলতায় কোথায় পৌঁছায় তার প্রমাণ এই সপ্তাহের ঢাকা। ঢাকা ছিল এক কথায় উৎসব নগরী।

এ কেবল কেন্দ্রীয় আয়োজন সাতটি মঞ্চ, মানিক মিয়া এভিন্যুর বিশাল আয়োজন বিজয় মেলা কিংবা চারুকলা ইন্সটিটিউটসহ বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের বিজয় মিছিলই নয়, পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তোলা হয় অসংখ্য মঞ্চ আর সর্বত্রই সকল শ্রেণীর মানুষ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এ জাতির মহান বিজয়কে স্মরণ করে প্রকাশ করেন অনাবিল আনন্দ উল্লাস। বারো মাসে তেরো পার্বণের এ দেশে উৎসবের এমন রূপ এর আগে দেখা গেছে বলে আমাদের জানা নেই।

বিজয়কে ধরে রাখতে হলে তার স্মৃতিকে লালন করার প্রয়োজন আছে। আর এ প্রয়োজন মেটানোয় উৎসবের চেয়ে বড় বিকল্প কিছু হতে পারে না। বিজয়ের বিংশতি উদ্‌যাপনে আজ যারা অংশ নিচ্ছেন, তাদের অনেকেরই জানা নেই কি ছিল একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। উৎসব যদি কিছুটা ধারণাও স্পষ্ট করে তুলতে পারে, সে হবে এক বড় পাওয়া। নদীকে যেমন যতদূরেই এগিয়ে যাক গতি আর শক্তির জন্য উৎসের কাছেই বাঁধা থাকতে হয়, আমাদেরও তেমনি ফিরে যেতে হবে ষোলই ডিসেম্বরের কাছে।

একাত্তর থেকে নব্বই-এ এসে গণমানুষের বিজয় নতুন নতুন মাত্রা পেয়েছে। সব সংশয় আর সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে মানুষ তাই মুক্ত মন নিয়ে পথে নেমেছে বিজয়ের আনন্দে প্রাণ ভরে নিতে- বিজয়ের স্থপতিদের শ্রদ্ধা জানাতে। উৎসবের আনন্দের এমন অনাবিল প্রকাশই হতে পারে কল্যাণের পথে মহত্তম প্রেরণা।

বলছি তো ঢাকার উৎসবের কথা। তবে এ কেবল রাজধানী নগরী ঢাকারই উৎসব ছিল না। গোটা দেশই ছিল উৎসব মত্ত। আর এবারকার উদ্‌যাপনার ইতিহাস নিয়ে ভবিষ্যতে কেউ যদি ভাবতে বসেন, সম্ভবত রাজধানী নগরীর আয়োজনের পেছনে চট্টগ্রামের কিছু প্রেরণা তাকে মানতে হবে। উপযুক্ত মর্যাদা আর আয়োজনে বিজয় দিবস পালনের উদ্যোগ এক বছর আগেই চট্টগ্রামে নেয়া হয় বিজয় মেলার মাধ্যমে।

উৎসবের উল্লাস এখনো মন জুড়ে আছে। নব্বই-এ এসে একাত্তরকে নতুন করে অনুভব করতে পারার আনন্দে মন ভরে আছে। এখনো কানে

বাজে এখানে ওখানে শোনা তরুণদের উক্তি: 'একাত্তরকে আমরা দেখিনি, তবে এবার অনুভব করতে পারছি।' একটি জাতির আর্তি আর আবেগকে এভাবে প্রজন্মন্তরে পৌঁছে দিতে পারা সকল মাপেই একটি বড় কাজ। নব্বইর এই বিজয় উৎসবের উদ্যোক্তারা তাই ধন্যবাদার্হ। আমাদের কামনা একটাই, আনন্দের এই রেশ অক্ষয় হোক জীবনে।

বলছিলাম নব্বই একাত্তরের বিজয়ে নতুন মাত্রার সংযোগ ঘটিয়েছে। এই নতুন মাত্রাটা কি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। একাত্তরে আমরা বাইরের শত্রুকে হটানোর লক্ষ্যে রক্তসাগর পাড়ি দিয়েছিলাম। ছিনিয়ে এনেছিলাম ষোলই ডিসেম্বর- এ জাতির ইতিহাসের মহত্তম বিজয়। সে বিজয়কে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। শত্রু এসেছে ভিন্ন পথ আর রূপ ধরে। ঘরের শত্রু গণমানুষের প্রত্যাশাকে বানচাল করে জাতির উপর চাপিয়ে দেয় স্বৈরাচারের জগদ্দল। জনতার অমেয় শক্তি নব্বই- এ এসে সেই জগদ্দলকে উৎপাটিত করেছে- ঝেড়ে ফেলেছে। উন্মোচিত হয়েছে প্রত্যাশা পূরণের নতুন সম্ভাবনা। এ যেমন আনন্দের উপলক্ষ্য তেমনি সতর্ক আর বলিষ্ঠ পদক্ষেপেরও দাবিদার। এ মূহূর্তে তাই দায়িত্ব রয়েছে অসীম। এ দায়িত্বের কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

একাত্তর আর নব্বই উভয়ই মূল লক্ষ্যে অভিন্ন-গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উত্তরণ। একাত্তরের বিপুল বিজয়ের পরও মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুযোগমাত্র তৈরি করার উদ্দেশ্যে জাতিকে আবার দীর্ঘ শ্রম আর বিপুল রক্ত ঢালতে হয়েছে। এই একটি সত্যই প্রমাণ করে যে অসমাপ্ত দায়িত্ব কত কঠিন। তাই বিজয় যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, তাকে সফল করে তোলায় মন দেয়া প্রয়োজন রয়েছে।

এ পর্যন্ত অর্জিত বিজয় একটি আশা আর আস্থারই প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে– আমরা এবার ভোট দেবো বা ভোট দিতে পারবো। এটুকু সম্ভাবনা নিয়ে সংশয়েরও কিছু নেই।

ভোট নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে অস্থায়ী সরকার। সেই অস্থায়ী সরকারের প্রধান ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা আর নির্বাচনী কমিশন পুনর্গঠনের কাজও সম্পন্ন করেছেন।

নির্বাচনী কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাও সম্পন্ন হয়ে গেছে এরই মাঝে। সব দল আর জোট নির্বাচনী প্রস্তুতিও নিচ্ছে। তবে এটুকুই শেষ কথা নয়। কাজ আমাদের আরো আছে। আরো কাজের কথা ভাবতে হবে এখন থেকে।

পয়লাই ভাবতে হয়, কেমন হবে আসন্ন নির্বাচন? এ নির্বাচনকে অবাধ আর নিরপেক্ষ হতে হবে এ প্রশ্নে আমরা সকলেই ওয়াদাবদ্ধ। বস্তুত এই একটি ঐকমত্য থেকেই শক্তি পায় নব্বইর স্বৈরাচার হটানো আন্দোলন। এই ওয়াদার প্রতি কতটা আন্তরিক আমরা থাকতে পারি তারই উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ।

বলতে গেলে গোটা দুনিয়ার চোখই আজ আসন্ন এ নির্বাচনের প্রতি নিবদ্ধ। নির্বাচন যদি সত্যিকার অর্থেই অবাধ আর নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে, ভবিষ্যৎ নির্মাণের অনেক শ্রমেরই লাঘব ঘটবে। অস্থায়ী সরকারের উপর যে দায়িত্ব বর্তেছে তার বাস্তবায়ন ক্ষমতার সবটাই সরকারের এখতিয়ারে নেই, অনেকখানিই জনসাধারণ তথা রাজনৈতিক দল আর জোটের হাতে এ সত্যকে মেনে নিয়েই সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে।

ভিন্ন দল বা জোট মানেই ভিন্ন মত। মতের ভেদ পথেরও কারণ ঘটাতে পারে। আদতে সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করে তোলার জন্য সংশয়ের দিকগুলোও তলিয়ে দেখার দরকার। যে নজিরবিহীন ঐক্যের মাধ্যমে নেতৃত্ব স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনকে তার সফল পরিসমাপ্তিতে নিয়ে গেছেন, তার উপর আস্থা হারানোর কোনো কারণ এখনো ঘটেনি। আমরা তাই এ নেতৃত্বকে লক্ষ্যের প্রশ্নে দৃঢ়তর দেখার প্রত্যাশী।

বিষয়টি যেহেতু নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর প্রতিযোগিতা সেখানে অবশ্যম্ভাবী। আর কে না জানে প্রতিযোগিতা সাময়িক বিভ্রম আর বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে পটিয়সী। বিশেষ করে বিগত বছরগুলোতে নির্বাচনের নামে পেশীশক্তির ব্যবহার এদেশে একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়ে আছে। সাময়িক সাফল্যের মোহ যেন আমাদের আবার এই অশুভশক্তিকে প্রশ্রয় দিতে প্ররোচিত না করে, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার দরকার আছে। আমরা এবার ভোট দেবো, এ প্রত্যয়ে উল্লসিত জাতি যেনো ভোট শেষ হওয়ার পরও মুক্ত গলায় বলতে পারে, আমার ভোট দেয়াতে কোনো খাদ ছিল না।

এটুকু প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হলে বিগত আন্দোলনের ঐক্যকে ধরে রাখার প্রয়োজন আছে। গণতন্ত্রকামী আর দেশপ্রেমী সকল দল আর জোট নিশ্চয়ই এ নিয়ে ভাবছেন। বস্তুত এ ভাবনার উপরই নির্ভর করছে বিজয়ের স্থায়িত্ব। বাতাসে এখনো বিজয়ের সুর ভাসছে আর এই সুরের অনুরণন অক্ষয় হতে পারে জাতির জীবনে, সে কেবল সকলের সচেতন আর সম্মিলিত উদ্যোগে।[২০২]

১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় গণঅভ্যুত্থানের পর করণীয় সম্পর্কে আরেকটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। উপসম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, গণঅভ্যুত্থানে অর্জিত বিজয়ের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত পাকাপোক্ত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানানো হয়। এই উপসম্পাদকীয়টি লিখেন কণিকা মাহফুজ। শিরোনাম ছিল: 'একটা চমৎকার সময়'। এতে লেখা হয়:

> সময়টা এখন চমৎকার। মানুষের চোখে স্বপ্ন, মনে আশা। অনেক দিনের জমে ওঠা স্বপ্ন আর আশাগুলি এবার রংধনু হয়ে উঠতে চাইছে। গণতন্ত্র

হবে, কালা-কানুন সব বাতিল হবে, মানুষকে আর ভয়ে ভয়ে অন্যের মুখ চেয়ে চেয়ে কথা কইতে হবে না, শুধু কাউকে খুশি করার জন্য কিছু বলার ঐতিহ্যটা হয়ত এবার পালটে যাবে। আর? আরো আছে। মানুষের চেপে রাখা আশাগুলি এবার ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে আসছে হুড়মুড় করে। এবার জিনিস-পত্রের দাম কমবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিকঠাক চলবে আর সেখানে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে না। অভিভাবকদের আর বুঝি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। লাশ হয়ে ফেরার জন্য তো কোন বাপ-মা সন্তানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠায় না। আমাদের ছাত্ররা বীর। আমাদের দেশের সব বিজয় গৌরবের মূলে তারা। কিন্তু তাদের এই তারুণ্য আর বীরত্বকে অন্য কোন স্বার্থান্বেষী মহল ব্যবহার করবে এমন ঘটনা হয়ত আর ঘটবে না। হয়ত এই সব কিছুর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এইবার।

খুব নিশ্চিতভাবে জোর দিয়ে কথা বলার অভ্যাসটা আমরা কবে হারিয়ে ফেলেছি। তাই প্রায় সব বাক্যের সঙ্গে 'হয়ত' ব্যবহার করি। কোথাও বুঝি একটু সন্দেহ থেকেই যায়। আশাভঙ্গের বেদনা দিয়ে যার অভিজ্ঞতার ভিত রচিত হয়েছে, সে বেশী আশা করতে সংকোচ বোধ করতেই পারে। বঞ্চিত মানুষ ধীরে ধীরে তার অধিকার সম্পর্কিত বোধই হারিয়ে ফেলে। তবে এদেশের মাটিতে ছাত্র-জনতার একাধিক অভ্যুত্থান এদেশের মানুষের সচেতনতা প্রমাণ করেছে। রাজনৈতিক সচেতনতা। ছাত্রদের সচেতন হবারই কথা। তারা যে জনসংখ্যার শিক্ষিত অংশ। এই জন্যই মানুষকে গণতন্ত্র সম্পর্কে, তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য শিক্ষা বিস্তার করার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। একটু ভুল হল। আমাদের সমাজের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে আসে। তারপরে শিক্ষা। গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে চালু করতে চাইলে এই দুটি বিষয়কেই নিশ্চিত করতে হবে। ইংরেজ উপনিবেশের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন একজন ফরাসী পণ্ডিত বলেছিলেন, ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তার করতে গিয়েই ইংরাজরা ভুল করেছে। শিক্ষা আর মুক্তচিন্তার বিপদ সম্পর্কে ফরাসীরা ভালমতই ওয়াকিবহাল। মধ্যযুগের মানুষ তো যে যেভাবে আছে সেটাই মেনে নিত। সুখ-দুঃখকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে ধরে নিত– অদৃষ্ট আর ভাগ্যে তাদের বিশ্বাস ছিল অবিচল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিশ্বাসে চিড় ধরল। কয়েকজন জ্ঞানী আর মুক্তচিন্তার মানুষ এই বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দিলেন– ভলটেয়ার, রুশো, মন্টেসক্যু। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের চিন্তা তারা মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। ফরাসীরা উদ্দীপ্ত হল। ফরাসী বিপ্লব হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই এইসব ধ্যান-ধারণা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদের ভ্রূণ এই চিন্তাধারার মধ্যেই ছিল। তারপর অবশ্য অ্যাডাম স্মিথ এলেন, কার্ল মার্কস এলেন। তারা

সমাজ ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপরেখা আঁকলেন। পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হল এক পর্যায়ে। পৃথিবীর মানুষ ওই দুটি মতবাদকে কেন্দ্র করে প্রায় দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল বলা যায়।

পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র আসলে তো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। গণতন্ত্র আর একনায়কতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু পুঁজিবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রকে সম্পর্কিত করা হয় এবং সমাজতন্ত্রকে একনায়ক যদি নাও হয় তাহলেও একদলীয় রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই ধারণা যে একেবারে ভিত্তিহীন তাও বলা যাবে না। গণতন্ত্র মুক্তচিন্তার কথা বলে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কারো ওপর কিছু জোর করে চাপিয়ে দেবার সুযোগ নেই। কিন্তু সমাজতন্ত্রে কিছু জোরাজুরির ব্যাপার থাকতেও পারে। কারণ সমাজতন্ত্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিলুপ্তির কথা বলে। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন: History is the long and tragic story of the fact that privileged groups seldom give up their privileges voluntarily. Individuals may see the moral light and voluntarily give up their unjust posture, but groups are more immoral than individuals.

সেই শ্রেণীস্বার্থের কথা। এই শ্রেণীস্বার্থের বোধবুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একসময় সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক জবরদস্তির ওপর নির্ভর করা হয়েছিল। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোন নীতিগত বিরোধ আছে। তবে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চালু করার জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভূমিকা আছে। ব্যাস এইটুকু। কিন্তু পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র কোনটাই আর তার original form-এ চালু রাখা এখন হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কোন ডগমা দিয়ে এখন কাজ হবে না, মানুষ বাস্তবোপযোগী ব্যবস্থা চায়।

তবে গত কয়েক বছরের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পৃথিবীর মানুষ এখনো গণতন্ত্রকেই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। কথা বলার অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বহুদলীয় নির্বাচন এই সবই গণতন্ত্রের মূলকথা। হিটলারের অভ্যুদয়ের আগে গণতন্ত্রকে অনেকে জনতার শাসন বা সামাজিক সাম্যের সঙ্গে এক করে দেখতো। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ধারণায় পরিবর্তন আসে। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ মনোযোগী। বৃটিশ লেখক ও সাংবাদিক অরওয়েল গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন: To begin with, minorities have some power of making themselves heard. But more than this public opinion cannot be disregarded when it chooses to express itself. It may have to work in indirect ways, by strikes, demonstrations and letters to the newspapers, but it can and visibly does affect government policy.

গণতান্ত্রিক সরকার ভিন্নমত বিবেচনা করেন, সেই জন্য বহুদলীয় ব্যবস্থা, বিরোধী দলের অস্তিত্ব এবং প্রেস ফ্রিডমের প্রয়োজনীয়তা। গণতন্ত্র স্বীকার করে যে মানুষ ভুল করতে পারে। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যার হাতে তারও ভুল করার আশংকা থাকে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি কোন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে সংখ্যালঘু তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের ব্যবস্থা থাকবে। একটা প্রাচ্য পত্রিকায় একবার মন্তব্য করা হয়েছিল যে, মানুষ যদি দেবদূত হত তাহলে সরকারের কোন প্রয়োজন ছিল না আর সরকার যারা গঠন করেন তারা যদি সবাই দেবদূত হতেন তাহলে ক্ষমতায় লাগামের রশি রাখার ব্যবস্থারও কোন প্রয়োজন হত না। কথাটা সত্য তো বটেই। কেউ দেবদূত নয়। দেবদূত হবার প্রয়োজনই বা কি? মানুষ হলেই তো যথেষ্ট। মানুষ ভুলচুক করে আবার আদর্শে এবং বিবেকে উদ্দীপ্ত হয়। যে মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে রাজপথে নামে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে, দেশে সার্বভৌমত্ব রক্ষার অঙ্গীকার করে।

গণতন্ত্র আমাদের স্বপ্ন। স্বপ্ন বলাই সঠিক। কারণ গণতন্ত্র আছে আমাদের চেতনায়, আমাদের ধ্যান-ধারণায়। কিন্তু গণতন্ত্রকে সেভাবে একান্ত নিজের করে আমাদের বুঝি কখনো পাওয়া হয়নি। গণতন্ত্র এই বস্তুজগতে আমাদের হাতের মুঠোয় সেরকম স্থায়ী কখনোই ধরা দেয়নি। আমাদের সমতল ভূমিতে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি কখনোই। হবার কথাও হয়ত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে এখানে অন্নচিন্তায় দিন গুজরান করে। কথা বলার স্বাধীনতার মর্ম ক'জনই বা বোঝে? বলার মত কথাই বা ক'জনার আছে? তাই স্বৈরশাসকও যদি দু'মুঠো অন্ন দিতে পারেন তাহলে তার কণ্ঠেও ফুলের মালা স্তূপীকৃত হয়ে উঠতে পারে। এজন্য সাধারণ মানুষকে দোষ দেয়া যায় না। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ না হলে তাদের চেতনার বিকাশ ঘটেনা, মানুষের চরিত্র গঠন হয়না। এদেশে যারাই ক্ষমতায় আসুন তাদের এ কথা বুঝতে হবে। সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, গণতন্ত্রের ভিত পাকাপোক্তভাবে তৈরী করতে হলে সাধারণ মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটাবার আয়োজন করতে হবে। তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের কথা ভাবতে হবে।

এখন সময়টা চমৎকার। এমনি চমৎকার সময় অতীতেও আমাদের জীবনে দু'এক বার এসেছে। কিন্তু আমরা তাকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারিনি। শুভক্ষণ হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। গণতন্ত্র এখানে সোনার হরিণ হয়ে আছে। অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় তা দেখা হয়ত দরকার। মানুষ এখন আশাবাদী একটা কিছু এবার হয়ত ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আবার যেন তাদের নিরাশ হতে না হয়।[২০৩]

সংবাদে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি উপসম্পাদকীয় ও নিবন্ধে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। 'অনিরুদ্ধ' ছদ্মনামে তিনটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে। এই উপসম্পাদকীয়গুলোতে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গে অভিমত তুলে ধরা হয়। 'অনিরুদ্ধ' ছদ্মনামে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর। এই উপসম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসনের অবসান হলেও চক্রান্ত শেষ হয়ে যায়নি। এই চক্রান্ত প্রতিরোধ করার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। এই উপসম্পাদকীয়টি শিরোনাম ছিল: 'ঋতু আজ ফুলের মুখে আগুনের কথা বলছে'। এতে লেখা হয়:

> আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম দীর্ঘদিনের। তাকে আমরা কখনও কখনও সুবিধার জন্য খণ্ডকালে বিচার-বিশ্লেষণ করি। কখনও তাকে সার্বিকভাবে ইতিহাসের গতিধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। আর তখনই আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকে জাতীয় জীবনে, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে দৃঢ় ভিত্তি করার দিকে অগ্রসর হতে পারি।
>
> রেনেসাঁ এনেছে ভৌগোলিকভাবে ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার ধারা চুইয়ে ঔপনিবেশিক জীবনে যখন প্রবেশ করল, তখন থেকে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এক স্রোতধারায় মিলেমিশে ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেখা গেল দেশভেদে সামাজিক প্রেক্ষাপট, ঐতিহ্য ধারায় স্বাধীনতার ধারণা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ক্রমেই আমরা স্বচ্ছতর হওয়ার পথে অগ্রসর হওয়ার আন্দোলন করেছি।
>
> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ধারা ভাষা আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সেই গণতন্ত্রের ধারাকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিল।
>
> আন্তর্জাতিক ভাবধারা ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই গণতন্ত্র অনুশীলনের কাজটি সহজ ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা ক্রমাগত অনুশীলন ছাড়া জাতীয় জীবনে দৃঢ় মূল হতে পারে না।
>
> স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রকে আমরা রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্ষমতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছি আর সেখানে পূর্ববর্তী অভ্যস্ত পদক্ষেপ অর্থাৎ ক্ষমতায় যেয়ে গণতন্ত্রকে

একভাবে দেখা এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলে অবস্থানকালে তার উপলব্ধি এক নয়। বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের কাহিনী এখানে উল্টোভাবে কার্যকর হয়।

কথিত আছে বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন যেখানে ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল, সেই উঁচু ঢিবির ওপর বসে ভোজরাজা ন্যায় বিচার করতেন। কিন্তু ওই ঢিবি থেকে নেমে এলেই তার সিদ্ধান্ত ও আচরণ প্রজার স্বার্থবিরোধী হয়ে দাঁড়াত।

একালে ক্ষমতার বত্রিশ সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে জনগণের কল্যাণ ও অধিকার খর্ব করার ইতিহাস আছে, আর বিরোধী দলে অবস্থান নিয়ে জনগণের কল্যাণের জন্য ও অধিকার অর্জন কিংবা রক্ষার জন্য সংগ্রামের অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত আছে।

আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই দেখা গেছে যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ৩০ লাখ শহীদদের নিয়ে আমাদের আবেগ যত তীব্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা ও তার অনুশীলনের প্রচেষ্টা ততখানি ক্ষীণ।

আর তাই হত্যার রাজনীতি এবং যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম সেই সামরিক শাসন বারবার জাতীয় ইতিহাসে দুর্যোগ সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এই দুর্বলতা সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনে জাতীয় চেতনার উন্মেষের মত '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বারবার আমাদের সংকটের মুহূর্তে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একত্রিত করেছে।

আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতির ধারা ক্রমাগত ডান-বাঁয়ের ধাক্কা খেয়ে দেখা গেল ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক সংকট ও দুর্নীতির অজুহাত তুলে একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি করা হল।

কোন নির্বাচিত সরকার পরিবর্তনের যে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া উৎখাতের এই মহড়া ভয়াবহভাবে শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে। তারপর যে গণতন্ত্রের বাতাবরণের ধারায় সরকার পরিচালিত হয়, সেখানে রুগ্ন গণতন্ত্র নিজেকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এক পর্যায়ে এসে এই পরিস্থিতির সর্বনাশা রূপ উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা ঐক্যসূত্রের সন্ধান করে। এই পর্যায়ে ১৯৮৭ সালে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে ১৯৯০ সালে দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য বিশেষভাবে তিনজোটের যৌথ কর্মসূচী এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনকে বেগবান করে এবং তা সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গণআন্দোলন আর একবার গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শহর শিল্পাঞ্চলের

গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্দোলন বাংলাদেশের হৃদয় গ্রামগঞ্জ বন্দরকে উদ্বেলিত করে তোলে।

১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের সঙ্গে এর তুলনা যেমন করা চলে, তেমনি তা অন্যদিক থেকে অতুলনীয়। একটি স্বাধীন দেশের জনগণ তাদের স্বপ্নভঙ্গ ও আশাভঙ্গের বেদনা ও ক্ষোভকে একই মোহনায় মিলিয়েছে। ১৯৬১ সালে স্বপ্নভঙ্গ হয়নি, সেদিন স্বপ্নকে বাস্তবে অর্জনের জন্য জনসাধারণ জেগে উঠেছিল।

আর তাই গণঅভ্যুত্থান ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী উপলক্ষে দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চারিত গণতন্ত্র মুক্তি পাক ধ্বনি হতে ১৯৯০ সালে এসে সমুদ্র গর্জনে পরিণত হলো।

সাতদিন ধরে মৃত্যুঞ্জয়ী জনসাধারণ লাঠি-গুলী তুচ্ছ করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জরুরী অবস্থা ও কার্ফু অগ্রাহ্য করে আন্দোলনের এই অগ্রযাত্রা স্বাধীনতার পর আর কখনো ঘটেনি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর ক্রোধ ও অর্থনৈতিক চাপে ক্লিষ্ট মানুষের এই অভ্যুত্থানকে একজন পুষ্ত কবির ভাষায় বলা চলে, ঋতু আজ ফুলের মুখে আগুনের কথা বলছে। সে আগুনে শুধু শত্রুকে দহন নয়, আত্মপরিশুদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। অহমিকাগ্রস্ত দীনতাকে দগ্ধ করেই শৌর্যের সেই ভাষা আমরা আয়ত্ত করতে পারি। এটাই গণতন্ত্রকে জাতীয় জীবনে ও ব্যক্তিমানসে বিকশিত করার রাজপথে বিজয় উৎসবের আহ্বানেও তাই উচ্চারিত।

একদিন যে তরুণরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিল বন্দীর জিঞ্জির ছিন্ন করার জন্য, আজ আবার তার উত্তরসূরি তরুণরা ছাত্রসমাজ মনের বন্দিত্ব মোচনের জন্য অর্থাৎ গণতন্ত্রের জন্য, সংগ্রামকে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে নেয়। তার এই অগ্রযাত্রা স্বৈরশাসনের সন্ত্রাসী বাহু স্তব্ধ করতে পারেনি। তারা প্রাণদানের পুণ্যের বিনিময়ে দেশকে রাহুমুক্ত করেছে।

গত অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ অবরোধের পর আন্দোলনের এক পর্যায়ে মধ্যবিত্ত ক্লান্ত রক্তে জরুরী অবস্থা জারির আশঙ্কা ছায়া ফেলেছিল। কোন কোন মহলের ক্ষীণ আশঙ্কা ছিল এই জরুরী অবস্থা গণআন্দোলনকে তার দায়বদ্ধতা থেকে রেহাই দেবে। অতীতের ভীরুতা, পারস্পরিক সন্দেহ ও সংশয়জাত এই শঙ্কা নিমেষে রাজপথে তরুণদের দৃপ্ত পদপাতে ফুৎকারে শুকনো পাতার মতো উড়ে গেল।

কে ভেবেছিল বাংলাদেশের দুরন্ত যৌবন এভাবে পৌষের বনে ফালগুনকে ডেকে আনবে। শত শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে এ বিজয় এসেছে। আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রলোভনের ফাঁদও পাতা হয়েছিল অলক্ষ্যে। আর প্রকাশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত ছাত্রনামধারী মস্তানদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল।

স্বৈরশাসন বাংলাদেশের যৌবনকে চেনেনি। তারা ভেবেছিল বিভেদ ও সন্ত্রাসের সাহায্যে টিকে থাকবে। অতীতে একদা যারা বিপ্লবী ছিল কিংবা যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক ছিল বলে দাবী করেছিল, তাদের কেউ কেউ রাজনৈতিক ডিগবাজি এই স্বৈরশাসনের আয়ুষ্কাল কিছুকাল বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই তারা দুঃসাহসী হয়েছিল ও দুরাশা পোষণ করেছিল।

এ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের আছে। আজ এই বিজয়ের মুহূর্তে মনে রাখা উচিত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে জয়ী লোক স্বদেশে বিপক্ষ শিবিরের রাতারাতি ভোল পাল্টিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। সেদিন তাদের স্বভাবচরিত্র জেনেশুনেও দলীয় শক্তিবৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য স্বদলে আশ্রয় দিয়েছিল। আজ পুনরায় সেই মোহ কেউ পোষণ না করে তার প্রতি নজর রাখার দায়িত্ব মূলত গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে প্রতিশ্রুত রাজনৈতিক দলগুলোর এবং গণসংগঠনসমূহের। দলীয় শক্তিবৃদ্ধির নামে একদা এনএসএফ-এর কুখ্যাত ছাত্রনেতা '৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর দু'দুটি সরকারের মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হয়েছে। এরকম আরো উদাহরণ রয়েছে। আর তাদের ভূমিকা দেশবাসী জানে। এসব ঘৃণিত ব্যক্তি এবং তাদের পদলেহীদের কোন রাজনৈতিক দলে পুনর্বাসন না করার অঙ্গীকার আমাদের গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে অপরিহার্য। এই সত্যকে যেন বিজয়ের মুহূর্তে কেউ বিস্মৃত না হন। আমরা সংকীর্ণতা পরিহার করব, কিন্তু কোন অন্যায়ের নিকট মাথানত করব না, বিজয়ী জনগণকে এই শপথ গ্রহণ করতে হবে।

শুভার্থীর ছদ্মবেশ ধরবে শত্রুরা। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গত ন'বছর ধরে যারা স্বৈরশাসনকে মদদ যুগিয়েছে, তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট নিয়ে হাজির হবে। ভান করবে অনুতাপের। স্বৈরশক্তির পতনের মুহূর্তে হঠাৎ যাদের বিবেক রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মত নিদ্রা ভেঙ্গে জেগে উঠেছে, তাদের সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। রাজনীতিতে রিপ ভ্যান উইঙ্কলদের স্থান নেই। এই স্পষ্ট উচ্চারণ দেশবাসী আশা করে রাজনীতিকদের নিকট থেকে। আমরা এ বিশ্বাস পোষণ করতে চাই যে, আমাদের তিন জোটের নেতৃবৃন্দের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, গণতন্ত্রের গণতন্ত্রের জন্য তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের দিনগুলোতে আর সেই অভিজ্ঞতাই তাদের পথ দেখাবে। আমাদের তরুণদের রক্ত যেন রাজপথে আর না ঝরে। ১৯৭১ সালের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, দুর্যোগের কালোরাতের পর এক নবসূর্যোদয়ে দ্রুত দুঃস্বপ্নকে ভুলে গিয়েছিলাম। তার জন্য চরম মূল্য আমাদের দিতে হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে।

আমরা আমাদের এ কথাও স্মরণে রাখতে হবে এই সপ্তাহব্যাপী গণঅভ্যুত্থান এবং বিজয়ের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে দীর্ঘদিন। বার

বার আমরা অতীতে পথভ্রষ্ট হয়েছি। দুর্বলতা ও মোহ আমাদের দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল। এর জন্য বহু লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে ছাত্রদের সংগ্রাম ও প্রাণদান থেকে শুরু করে রাজপথে বহু রক্ত ঝরেছে। সেখানে স্বৈরশাসনের ভূমিকার সঙ্গে আমাদের ভ্রান্তি ও দুর্বলতাও ছিল সহচর। সেই ভুল ও দুর্বলতা থেকে আমরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করি। স্বৈরশাসনের অবসান হলেও চক্রান্তের শেষ হয়নি। সুহৃদের বেশ ধরে আসবে কুগ্রহ শনি। কিন্তু কথায় আছে ছিদ্রপথে শনি প্রবেশ করে। সেই ছিদ্র বন্ধ করার দায়িত্ব রাজনীতিকদের। শুধু জনগণকে সতর্ক প্রহরী হিসাবে অতন্দ্র থাকতে হবে একথা বলে আত্মকৃত অপরাধ ক্ষালনের অবকাশ নেই।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিজয় আরব্ধ কাজকে সহজ করেনি বরং আরও গুরুদায়িত্ব আমাদের রাজনীতিকদের জাতীয় নেতাদের ওপর বর্তেছে।

নিজদের মধ্যে লালন ও প্রতিষ্ঠার কাজ দুরূহ। কোন পাঁচসালা পরিকল্পনা দ্বারা হবার উপায় নেই। একথাটা মনে না রাখলে পৌষের বনে ফালগুনের আবাহন হয়ত বার বার রক্তিম পথ ধরে আসবে এবং এসেছেও। কিন্তু আঁধিঝড় এসে কতবার দৃষ্টিকে রুদ্ধ করেছে, আর সংকীর্ণ স্বার্থের বেদীমূলে দেশাত্মবোধ স্বৈরাচারের অশ্বমেধের বলি হয়েছে। এবার আমরা নবসূর্যোদয়ের কল্যাণতম রূপ দেখতে চাই।[২০৪]

'অনিরুদ্ধ' ছদ্মনামে সংবাদে আরেকটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর। এই উপসম্পাদকীয়তে স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই উপসম্পাদকীয়টি শিরোনাম ছিল: 'স্বৈরশাসনের অবসান হলেও দুঃসময় কাটেনি'। এতে লেখা হয়:

> দেশজুড়ে এক অকল্পনীয় গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে এরশাদের তখত-তাউস ভেসে গেল। জনতার রুদ্ররোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন। গত ৯ বছর ধরে তার দুঃশাসনে অতিষ্ঠ গণমানুষের ক্ষোভ আর ক্রোধ রাজপথে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তাকে একমাত্র ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান অসহযোগ এবং ১৯৭১ সালের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে ছাত্র-জনতা। জরুরী অবস্থা ও কার্ফু দিয়ে শেষরক্ষা হল না। মানুষ নিপীড়নের সব অবরোধ ভেঙ্গে ফেলল। সরকারী ছত্রছায়ায় মুখচেনা সন্ত্রাসীদের হামলা ও এরশাদ নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীর সাঁড়াসি আক্রমণ পর্যুদস্ত করে জনগণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে।
>
> প্রথমে তিনি পদত্যাগ নিয়ে কিছুটা টালবাহানা করেছিলেন অবস্থা বেগতিক দেখে। ভেবেছিলেন কথার মারপ্যাচে তিনি লোকচক্ষে ধুলা

দিয়ে কিছুটা সময় নিয়ে আবার নতুন করে রাজনীতিতে দাবার চাল সাজাবেন। তার সেই কূটকৌশল খাটেনি। সজাগ দেশবাসী ছাত্র-জনতা স্পষ্ট জানিয়ে রাজনৈতিক জোট দিয়েছে, তারা সময় দিতে রাজি নয়। 'দূর হ দুঃশাসন' বলে শ্লোগান উঠেছিল ১৯৮৭ গণআন্দোলনে সে কথাটাই তাকে জানিয়ে দেয়া হল। বাধ্য হলেন এরশাদ সাহেব পদত্যাগ করতে।

সব স্বৈরশাসকই মনে করেন যে, জনগণকে তারা ভোলাতে দক্ষ। আর একে অন্যকে অন্ধের মত অনুকরণ করে থাকেন। আইয়ুবশাহী উন্নয়ন দশক করেছিলেন, এরশাদ সাহেবের ধৈর্য ছিল না, অথবা ১৯৮৭ সালের গণআন্দোলন তাকে এমন একটা ধাক্কা দিয়েছিল যে, কালক্ষেপ না করে শিশু ভুলানো ছড়ার মত তিনি পালন করলেন উন্নয়ন অষ্টক। তার আট বছরের 'সুকৃতির' ইতিহাস তিনি তুলে ধরতে চাইলেন হুবহু আইয়ুবী কায়দায়। তাকে অনুকরণের অনুসরণের শেষের অংশটাও ফলল। আইয়ুবের মত তাকে বিদায় নিতে হল গণঅভ্যুত্থানের মুখে।

পদত্যাগের পর তিনি কি ভাবছেন, কি তার অনুভূতি, তিনি কি দেশ থেকে পালানোর কথা ভাবছেন, না আবার সব হবে, সিংহাসন ফিরে পাবেন। আবার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশকে তিনি দক্ষ বাজিকরের মত নিজের ইচ্ছেমত নাচাবেন, এটা জানতে দেশবাসী উৎসুক ছিল।

তিনি নিজেকে শুধু নিজেকে শুধু একজন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ হিসেবেই মনে করতেন না, নিজেকে কবি হিসেবেও জাহির করতেন। বিজ্ঞাপনের মতই তার কবিতা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। না তাকে ব্যঙ্গ করে একথা বলা হচ্ছে না। পৃথিবীর কোন কবিই তিনি যতই খ্যাতনামা হোন না কেন, এমনকি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হলেও কখনও একই কবিতা একই দিনে সকল সাময়িকী বা দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় দূরের কথা, সাহিত্য পাতায়ও ছাপা হয় না। রাষ্ট্রপতি এরশাদের কবিতা ছিল তার ব্যতিক্রম। একটি কবিতা লেখনীমুখে প্রসবের পর তা প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদ পত্রিকার নির্ধারিত সাময়িকী সংখ্যা বেরুবার জন্য অপেক্ষা করতেন না। একই দিনে তা তার আজ্ঞাবহ বা অনুগ্রহভোজী দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হত। সামরিক শাসনামলে তো প্রতিটি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তার কবিতা ছাপানো প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল। এজন্য তার কবিতাকে বলা চলে বিজ্ঞাপনধর্মী। তিনি রাষ্ট্রপতি। সুতরাং তাকে রাজকবি বলা চলে না। কারণ রাজদরবারের কবিকে রাজকবি বলা চলে। কিন্তু রাজা (এখানে রাষ্ট্রপতি) যখন নিজেই কবি তখন কবিরাজ বলাই সঙ্গত হবে। সুতরাং তার সংবেদনশীল মনে এই হঠাৎ ক্ষমতাকক্ষচ্যুতি কী প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে তথা তার মনোভাব নিয়ে কৌতূহল জাগা

স্বাভাবিক। তিনি কবি সুবাদে দাবী করতেন তার হাত কখনো রক্তে রঞ্জিত নয়। কথাটা সত্যি তিনি তো নিজ হাতে কাউকে ছোরা মারেননি বা গুলী করেননি। কবিসুলভ আবেগ নিয়ে তার এই ভাষণে লোকে মোহিত হত কিনা জানা যায়নি। তবে এরেঞ্জ করা সভায় অগ্রিম সরবরাহকৃত মালা গলায় দিয়ে যখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন, তখন তার কথা অনেকেই বিশ্বাস করত। কারণ তার শ্রোতাদের অধিকাংশ নিরক্ষর বিধায় তার কবিতা পড়েনি।

কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে হল না, তিনি ৩রা ডিসেম্বর প্রথম পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা দেন। তবে তখনই নয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের কিংবা মওদুদ ব্যাখ্যাকৃত মনোনয়নপত্র দাখিলের ১৫ দিন আগে পদত্যাগ করবেন এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু দুর্বিনীত জনগণ তাকে সে সময় দিতে রাজি নয়। সুতরা ২৪ ঘণ্টা পার হতে না হতেই তিনি ৪ঠা ডিসেম্বর ঘোষণা দেন যে, তিনি পদত্যাগ করবেন অবিলম্বে। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি শনিবার সংসদ ডেকে নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ অনুমোদন করাবেন। কিন্তু তার 'জনপ্রিয়' মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের তো জাতীয় সংসদে যাওয়ার উপায় নেই। জনগণ তাদের শক্তির 'জনপ্রিয়তা' চ্যালেঞ্জ করেছে আর গৃহপালিত বিরোধী দলীয় সদস্যরা আগে থেকেই ইয়া নফসি, ইয়া নফসি বলতে শুরু করেছে। তাছাড়া ২৮জন সংসদ সদস্য ডুবন্ত জাহাজ থেকে নেংটি ইঁদুরের লাফিয়ে পড়ার মত অবস্থায় পদত্যাগ করেছেন। সুতরাং মওদুদের ব্যাখ্যামত পদত্যাগ করার ফুরসৎ এরশাদ সাহেবের হয়নি। বিরোধীদলের মনোনীত প্রার্থীর হাতে শাসনভার ন্যস্ত করে তাকে বিদায় নিতে হল।

তার পদত্যাগে রাজপথে উল্লাসের খবর, লোকের মন্তব্য, বিজয় মিছিল সম্পর্কে খবরাখবর এরশাদ সাহেবের কানে যায়নি এমন হতে পারে না। সুতরাং তার সাম্প্রতিক মানসিক অবস্থা নিয়ে দেশবাসীর কৌতূহল আর উদ্বেগের সীমা ছিল না। উদ্বেগ 'সাপ মরলেও অনেক সময় লেজে বিষ থেকে যায়।'

সম্প্রতি সাক্ষাৎকারে সঙ্গে বিবিসির সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেছেন, তিনি যে পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করেছেন, বা নয় বছরে যেসব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছেন তার জন্য মোটেই দুঃখিত নন। বলে কি, তিনি কি সীমারের ভূমিকায় নিজেকে সার্থক অভিনেতা মনে করেন। না, তিনি সত্য কথাটাই বলেছেন। বোধহয় গত ন'বছরে এটাই তার প্রথম সত্যভাষণ।

বিবিসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এরশাদ সাহেব জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়াবার কথা বলেছেন। রাষ্ট্রপতি পদেও তিনি প্রার্থী হবেন। তিনি গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। তার বিশ্বাস দেশবাসী তাকে চায়। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতকারী সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষতার সুযোগ নিয়ে তাকে কুপোকাত

করেছে। নতুবা তিনি সে বান্দাই নন। তিনি আঁচ করতে পারেননি সারাদেশই আজ তার ভাষায় দুষ্কৃতকারী। বিডিআর মীরপুর ও অন্যান্য এলাকায় তাদের গুলীবর্ষণে লোক নিহত হয়েছে একথা অস্বীকার করেছে। তাহলে কাদের গুলীতে মীরপুরসহ ঢাকা শহরের অন্যান্য এলাকায় লোক মারা গেছে? তাদের এ অস্বীকৃতি সত্য হলে এরশাদ সমর্থক মস্তানরাই এ কাজটা করেছে বলতে হয়।

বিবিসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। দেশবাসী গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থাৎ ভোট দেয়ার অধিকার প্রয়োগ করে আবার তাকে সিংহাসনে বসাবে। এরশাদ সাহেব কি ভাবছেন যে, আবার ভোটারবিহীন ভোটে নির্বাচিত হওয়ার সৌভাগ্য তার হবে। ক্ষমতায় থেকেই ডাণ্ডা চালিয়ে, গুণ্ডা লেলিয়ে ভোটারদের কষ্ট লাঘব করে নিজেরাই ব্যালট বাক্স ভর্তি করে জয়ী হওয়া চলে। এরশাদ সাহেব এটা নিশ্চয়ই ভাল করে জানেন।

বিবিসি'র কাছে তিনি যা বলেছেন, তা নতুন কথা নয়। নতুন হল ক্ষমতা ত্যাগের পর তার খায়েশ কী একথাটা জানিয়ে দেয়া। তিনি বলেছেন, 'প্রিয় দেশবাসীর' জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। সুযোগ পেলে আবার তিনি এমন কথা অনায়াসে বলতে পারবেন যে, তাকে দুষ্কৃতকারীরা বিদেশী শক্তির সহায়তায় ক্ষমতাচ্যুত করেছে। হ্যাঁ, গণআন্দোলন শুরু হওয়ার পর বৈদেশিক শক্তির হাত, তাদের চক্রান্ত আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন তিনি, এটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ তিনি তো ইয়াহিয়ার সার্থক উত্তরসূরি।

তিনি একবার এক জনসভায় পতনের পক্ষকাল আগে বলেছিলেন যে, তার সরকারই বৈধ, আর পূর্ববর্তী সব সরকারই অবৈধ। তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঠিক কথাই বলেছেন। ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা যখন বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে, এদেশবাসী মুক্তিযুদ্ধ করে প্রাণ দিচ্ছে, তখন তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের ঐ অংশে বসে বাঙালী সৈন্যদের বিচারের জন্য গঠিত কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। অবশ্য এরশাদ সাহেবের সমর্থকরা যুক্তি দেখান যে, তিনি ওই পদে থাকার জন্য বিচারে অভিযুক্তদের লঘু সাজা হয়েছে। তাই ইয়াহিয়ার ভাবশিষ্য হিসেবে তিনি নির্বাচিত সরকারকে গায়ের জোরে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। সুতরাং তার চোখে পূর্ববর্তী সব সরকার যে অবৈধ তাতে সন্দেহের কিছু নেই।

তিনি নির্বাচন করেছেন, কারণ তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এটাই তার বক্তব্য। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনের সময়ে তার দলবল গুণ্ডাবাজি করেও নিশ্চিত হতে পারেনি, তাই নির্বাচনের ফল ঘোষণার সময় মিডিয়া ক্যু করে তাকে জিততে হয়েছে। বিরোধী রাজনীতিক দলের একটি অংশ নির্বাচনের এই হাল-হকিকত আন্দাজ করে সেদিন যায়নি। নির্বাচনে

১৯৮৮'র নির্বাচনে তো ভোটারবিহীন ভোটে এরশাদ সাহেব জিতলেন। গণতন্ত্রের খাতিরে বিরোধীদল দরকার। তাই গৃহপালিত বিরোধীদলও খাড়া করা হল। এই হল এরশাদী গণতন্ত্রের নমুনা।

তারপর দেশের উন্নয়ন। তৃতীয় বিশ্বের দেশে উন্নয়ন করতে হলে শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে হয়। সেখানে শিল্পায়নের উন্নতির গতি এদেশে কোন স্তরে তা প্রবৃদ্ধির হারের দিকে তাকালে বোঝা যায়। যেখানে বছরে শিল্পখাতে শতকরা ১০/১২ ভাগ প্রবৃদ্ধি সুনিশ্চিত তা কখনও শতকরা দু'তিন ভাগের ওপর মুখ দেখেনি। শিল্প স্থাপনের নামে লুটপাট হয়েছে। টাউট-বাটপার মোসাহেবদের অর্থ বানানোর কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সরকারী শিল্পনীতি।

বেসরকারী খাতে শিল্প ছেড়ে দেয়ার নামে, শাসকগোষ্ঠীর তল্পিবাহীদের হাতে শিল্পকারখানা চালাবার ব্যবস্থার পরিণতি অসংখ্য রুগ্ন শিল্প আর ক্রমাগত পণ্য আমদানীর পরিমাণ বাড়ানো। এমনকি লবণ আমদানী না করলে চলছে না এখন।

দুর্নীতি উচ্ছেদের নাম করে ক্ষমতা দখল করে এরশাদ সরকার দুর্নীতি শিল্পকে একচেটিয়া মালিকানায় নিয়ে এসেছেন। দুর্নীতির কার্টেল ক্ষমতার মধুচক্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। তার সরকারের আমলেই বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা ও মাদকাসক্তি বেড়েছে। সোনা চোরাচালানের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। চোরাচালান ধরতে গিয়ে একজন কাস্টমস অফিসারের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুরহস্য সন্দেহমুক্ত ছিল না। তিলোত্তমা নগরীর নামে লুটপাট চলেছে অবাধে।

বিদেশী সাহায্যের সিংহভাগ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে যে উন্নয়নের রাজনীতি চালু হয়েছে, তা ক্ষমতাকে ঘিরে কোটিপতির জন্ম দিয়েছে। প্রকৃত শিল্পোদ্যোক্তাদের পরিবর্তে টাউটদের হাতে পড়েছে শিল্পায়নের ভার। তাই শিল্প বিকাশের পরিবর্তে ইন্ডেন্টরদের ভিড় বেড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য চলে গেছে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাউটদের হাতে। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় ছিটেফোঁটা যে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, তার জবাবদিহির দায় ছিল না সরকারের।

তারপর সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে কিভাবে সন্ত্রাসবাদীচক্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ ও আস্ফালন করেছে, তা ঢাকার নাগরিক, ছাত্র ও শিক্ষকসমাজ প্রত্যক্ষ করেছে। অস্ত্রধারীরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে পিছু হটার পর দেখা গেল সরকারের নিরাপত্তারক্ষীরা মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে আক্রান্তদের উপরই হামলা চালিয়েছে। যে গাড়ীটি দুষ্কৃতকারীদের একটি মন্ত্রণালয় সরবরাহ করেছে তার সম্পর্কে কিছু না লেখার জন্য গভীর রাতে পত্রিকায় টেলিফোন গিয়েছে, মন্ত্রণালয়ের গাড়ী নিমিষেই এম্বুলেন্স হয়ে গেল এবং তা কিভাবে ছিনতাই হল, তারও একটা কাহিনী পত্রপত্রিকায় ফিড করানো হয়েছে।

তার আগে ভারতের বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে সরকারী ছত্রছায়ায় দেশে কিভাবে খোলাখুলি সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়া হয়েছে এবং পুলিশকে নির্বাক দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে, তার পুনরুক্তি নিস্প্রয়োজন। দু'দিন এভাবে সরকারের পোষা মস্তানমন্ত্রীর নির্দেশে লুটতরাজ অগ্নিসংযোগ, ভাংচুরের পর রাষ্ট্রপতি ত্রাণকর্তার অভিনয় করলেন নিপুণভাবে। রাজনৈতিক নেতারা এটা বলেছেন এভাবে 'সর্প হয়ে দংশন করে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে'।

সেই ব্যক্তি বিবিসি'র সাক্ষাৎকারে কৃতকর্মের জন্য কোন অনুতাপ নেই, ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণের কোন অভ্যাস নেই বরং বলেছেন যা করেছি এবং যা ঘটেছে তাতে তিনি দুঃখিত নন। প্রায় শ'খানেক লোক স্বৈরাচারীর নিরাপত্তা বাহিনীর গুলীতে প্রাণ দিয়েছে, স্বৈরাচারের গুলীতে নিহত হয়েছে মীরপুরে কাজীপাড়ায় স্তন্যদানরত মাতা, এসব কাহিনী ও তার সচিত্র প্রতিবেদন তার মনে দুঃখের ছায়াপাত ঘটেনি। কবি এরশাদের উপযুক্ত কথা, দেশবাসী যেখানে তার চোখে দুষ্কৃতকারী, তাদের দু'দশজন নিহত হলে ইয়াহিয়ার যোগ্য সাকরেদের তো দুঃখ হওয়ার কথা নয়।

তার এসব কথা শুনে কবি জীবনানন্দ দাসের একটি কবিতার কিছু পংক্তির কথা মনে পড়ে। তাড়াহুড়ার জন্য দেখে নিয়ে সঠিক উদ্ধৃতি দিতে পারছি না বলে পাঠকদের নিকট মাফ চাইছি। পংক্তি দু'টি এরকম, আর তা কুরাষ্ট্র নেতাকে তথা রাজনৈতিক ধান্দাবাজদের উল্লেখ করেই বলা হয়েছে:

অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ নেই,
অপরের মুখ ম্লান করে দেয়া
ছাড়া কাজ নেই।

ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরকম রীতি চোখে পড়ে। বাংলাদেশকে ইতিহাসের এই পঙ্কিল আবর্ত থেকে উদ্ধার করে ছাত্রজনতা "কামানের উর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল হিসাবে নতুন যাত্রার পথনির্দেশ করেছে"। সেখানে এরশাদ সাহেব দুরাশা পোষণ করছেন আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সফল হবেন এবং আবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়াবেন।

তার এই খায়েশ দিবাস্বপ্ন বা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে পারলে ভাল হত। যে দেশ ত্রিশ লাখ লোকের রক্তদানের বিনিময়ে মুক্ত হয়েছিল, আমরা তাকে ভুলে যেতে বসেছিলাম বলেই স্বাধীনতা মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের চেয়ে কোথাও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে পারেনি। প্রয়াত আবু জাফর শামসুদ্দিনের বন্ধু বসুধা চক্রবর্তী দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর তাঁর ঠিকানা খুঁজে নিয়ে কলকাতা থেকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অভিনন্দন করে বলেছিলেন, "আমার যেন কেন আশংকা হয় এটা মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত।" তার আশংকা আমাদের

কৃতকর্মের দায়ে সত্যে পরিণত হয়েছিল। ১৯৯০-তে এসে বহু রক্তপাত ও দুর্গম পথ পেরিয়ে যে নবযাত্রার আয়োজন সেখানে আবারও অশুভশক্তির এই স্পর্ধাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না, সে তার শক্তির উৎস চেনে বলেই ভরসা করে পাশার দান উল্টে ফেলার।

বিবিসি'র সাক্ষাৎকারে এরশাদ সাহেবের বক্তব্যকে লঘুমূল্য করে উপহাসে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না। বরং দৃষ্টিকে আরও প্রখর করতে হবে, চিত্তকে আরও সুতীক্ষ্ণ করতে হবে যেহেতু কবির ভাষায়:

"চারিদিকে অগণন মেশিন ও
মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে
নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃংখল ।
দিনের আলোর দিকে তাকালেই
দেখা যায় লোক
কেবলি আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়,
এ ছাড়া নির্মল কোন রাজনীতি নেই
যে-মানুষ যেই দেশ টিকে
নেই। থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয় রাজ্য গড়ে- সাম্রাজ্যের
মত কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবীতে চাই সাম্রাজ্য
কেবলি ভেঙে গিয়ে
তারই পিপাসায়
গড়ে ওঠে।
এ ছাড়া অমল কোন রাজনীতি
পেতে হলে তবে
উজ্জ্বল সময় স্রোতে চলে যেতে হয়।"

এই 'উজ্জ্বল সময় স্রোত' গণতন্ত্রের অবাধ বিকাশ। সেখানে মত ও পথের পার্থক্য থাকবে– বৈরিতা থাকবে না। স্বৈরাচারমুক্ত স্বদেশে তারই অনুশীলন করেই ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারীর দুরাশা লালিত আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করা সম্ভব। বিবিসি'র সাক্ষাৎকারে ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতির দেয়া বক্তব্য যেন এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত রাজনীতিক ও ছাত্র-জনতা সকলকে তাদের দুরূহ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন রাখে। দুর্যোগের মেঘ কাটেনি। শুধু উৎসবে আত্মহারা না হয়ে ক্ষমতাচ্যুত অপরাধীচক্রের আইন অনুযায়ী বিচার করার উদ্যোগ নেওয়া হোক। তাদের ঘরবাড়ীতে আগুন দেয়ার মধ্যে উচ্ছৃংখলতা প্রকাশ পায়। বরং অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করা হোক। কারণ তারা রাজপথে লোক খুন করেছে।

তারা যে ক্ষমতাচ্যুত হলেও অনুতপ্ত নয়, লজ্জা সরমের লেশমাত্র নেই, বিবেকহীন এরশাদের স্পর্ধিত বক্তব্য তারই সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। তাকে ও তার চক্রকে বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় করা প্রয়োজন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ধারা নতুবা পুনরায় চক্রান্তের শিকার হতে পারে মধ্যপথে।[২০৫]

১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর 'অনিরুদ্ধ' ছদ্মনামে সংবাদে আরেকটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই উপসম্পাদকীয়তে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য তিন রাজনৈতিক জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোকে আরও বেশি বিচক্ষণ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। রাজনীতিবিদদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয় মানেই শেষ কথা নয়। গণতন্ত্র অনুশীলনের জন্য কিছু মূল্যবোধ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। একই সঙ্গে কিছু দায়িত্ব বহনের অঙ্গীকারও গ্রহণ করতে হবে। এই উপসম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'দ্বিতীয় বিজয়ে প্রথম মৃত্যুর পদধ্বনি চাইনা'। এতে লেখা হয়:

গত ১০ই অক্টোবর যখন গণআন্দোলনের সূচনা হয় তখনও কোন কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠেনি চোখের সামনে। এক অভাবনীয় বিরাট পরিবর্তনের এক কোন লক্ষণ চোখে পড়েনি। তার একটা কারণ আছে, ১৯৮৭ সালের গণআন্দোলন ও তার পরবর্তী অবস্থা কোন আশারবাণী বহন করে আনেনি।

'৮৭ সালের গণআন্দোলন নিয়ে পত্রিকার এই কলামে মুক্ত আলোচনা হয়েছিল। সফল না হওয়ার কারণ আলোচকরা স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করেছেন, সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু একটা বিষয়ে সকলে একমত ছিলেন যে, সাধারণ মানুষ স্বৈরাচারের পতন চাইলেও আন্দোলনে সামিল হতে চায়নি। তারা ছিল উৎসাহী দর্শক।

সেদিন সরকারের দমননীতি ও হত্যার নিন্দা করেছেন অনেকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কোন প্রতিক্রিয়া বোঝা যায়নি। তারপর দু'বছর কেটে গেল। রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যের কথা বললেন। আবার একই সময় পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ি তীব্র হল। আন্দোলনে যখন ভাটার টান লাগে, তখন এটা স্বাভাবিক।

এসব মনে রেখে ১৯৯০ অক্টোবরে আন্দোলনের সূচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন গুণগত পরিবর্তন চিন্তা- চেতনায় এসেছিল কিনা তা তলিয়ে দেখা হয়নি। কিন্তু ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল আগের তুলনায় তাদের কথাবার্তায় এবং দাবীর ব্যাপারে এরশাদের পদত্যাগের সঙ্গে দুটো বিষয় যোগ করেছে। তাহল এ সরকারের অধীনে

নির্বাচনে যাবে না। '৮৬ সাল ও '৮৮ সালের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা এ দাবীতে অনড় রইল। এভাবে একব্যক্তির পদত্যাগের সঙ্গে একটা সিস্টেমেরও অবসান রাজনৈতিক দলগুলো দলগুলো দাবী করে। এভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীটাই প্রাধান্য পেয়েছিল এবারের আন্দোলনে। ৯ বছরের স্বৈরশাসনকে নানা দিক থেকে পাকাপোক্ত করা হয়েছিল সন্দেহ নেই। তাই আন্দোলনে যখন একটা বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা গেল তখনও সংশয় ও শংকা ছিল '৮৭ সালের মত জরুরী অবস্থা দিয়ে সরকার আন্দোলনকে ঠেকিয়ে দেবে। কিন্তু সে অস্ত্র এবার ব্যর্থ হল। সাধারণ মানুষ পথে নেমেছে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হল ছাত্রসমাজ। ভাঙ্গন ধরানো গেল না সন্ত্রাসবাদীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেলিয়ে দিয়ে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে এরশাদ সরকার বিদায় নিয়েছে। এটা অভাবনীয় সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আর ক্রোধ কত গভীর হলে তারা সবকিছু তুচ্ছ করে রাজপথে নামতে পারে লাঠি-গুলী উপেক্ষা করে, তা ক'দিনের ঘটনাবলীতে স্পষ্ট হয়েছে।

এক অভূতপূর্ব বিজয় অর্জনের পর সারাদেশে উল্লাস ও উৎসবের সমারোহ পড়ে গেছে। ঢাকার রাজপথে বিভিন্ন দল ও সংগঠন একটার পর একটা বিজয় মিছিল বের করেছে। এসব দেখে-শুনে আমার এক বন্ধু বললেন, এসব বিজয় মিছিল আর উৎসব দেখে কী বলা চলে না বাংলাদেশের মানুষ এক অনন্য ধাতুতে গড়া।

আমি কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারিনি। এই বিজয় মিছিলে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ১৩ গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দলগুলোকে দেখেছি। কিন্তু খুনীরাও বের করেছে ট্রাক মিছিল। স্বৈরাচার ও হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা আমার জানা নেই। গণতন্ত্রের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে অবশ্য কেউ কেউ বলবেন, তাদের অতীত কী সবসময়ই উজ্জ্বল ছিল। না, ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বড় ধরনের সাদৃশ্য রয়েছে, তা হল বহু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও তারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আর তারা এজন্য বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেছেন। অনেক সময় তারা হটকারী কিংবা সংকীর্ণ রাজনীতির আবর্তে নেমেছেন। কিন্তু তাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

কিন্তু উৎসাহ ও উদ্দীপনাও ভুলভ্রান্তির জন্ম দেয়। তিন জোট ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য আন্দোলন করেছে গণতন্ত্রের দাবীতে। তারা তারা একটি গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। নিরপেক্ষ এক ব্যক্তির অধীনে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার তারা চান। এবং সেইভাবেই তারা বিজয় অর্জনের পর সকল কাজে-কর্মে প্রকাশ করেছেন।

তারপরও যখন কেউ জাতীয় সরকারের কথা বলেন এবং অধৈর্য হয়ে দাবী-দাওয়া তোলেন, তখন ভয় হয়, তাদের এই অতি-উৎসাহ কাদের উদ্দেশ্য সাধন করবে?

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ওয়াদা ছেড়ে জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব কেন? এটা বড় দল সম্পর্কে কটাক্ষের মনোভাব, না ইতিমধ্যেই ছোট দলগুলো নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে তারা ক্ষমতার কাছাকাছি যেতে পারবে না। জাতীয় সরকার গঠন হলে সেখানে ক্ষমতার অংশ তারা পাবেন। তারা কী ভেবে দেখেননি গত ৯ বছরের কুশাসনে যেখানে সব রকম ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়েছে, নানারূপ অনিয়মের চাপে ও সমস্যায় জাতি জর্জরিত তখন জাতীয় সরকার কোন যাদুমন্ত্রবলে এসব সমস্যার সমাধান রাতারাতি করবে, আর তখনই সাধারণ মানুষকে আবার তাতিয়ে তুলবে স্বৈরাচারের সমচরিত্রের ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো- যাদের চেহারা আমরা চিনেছি ১৯৭১ আর ১৯৭৫-এর আগস্টে।

তারা কি দেখছেন না এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হতে না হতেই তার কাজের প্রচ্ছন্ন সমালোচনা শুরু হয়েছে। শুরু করেছে মাজার দিয়ে, রাষ্ট্রপতি কোন মাজারে গেলেন আর কোন্‌টায় গেলেন না? কেন গেলেন না?

অপরদিকে একাত্তরের ঘাতকদের আহূত মতবিনিময় সম্মেলনে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর স্বৈরশাসনের নিন্দা। শুনতে খুব ভাল শোনায়। এ যেন ডাকাতের নিকট চৌর্যবৃত্তির নিন্দা। এসব দেখেশুনে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

একদা আমাদের গর্ব ছিল যে, আমরা '৭১কে ভুলব না। কারণ লাখ লাখ শহীদ প্রাণ দিয়েছে, ২ লাখের ওপর মা-বোন ইজ্জত দিয়েছে। সেই ইজ্জতহরণকারীদের, বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারীরা ক্ষমতার সঙ্গে অনেকে ছিলেন। অনেকে বিরোধীদলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আমরা '৭১ কে পুরো না ভুললেও তার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পারিনি। যেখানে দু'সপ্তাহব্যাপী বা ১০ই অক্টোবর থেকে ধরলে আড়াই মাসব্যাপী গণআন্দোলনে একশ'র মত শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই অভূতপূর্ব বিজয় স্বাধীনতা অর্জনের মতই মুক্তির দিশারী।

অথচ এই মুহূর্তেই অনেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোট সম্পর্কে মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। স্বাধীনতাবিরোধী একটি রাজনৈতিক দলের সামনে তারা বলতে শুরু করেছেন যে, এখনও সেই একদলীয় শাসনের দর্শন রয়েছে। কিন্তু সে কথাটা '৭১-এর স্বাধীনতাবিরোধী দর্শন যারা পোষণ করে তাদের কাছে বলার অর্থটা কি দাঁড়ায়? সুতরাং এই বিজয়ের বিরুদ্ধে মিত্রবেশী অন্তর্ঘাত কি সূচনা হয়নি? তিনজোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যকে ধরনের সুহৃদদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কথা বলেছে, অথচ তাদের কেউ কেউ জোটের বাইরে এসে ইতিমধ্যেই মূল লক্ষ্য থেকে সরে আসতে শুরু করেছে। যেমন জাতীয় সরকার গঠনের দাবী। তেমনি স্বাধীনতার পরই স্বৈরশাসন শুরু হয়েছিল, তবে মাঝখানে কিছুদিন দেশ তা থেকে মুক্ত ছিল বলে কোন কোন বুদ্ধিজীবীর মন্তব্য। এগুলোর সঙ্গে যখন বিজয় মিছিলে ঘাতকের পদধ্বনি শুনি তখন শংকা হয়, এটা অমূলক বলে কেউ উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে দুর্বলতা তো একদিনে মুছে ফেলার মত নয়।

যারা এই মধ্যবর্তীকালীন সময়ে প্যান্ডোরার বাক্সের মত সকল দাবী-দাওয়ার বাক্সটা খুলে দেন, তখন ভরসা করার জন্য তো আবার তরুণদের প্রতিই তাকাতে হয়। তারা এসবের প্রতি নজর রেখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী পর্যায়ের কাজ এগিয়ে নেবে। আমাদের এই দ্বিতীয় বিজয়কে এখনই আঁতুরঘরে গলা টিপে মারার চেষ্টা হচ্ছে। এটা হতাশার কথা নয়। নতুবা ৯ বছরের স্বৈরশাসনের প্রশ্নটা এড়িয়ে স্বাধীনতার পর থেকেই স্বৈরশাসনের তত্ত্ব কেন ঘাতকদের সমাবেশে তোলা হয়, তা কি নিছকই সরলতা?

এদেশের মানুষ বার বার রক্ত দিয়েছে। আমাদের ইতিহাসের বিচিত্র গতি কিভাবে ভুলে যাব। কিন্তু একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি। একই ধরনের প্রচারণা যখন একটি বিশেষ মহল থেকে বার বার ওঠে তখন স্পষ্ট হওয়া ভালো কোন মূল্যবোধ নিয়ে আমাদের তরুণরা প্রাণ দিয়েছে। সে কি ঘাতকের দরবারে গিয়ে স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করেছে তাদের সমালোচনা করার জন্য এত রক্তপাত, এত লড়াই? এবারও রাজপথে শহীদের রক্ত ঝরেছে। তারপরও এক ধরনের বাম রাজনীতির ধারকরা সেই একই কথা বার বার ঘুরেফিরে বলছেন। কিন্তু তারা কী জানেন না বাংলাদেশের দুরন্ত যৌবন তার পথ চিনে নিতে ভুল করে না কখনও। কোন রকম ছলচাতুরী বা বাক-চাতুর্য দিয়ে তাদের ভুল বুঝানো সম্ভব নয়।

তবে এ ধরনের প্রচারণা বার বার আবর্ত সৃষ্টি করে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয় মানেই তো সব কিছু তার পর ছিমছামভাবে চলবে, এমন দাবী কেউ করে না। গণতন্ত্র অনুশীলনের ক্ষেত্রে কিছু মূল্যবোধকে স্বকীয় করে নিয়েই অগ্রসর হতে হয়। একই সঙ্গে কিছু দায়িত্ব বহনের অঙ্গীকার নিতে হয়। মত প্রকাশকে টাট্টু ঘোড়ার মত লাগামছাড়া করা চলে না। কিন্তু তারপরেও কথা থেকে যায়।

ট্রয়ের যুদ্ধের পর ঈনিয়াস তার বৃদ্ধ পিতাকে কাঁধে করে যাত্রা করেছিল সুদূর দেশে। তারই মতো আমরা অতীতকে ইচ্ছে করলেই ঝেড়ে ফেলতে পারি না। তাই তিন জোটের অন্তর্গত রাজনৈতিক

দলগুলোকে আরও বেশী বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে তাদের একক বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে। শুধু বিপক্ষ শিবিরের চক্রান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ক্ষান্ত হলে চলবে না।[২০৬]

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সংবাদে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরিতে অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। আতিউর রহমানের লেখা এই নিবন্ধের শিরোনাম ছিল: 'গণআন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি ও উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা'। এতে লেখা হয়:

ক. প্রতিটি গণআন্দোলনের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল:

এদেশের প্রতিটি বড় আন্দোলনের গতির সাথে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার তীব্রতার একটি সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাহ্যত একটি সাংস্কৃতিক ঘটনা মনে হলেও এর শেকড় প্রোথিত ছিল ঐ সময়ের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও অস্থিরতায়। আটচল্লিশ-বায়ান্ন পর্বে খাদ্যাভাব, শিক্ষা সংকট, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বেকারত্ব, ব্যবসায় মন্দা ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনৈতিক কার্যকারণ মানুষকে তাতিয়ে রেখেছিল। তাই ভাষার প্রশ্নে একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং ছাত্রদের ওপর আচমকা আঘাতে ক্ষণিকেই সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের সে ক্ষোভের আরো সুস্পষ্ট প্রতিফলন পড়ে চুয়ান্নর নির্বাচনে। এ দেশের সাধারণ মানুষ নীরবে তাদের আর্থ-সামাজিক দুঃখ-দুর্দশার কারণে দানা বেঁধে ওঠা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ব্যালটের মাধ্যমে। কিন্তু তাদের ভালভাবে খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকার সে আকাঙ্ক্ষা নির্বাচন উত্তর অস্থির সময়ে অভিজন রাজনৈতিক কাঠামোতে আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্রে পূরণ হয়নি। সেই বঞ্চনার ক্ষোভ তাদের মনে তুষের আগুনের মতো জ্বলেছে দীর্ঘদিন। তাই সুযোগ পেলেই আবার তাদের ক্ষোভ জ্বলে উঠেছে। ঊনসত্তরে তাদের শোষণ-বঞ্চনার কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। এদেশের কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত তাই পরিবর্তনের দাবীতে সোচ্চার হতে শুরু করে।

গ্রামে-গঞ্জে তাদের প্রতিবাদী পদচারণা এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ছাত্ররাই প্রথমে তাদের এই প্রতিবাদের উৎসে নাড়া দেয়। এরই ফলে তৈরী হয় একাত্তরের পটভূমি। একাত্তরে তাই এদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে অর্থনীতিতে, সমাজে ও রাজনীতিতে করে আমূল পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায়। তাদের পরিবর্তনের, উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি না হলেও মোটামুটিভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের 'সংবিধানে'। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য দূর করে

অনগ্রসর মানুষকে শোষণমুক্ত করার অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ আছে ১৪নং ধারায়, গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূর করে গতিময় গ্রামীণজীবন ব্যবস্থা গড়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ১৬নং ধারায়, মানুষে মানুষে বিভেদ দূর করার কথা বলা আছে ১৯নং ধারায়। আরো বলা আছে, জাতীয় জীবনে মেয়েদের অংশগ্রহণের কথা, দেশ পরিচালনায় সাধারণ মানুষের অধিকারের কথা।

কিন্তু সংবিধানে উচ্চকিত সাধারণ মানুষের সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সামান্য জাতীয় প্রাপ্তি (গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা, বাঙালী জাতীয়তা, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় পরিকল্পনা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের আকাঙ্ক্ষা) খুব দ্রুতই উবে যায়। দ্রুতই জাতির গর্ববোধ, অন্তর্নিহিত শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য নিঃশেষিত হতে থাকে। তারুণ্যের সৃজনশীলতা, কৃষকের উৎপাদনশীলতা এবং শ্রমিকের দক্ষতার ব্যবহারের এক সুবর্ণ সুযোগ আমরা হারিয়েছি। অবশেষে দেশ পড়ে এক চরম দুর্বিপাকে। জবাবদিহিবিহীন এক রাষ্ট্রীয় প্রবঞ্চনায় মানুষ হয়ে পড়ে দিশেহারা। দেশের অর্থনীতি কুক্ষিগত হয়ে পড়ে একদল মানুষের কাছে যারা প্রাতিষ্ঠানিকতায় বিশ্বাস করে না, বিদেশী সাহায্যের যারা সুবিধাভোগী, শিল্পায়নের চেয়ে যারা চোরাচালানে বেশী উৎসাহী। মুষ্টিমেয় এই মানুষের আকাশছোঁয়া ভোগের আকাঙ্ক্ষায় এক সময় ধরা পড়ল যে, এদেশটির উন্নয়ন তো দূরের কথা নিত্যদিনের প্রশাসনিক খরচ মেটানোর মতো রাজস্ব আয়ও তারা করতে পারছে না। বিদেশী সাহায্য অপচয় হচ্ছে অনুৎপাদক খাতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে গেছে। শিল্পঋণ নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ তা আর ফেরত দিচ্ছে না। দুর্যোগে দুঃসময়ে অর্থনীতির দগদগে ঘা আরও বেশী করে চোখে পড়তে লাগল। ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার পথে। মেধা ও অর্থ দুই-ই পালাচ্ছে দেশ ছেড়ে। এমনি এক সময়ে এল ১৯৮৯-৯০-এর বাজেট। তার পরে এল উপসাগরীয় সংকট। হঠাৎ করেই শুরু হল দেশবাসীর জন্য 'কৃচ্ছ্রনীতি'। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করল। অনিশ্চয়তা নিরাপত্তাহীনতা এদেশের শিল্পায়নের মূলে আঘাত হানল। কতিপয় ব্যবসায়ী ও ক্ষমতাবান মানুষ মজুতদারি ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ মানুষের জীবন চলার সকল পথ রুদ্ধ করতে চাইল। বেঁচে থাকার সংগ্রামে মানুষ যখন দিশেহারা তখনই তারা দেখতে পায় কতিপয়ের আকাঙ্ক্ষিত মেদবৃদ্ধি ও আস্ফালন। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির দুর্বলতর দিকসমূহ লিপিবদ্ধ করা যায়।

খ.বাংলাদেশের অর্থনীতি: সংকটের চিহ্নসমূহ

১. শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ গড়ে প্রতিবছর মাত্র আড়াই হাজার টাকা আয় করে। তাদের দৈনিক আয় মাত্র সাত টাকারও সামান্য কম।

২. চতুর্থ পরিকল্পনার মতে, গ্রামের শতকরা ৫১ ভাগ মানুষ এবং শহরের ৬৫ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যরেখার নীচে।

৩. বিআইডিএস'র একটি জরিপের মতে, শতকরা ৬০ ভাগ গ্রামীণ মানুষ দারিদ্র্যরেখার নীচে। শতকরা ১০ ভাগ মানুষের চালচুলো কিছুই নেই। তারা ভাসমান মানুষ।

৪. ষাটের দশকে প্রতিদিন একজন গ্রামীণ শ্রমিক যে আয় করত, বর্তমানে একজন শ্রমিক তার মাত্র তিন-চতুর্থাংশ আয় করে। শহরের একজন শ্রমিকের প্রকৃত আয় ঐ সময়ে কমেছে শতকরা ৩৩ ভাগ।

৫. অকৃষি খাতে কাজের সুযোগ বাড়ছে না। শিল্পায়নের গতি থেমে আছে। কৃষিতে প্রবৃদ্ধিও এমন আহামরি নয় যে, প্রতিবছর যে হারে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে তাদের সবাইকে নিয়োগ করা সম্ভব।

৬. শ্রমের চাহিদা না বাড়ার কারণে মজুরি কমছে। কমছে ক্রয়ক্ষমতা। ছোট হচ্ছে বাজারের পরিধি। এর কুপ্রভাব পড়ছে শিল্পে, ব্যবসায়।

৭. মানুষের বেঁচে থাকাই যেখানে বড় সমস্যা, সেখানে সঞ্চয়, বিনিয়োগ না হবারই কথা। এর ওপর আছে নিরাপত্তার অভাব, অঙ্গীকারাবদ্ধ উদ্যোক্তা শ্রেণীর অনুপস্থিতি।

৮. মানুষ ভবিষ্যতের কথা ভাববার সুযোগই পাচ্ছে না। তাছাড়া মুষ্টিমেয় অংশের সম্পদায়নের মাত্রা এমন প্রবল যে, সাধারণের ঐতিহ্যবাহী সম্পদভাণ্ডারেও (যেমন মুক্ত জলাশয়, বনজংগল, সাগর) অশুভ হাত পড়ছে। মানুষ তাদের চিরায়ত প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে দারিদ্র্য আরো বাড়ছে। আর বাড়ছে মানুষের নিরাপত্তাহীনতা, মর্যাদাহীনতা এবং সহিংসতা। সমাজের দুর্বলতর অংশ, বিশেষ করে নারী ও শিশু আরো বেশী অসহায় হয়ে পড়েছে।

৯. জীবনযাত্রার মানের প্রায় সব নির্দেশকই পড়ন্ত। পুষ্টির মাত্রা কমেছে। এখনও শতকরা ৪২ ভাগ শিশু প্রাথমিক স্কুলে যায় না। ৬৭% মানুষ কোন সরকারী স্বাস্থ্য সুবিধে পায় না। সাড়ে পাঁচ হাজার রোগীর জন্যে ১ জন মাত্র ডাক্তার রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয়ের অনুপাত ৩.৮%।

১০. মানব সম্পদ উন্নয়নে সরকার মোট জিডিপি'র মাত্র ২.৪% ব্যয় করে।

১১. মোট সরকারী ব্যয়ের শতকরা মাত্র ১১.২ ভাগ ব্যয় হয় শিক্ষা খাতে (উন্নয়নশীল দেশের গড় ব্যয় ১৪.৭%)।

১২. গত অর্থবছরে একজন দরিদ্র মানুষ মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে সরকারী খরচের ভাগ পেয়েছে মাত্র ১৯০ টাকা (ধনীর ভাগে পড়েছে ৭৮২ টাকা)। শিক্ষাখাতে দারিদ্র্যরেখার নীচের একজন মানুষের জন্য গড় বরাদ্দ ছিল মাত্র ১২ টাকা।

১৩. অনুৎপাদনশীল খাতে লাগামহীন খরচ বেড়ে যাবার কারণে ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে আর্থিক শৃংখলা মারাত্মকভাবে লংঘিত হয়। ঐ অর্থবছরে সরকার প্রতি একশ' টাকা রাজস্ব আয়ের বিপরীতে ১০৬ টাকা রাজস্ব ব্যয় করেছে। অর্থাৎ উন্নয়ন বাজেট থেকে টাকা এনে প্রতিদিনের খরচ পোষানো হয়েছে। ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

১৪. বন্যা ও উপসাগরীয় সংকট উপরের এসব দুর্বলতাগুলোকে আরো বেশী সংকটাপন্ন করেছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেছে এবং তারা এখন বেঁচে থাকার লড়াইয়ে প্রাণান্ত।

এমন একটি নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল একটি সামগ্রিক সামাজিক সমঝোতার। প্রয়োজন ছিল যাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাদের পক্ষ থেকে অধিক হারে কৃচ্ছ্রতা সাধনের। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে উল্টো ঘটনা। বরং সংকটের সুযোগ নিয়েছে সুবিধভোগী গোষ্ঠী। বাসভাড়া, জ্বালানি তেলের দাম, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে আরো সংকটাপন্ন করে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাবানদের লাগামহীন অর্থ অপচয় ও বিলাসী ভোগের ওপর কার্যত কোন নিয়ন্ত্রণই আরোপ করা হয়নি।

ফলে জনজীবনে সৃষ্টি হয়েছে গভীর এক হতাশা। আর সেজন্যেই মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিবর্তনবাদী হয়ে পড়ে। তার মানে চলমান আন্দোলনের রয়েছে সুদৃঢ় এক অর্থনৈতিক ভিত্তি।

গ. অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা:

আর সেজন্যেই এবারে আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও উত্তাপ এতটা গভীর এবং তীব্র। এবং পরিবর্তন এত দ্রুত ও নাটকীয়। ছাত্ররা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধেও তারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং স্বাধীন দেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনে যোগ দিয়েছিলেন।

দেশের দুঃসময়ে এদেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের মধ্যে পদচারণা অনুপস্থিত কেন- এ প্রশ্ন যে কেউ তুলতে পারেন। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ভূমিকা কি কয়েকটি সেমিনার-সম্মেলনের মধ্যেই সীমিত রাখার কথা? এদেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা অর্থনীতিবিদদের লেখায় ও বলায় কী এমন সংকটকালে উচ্চারিত হতে পারে না? আগামীদিনের উন্নয়নের রূপরেখা, গণআকাঙ্ক্ষার কথা কি তারা তুলে ধরতে পারেন না? নাকি, অন্য দশজন সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষের মতো এ দেশের অর্থনীতিবিদরাও কী বিদেশী সাহায্যের উচ্ছিষ্টভোগী হবার কারণে এমন ম্রিয়মাণ। তারাও কি তাহলে সুবিধে 'লেনদেন প্রক্রিয়ায়' শামিল হয়ে গেছেন বলে পুরনো ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হতে অনিচ্ছুক?

কিন্তু কেন? নিঃসন্দেহে উত্তর খুঁজতে হবে রেহমান সোবহানের সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণের মধ্যে:

ইনডেন্টিং ব্যবসা, ডিএফআই ঋণগ্রহীতা, বড় ঠিকাদার এবং পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপরতলায়- গুটিকতক সুবিধাভোগী বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থা থেকে অকল্পনীয় সম্পদ গড়ে তুলেছে। ঠিকাদার এবং পরামর্শদাতাদের (কনসালটেন্টস) ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য থেকে অর্জিত আয় বৈধ সার্ভিস থেকেই আসে। তবে কাজের বিধিবদ্ধতা এবং গুণগত মানের হেরফের করে এই শ্রেণীভুক্ত লোক সাহায্য বাজেট থেকে রেকর্ডবিহীন বখরা হাতিয়ে নেয়।

এই নতুন কর্পোরেট এলিটরা এই সম্পদকে বাড়তি সম্পদ সৃষ্টি এবং বর্ধিত পুনরুৎপাদনে কতটুকু কাজে লাগিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশ্নসাপেক্ষ। বিদেশে পুঁজি পাচার, দৃষ্টিকটু ভোগ, উৎপাদন ক্ষমতার অপর্যাপ্ত ব্যবহার, উদ্বৃত্ত এবং পুনর্বিনিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিম্নহার, ডিএফআই এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কাছে প্রভূত পরিমাণ অপরিশোধিত ঋণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর সুবিধার জন্য লড়ছে।

আবার মর্যাদার সাথে এসব চাহিদা মেটাতেও তারা আগ্রহী। পরের মুখাপেক্ষী থাকা, পরাধীনতার বেদনা না খেয়ে থাকার কষ্টের চেয়ে কম নয়। একই সঙ্গে তাই মানুষ চাইছে স্বাধীনতা। কথা বলার স্বাধীনতা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, তথ্য ভাণ্ডারে প্রবেশের স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার পাবার স্বাধীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার স্বাধীনতা আজকের দিনে উন্নয়নের ন্যূনতম পূর্বশর্ত। কেননা স্বাধীনতা থাকলে নিজের অধিকারের কথা যেমন বলা যায় আবার স্বাধীনতা নিজেই একটি মৌলিক চাহিদা। মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য অনেক কিছু ত্যাগে প্রস্তুত থাকে। স্বাধীনতার জন্যে চাই সক্ষমতা এবং নিজের জীবনের ওপর অধিকার। বিপন্নতার মোকাবেলার জন্য আত্মশক্তিই প্রতিটি মানুষের মূল আকাঙ্ক্ষা। সংকটে একাধিক পথ বেছে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় মানুষ। এ ধারার উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার পূর্বশর্তই হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্রের যার একটি সুদৃঢ় সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এ রাষ্ট্রের কিছু মৌলিক নীতিমালা থাকবে যার শৃংখলা দলীয় ও গোষ্ঠীস্বার্থে লংঘিত হবে না। প্রাতিষ্ঠানিকতাই হবে সেখানে মুখ্য। ব্যক্তিবিশেষ গোষ্ঠীবিশেষ এখানে গৌণ।

এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরীর আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়েই মানুষ আজ লড়ছে। আর এর মধ্যেই খুঁজতে হবে চলমান আন্দোলনের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের রূপরেখা। আর এখানেই অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের বিরাট ভূমিকা। সাধারণ মানুষের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাকে রাজনৈতিক বিতর্কে স্থান করে দেবার নৈতিক দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। আগেও বলেছি এখনও বলছি বর্তমান

সময়কে সদ্ব্যবহার করতে পারলে, মানুষের চেতনার মানকে উন্নত করতে পারলে হয়তো বা সাধারণ মানুষের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের আরেকটি সুযোগ হাতছাড়া নাও হতে পারে।[২০৭]

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর সংবাদে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় সম্পর্কে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই উপসম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের পর নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আবার গণতন্ত্র চর্চা শুরু করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্রের চর্চা দৃঢ়মূল করার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারের নয়। রাজনৈতিক দল ও জোটসহ সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত ভূমিকার মধ্য দিয়েই দৃঢ়মূল হবে গণতন্ত্রের শিকড়। অজয় রায়ের লেখা এই উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: ' স্বৈরশাসনের ক্ষত নিরাময় করতে হলে–'। এতে লেখা হয়:

বিগত ২৮শে নভেম্বর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহ এ দেশের প্রতিটি মানুষকে যেমন আলোড়িত করেছে, তেমনি আমাকেও। সান্ধ্য-আইন ও জরুরী অবস্থার রক্তচক্ষু, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীর উদ্যত হত্যাযজ্ঞ সঙ্গীন, জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাতে বদ্ধপরিকর সরকারের সদম্ভ ঘোষণাসমূহ উপেক্ষা, ঢাকাসহ সারা দেশে লাখ জনতার দৃপ্ত পদচারণা ও প্রতিরোধ, অগণিত মৃত্যুকে উপেক্ষা করে জনতার অগ্রাভিযান ও তার পরিণতিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সাতদিনের মধ্যে এরশাদ সাহেবের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা, রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোর মনোনীত প্রার্থীকে করে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে স্বীকৃতি ও সর্বশেষ দেশের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, রাজধানীসহ সারা দেশের রাস্তায় রাস্তায় লাখ জনতার বিজয়োল্লাস প্রভৃতি একটা সত্যই আবার প্রমাণ করে তা হলো aweful majesty of the people অপ্রতিরোধ্য। স্বৈরাচার যতই হোক জাগ্রত রক্তচক্ষু জনতার অগ্রযাত্রার সামনে তা ভেসে যেতে বাধ্য। আমাদের দেশেও সে কথাটি প্রমাণিত হলো আবার।

এর আগে মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে জাতীয় অগ্রযাত্রার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তা ব্যাহত হয়। পঁচাত্তরের রক্তাক্ত পটপরিবর্তন, বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর থেকে যে বিপরীত স্রোতধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে বিগত আট বছরে এরশাদ সরকারের আমলে তা আরও বেগবান হয়। এরশাদ সরকারের আমলে অর্থনীতি, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রশাসনিক নৈরাজ্য, দুর্নীতি, ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায়, মুষ্টিমেয়র লুটপাট প্রভৃতি দেশকে বিপর্যয়কর অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশ যখন এক নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে তখন অবশ্য অতীতের ঘটনাবলীর কাসুন্দি ঘাটার বদলে দারিদ্র্য-অনাহার, অশিক্ষা, পশ্চাৎপদতার যে বিষচক্র দেশে সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠাটাই মূল কথা। বলার অপেক্ষা রাখে না অতীতের জের কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত রাজনৈতিক কাঠামো এবং সে কাঠামো হলো গণতন্ত্রের। দেশবাসী গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন দীর্ঘকাল। কিন্তু এখন পর্যন্ত দেশে গণতান্ত্রিক ধারা দৃঢ়মূল হতে পারেনি নানা কারণেই। বর্তমানে আবার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য এখানেই।

গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্যই নির্বাচিত ও জবাবদিহিমূলক সরকারের ধারা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আগামী তিন মাস সেজন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনের ধারা অবসান ও সার্বভৌম সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রতিষ্ঠিত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকাও সে কারণেই বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক বলেই উল্লেখিত হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন। সেজন্য আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল করে আনার আহ্বান নতুন রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন। গণতন্ত্রের পথে অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার মতো শক্তির অভাব এ দেশে নেই। কাজেই শুধু সরকার নয়, সমস্ত জাতি ও আন্দোলনকারী শক্তিসমূহকেও দায়িত্ব নিতে হবে এ ব্যাপারে।

গণতন্ত্রের উপযোগী প্রশাসনের ধরন আমাদের দেশে কি হবে তা নির্ধারণের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপার। কিন্তু শান্তিপূর্ণ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য এখনই উদ্দীপিত করতে হবে প্রশাসনকে। বিগত আট বছর দেশে যে স্বেচ্ছাচার চলেছে তাতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে প্রশাসনকে। যথেচ্ছভাবে উপেক্ষিত হয়েছে বিদ্যমান প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন। প্রশাসনকে পরিণত করা হয়েছে সরকারী চক্র ও তাদের পেটোয়া বাহিনীর অসহায় দর্শকে। এবার গণতন্ত্রের দাবীতে আন্দোলনে প্রশাসনের বিভিন্ন অংশ শরীক হয়েছেন নানাভাবে। এটাই প্রমাণ করে দীর্ঘকালীন অপচেষ্টা সত্ত্বেও বর্তমান প্রশাসনকে সাধারণভাবে সম্ভব হয়নি স্বৈরাচারের সোৎসাহী সহযোগীতে পরিণত করা। আর তাই উপযুক্তভাবে উদ্যোগ নিলে বিদ্যমান প্রশাসনকে দিয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব। যত প্রভাবশালীই হোক না কেন, কোন মহল যাতে প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। এ ব্যাপারে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহেরও নিতে হবে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও ভূমিকা।

এরশাদী স্বেচ্ছাচার দেশের অর্থনীতিকে যে বিপর্যয়কর পর্যায়ে নিয়ে এসেছে সে অবস্থা কাটিয়ে উঠে অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের সূচনার জন্য কি নীতি ও পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা দরকার তা নির্ণয়ের দায়িত্ব ভবিষ্যৎ নির্বাচিত সরকারের। তবে একদিকে এরশাদী স্বেচ্ছাচার, তার পেটোয়াদের যথেচ্ছ লুটপাট, অন্যদিকে বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য সংকট, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিকে যে পর্যায়ে নিয়ে এসেছে তাতে সবকিছু ভবিষ্যতের জন্য মুলতবি করে রাখা সম্ভব হবে না।

এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ নির্বাচিত সরকারের হাত-পা না বেঁধে কতটুকু এবং কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায় সে ব্যাপারে ভাবতে হবে বর্তমান সরকারকে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনজীবনের অন্যতম মুখ্য ও পীড়াদায়ক সমস্যা। নতুন ধান উঠতে শুরু করেছে। তাছাড়া আগামীতে অল্পদিনের ব্যবধানেই শীতকালীন ধান ও গমের চাষ শুরু হবে। সে সময় সমস্যা সৃষ্টি করবে ডিজেল ও সারের চড়া দাম। এই অবস্থায় পরিবহন ব্যবস্থার যথাসম্ভব সুচারু পরিচালন নিশ্চিত করে দেশের সর্বত্র দ্রব্যমূল্য যাতে মোটামুটি একই পর্যায়ে থাকে তা যেমন নিশ্চিত করতে হবে, তেমনি আগামী ফসল যাতে কৃষকরা যথাযথভাবে বপন করতে পারে তার ব্যবস্থাও বর্তমান সরকারকেই করতে হবে। কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নয়। তবে অর্থনীতির বিধি-বিধান বহির্ভূতভাবে স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লুটেরার লুটপাটের যে সুযোগ অতীতে করে দেয়া হয়েছে তা ব্যাংক ঋণই হোক বা অন্য ক্ষেত্রেই হোক তা যাতে বন্ধ হয় এবং অর্থনীতিক বিধি-বিধান যাতে অনুসৃত হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে বর্তমান সরকারকেই। তাছাড়াও অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটানোর উদ্দেশ্যে উৎপাদনের পথে অন্তরায়সমূহ এই মুহূর্তে কতটুকু দূর করা যায় তাও ভাবতে হবে সরকারকে।

অনাহারক্লিষ্ট, নিরন্ন জনগণের জীবনের পর্বতপ্রমাণ সমস্যাসমূহ লাঘবের জন্য বর্তমান অবস্থাতেও কি পদক্ষেপ নেয়া যায় সে বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত তার ফিরিস্তি দাখিল করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই বিষয়ে যে দু'একটি কথা বলতে চেষ্টা করেছি তার উদ্দেশ্য হল ইতিহাস সৃষ্টিকারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে তা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা। পরিস্থিতি ঘোলাটে করার মতো শক্তির অভাব এ দেশে নেই। পেছনে ঠেলে দেবার ষড়যন্ত্রও অব্যাহত থাকবে। আর এটা মনে রেখেই আগামীদিনের প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে হিসেব করে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কোন স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়, সেজন্য প্রয়োজন সচেতন প্রচেষ্টার। তাছাড়া গণতন্ত্র কোন একমাত্রিক ধারণাও নয়। তার

তাৎপর্য বহুমাত্রিক। সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও পর্যায়ে তার প্রভাব বিস্তৃত না হলে কোন সময়ই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বা জীবনবোধ দৃঢ়মূল হতে পারে না। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র শিকড় গেড়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। কথাটা অসত্যও নয়। রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সেখানে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হয় না, হয় সংসদীয় পদ্ধতিতে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও গণতন্ত্রের সঙ্কট কি সে দেশে নেই? ব্যাপারটা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের চর্চা কোন সময়ই ধারাবাহিকভাবে হতে পারেনি। বার বারই তা ব্যাহত করা হয়েছে।

আর এ কারণেই এখানে গণতন্ত্রের পথ উন্মোচনের এই সন্ধিক্ষণে সচেতন উপাদানের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। যে গণতান্ত্রিক দল যতবেশী ক্ষমতাবান তাদের ততবেশী দায়িত্বশীল হতে হবে বর্তমান মুহূর্তে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমরা হতে দিতে পারি না। আর এ জন্যেই গণতন্ত্রকে দৃঢ়মূল করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন এরশাদ হটাও আন্দোলনের সাফল্যের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়নি। গণতান্ত্রিক ইন্সটিটিউশনসমূহ বিগত বছরগুলোতে ধ্বংস করা হয়েছে। বর্তমানে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এজন্যে নিম্নতম কতকগুলো বিষয়ে আজ ঐকমত্য প্রয়োজন দেশপ্রেমিক-গণতান্ত্রিক দলসমূহের মধ্যে। নিজ নিজ রাজনৈতিক অবস্থান বজায় রেখেও এটা সম্ভব।

গণতান্ত্রিক জীবনবোধ গণতন্ত্রের চর্চা দৃঢ়মূল করার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারের নয়। এটি একটি সামগ্রিক সামাজিক প্রক্রিয়া। এবারের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াও আগুয়ান ছিলেন সমাজের বিভিন্নস্তরের জনগণ। বুদ্ধিজীবীরাও পালন করেছেন এক গৌরবদীপ্ত ভূমিকা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রাথমিক বিজয়ের পর এই ধারাকে আরও এগিয়ে নেবার জন্যই বর্তমানে এবং আগামীতে নির্বাচনের পরেও এই শক্তিগুলোর নিতে হবে নিকট অতীতের মতোই দৃঢ়চিত্ত ভূমিকা।

এভাবে সরকারী-বেসরকারী, সমাজের রাজনৈতিক দল বিভিন্নস্তরের ভূমিকার মধ্য দিয়েই দৃঢ়মূল হবে গণতন্ত্রের শিকড়।

পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র্য, অবক্ষয় কাটিয়ে উঠার যে সুযোগ স্বাধীনতার পরে পুনরায় আমাদের হাতে এসেছে তা আমরা হাতছাড়া হতে দিতে পারি না। সফল আমাদের হতেই হবে। ব্যর্থতার কোন সুযোগ বা অবকাশ নেই।[২০৮]

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর সংবাদে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় সম্পর্কে আরেকটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। 'কারাগারে

সাতদিন' শিরোনামের এই উপসম্পাদকীয়তে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের আমলে সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্তদের উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আবদুল কাইয়ুম মুকুলের লেখা এই উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> প্রায় ছয়ফুট লম্বা ছিপছিপে গড়ন, রুক্ষ চেহারার ভদ্রলোক হঠাৎ দু'হাত উপরে তুলে আর্তচিৎকার করে উঠলেন-আমি পড়লাম, আমাকে বাঁচাও। তার পরই ধপাস করে মেঝেতে পড়লেন। সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি তখনও গোঙানির শব্দে বলে চলেছেন, আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে খামোখাই ধরে এনেছে। আমার পরিবার, ছেলেমেয়ে সব না খেয়ে মরে যাবে।
>
> মাত্র কয়েক মিনিট আগে এই ভদ্রলোককে নতুন এক চালানের সাথে গলা ধাক্কা দিয়ে এই ছোট কুঠুরিতে ঢোকানো হয়েছে। তার পরনে ছেঁড়া পাঞ্জাবি, ছেঁড়া পায়জামা। পায়ে এক পাটি স্যান্ডেল। কারফিউ ভাঙ্গার অপরাধে রাস্তা থেকে তাকে ধরে আনার সময় স্যান্ডেলের অপর পাটি খোয়া গেছে। খোয়া যাওয়া স্যান্ডেলটা তুলে আনার সময়টুকুও দেয়া হয়নি। বরং পিটুনি খেতে হয়েছে। কুঠুরিতে ঢোকার পরই ভদ্রলোক ঘরময় একটা চক্কর দেন। ইতিমধ্যে কারফিউ ভাঙ্গা 'অপরাধীদের' সংখ্যা প্রায় শ'-এর কাছাকাছি। সেদিন ২৮শে নভেম্বর। জরুরী আইন জারির পরদিন। দুপুর প্রায় ১২টা। রাজধানীর এক থানা হাজতে চালানের পর চালান এনে ভরা হচ্ছে। ভদ্রলোকের চালচলন দেখে আমরা সবাই বলাবলি করতে থাকি ওনার হয়তো মাথার ব্যারাম আছে। প্রত্যুত্তরে তিনি বেশ পরিষ্কার গলায় জানান– আমি একজন হকার। আমাকে রাস্তার পাশ থেকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। অমানুষিক মারপিট করা হয়েছে। তার পরই তার সটান হয়ে পড়া। আমরা সবাই ধরাধরি করে ওনাকে উঠিয়ে বসাবার চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে থানা কর্মকর্তাদের সদয় দৃষ্টি কিভাবে যেন আকৃষ্ট হয়েছে। তালা খুলে তাকে বের করে নেয়া হয় এবং ছেড়ে দেয়া হয়। হয়তো এ কারণে যে, থানা হাজতে যদি তার কোন কারণে মৃত্যু হয়– তাহলে নানা ঝামেলার ভয়।
>
> কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রম। অনেককে রাস্তা থেকে ধরার সময় আচ্ছাসে পিটিয়ে আনা হয়েছে। অবশ্য অনেককে প্রাথমিক চিকিৎসার সামান্য ব্যবস্থা করা হয়। অনেককে আনা হয়েছে যারা একেবারেই বালক বা কিশোর। কারফিউ আগেও হয়েছে। মানুষ চলাফেরাও করেছে। কিন্তু সেদিন দলে দলে ধরা হয়।
>
> এই বাড়াবাড়ি নির্যাতন নিয়েই কথা। কেউ আইন ভাঙলে বা অপরাধ করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতে তার বিচার হবে।

> দোষী প্রমাণিত হলে তার সাজা হবে। বিচারকের রায় অনুযায়ী তাকে সাজা ভোগ করতে হবে। কিন্তু গ্রেফতার করেই পেটানোর আইন এল কোথা থেকে?
>
> ২৭শে নভেম্বর গভীর রাতে আমাকে যখন বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়, আমি ওদের জানিয়েছি– আমি একজন সাংবাদিক। রাজনীতির সাথে কিছু যোগাযোগ থাকলেও সেটা এমন নয় যে আমাকে 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার' কারণে গ্রেফতার করতে হবে। কিন্তু ওরা জানায়, উপর থেকে লিস্ট এসেছে। রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হওয়ায় শারীরিক নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে। কিছু আদর-যত্নও করা হয়েছে। 'রাজবন্দীর' মর্যাদা বলতে এটুকুই এখন অবশিষ্ট আছে। জেলখানায়ও দেখেছি এর বেশী কিছু নেই।
>
> পুলিশেরও কথা আছে অবশ্য। সাধারণ পুলিশ তো হুকুমের দাস। উপর থেকে যা নির্দেশ আসে সেটাই তাদের কার্যকর করতে হয়। ওদের কথা হল, কারফিউ জারি করে দিনরাত তাদের খাটানো হচ্ছে। বিশ্রাম নেই। তার উপর মিছিলকারীদের ইট পাটকেল। ওরা ধৈর্যের শেষসীমায়।
>
> প্রশ্নটা কোন একজন নির্দিষ্ট পুলিশ বা একটা পরিস্থিতির পরিণতি নিয়ে নয়। ব্যাপারটা প্রচলিত সিস্টেমের রেওয়াজ। থানা পুলিশ মানেই মারপিট, অত্যাচার। চলে আসছে অনাদিকাল থেকে। ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করে আলোচ্য ক্ষেত্রে কতটুকু গণতান্ত্রিক সংস্কার করা সম্ভব হবে তার উপর। স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় নির্যাতনের যে প্রবণতাগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছিল, আগামীতে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থায় তা নিশ্চয়ই নির্মূল করতে হবে। পরিবর্তনের স্বাক্ষর রাখতে হবে এ ক্ষেত্রেও। আগামী দিনে যারা গণতান্ত্রিক সরকারের কর্ণধার হবেন, তাদেরকে এ দায়িত্ব নিতে হবে।
>
> ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন রাজবন্দী বা নিরাপত্তা বন্দীদের থাকা-খাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা নেই। '৮০ সালেও দেখেছি একটা 'সিকিউরিটি ওয়ার্ড' ছিল। এখন নেই। এখন সবাই বিচারাধীন আসামীর 'সম্মানে' আপ্যায়িত হয়। অথচ বৃটিশ, পাকিস্তানী আমলে অনেক সংগ্রাম করে জেলখানায় রাজবন্দীর মর্যাদা আদায় করা হয়েছিল। এখন সেটা উঠে গেছে। গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও হয়ত রাজবন্দী থাকবে। রাজবন্দীদের জন্য উপযুক্ত মর্যাদার ব্যবস্থা আবারও ফিরিয়ে আনা দরকার।
>
> সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের অনেক কথা, অনেক অভিযোগ। বলা হয়, সাজা দেয়ার উদ্দেশ্য অপরাধীদের সংশোধন করা। কিন্তু জেলখানার পরিবেশ তেমন নয় যে, কোন অপরাধী সংশোধিত হবার সুযোগ পাবে। তা ছাড়া বছরের পর বছর সাজা খেটে বন্দীরা সবাই শূন্য হাতে সমাজে

ফিরে আসে। তাদের পুনর্বাসনের কোন পথ খোলা থাকে না। বয়সও পেরিয়ে যায়। অনেক বন্দী বলেছেন, জেল খাটা অবস্থায় কারা প্রশাসনের অধীনে কোন কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে কিছু আয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবশ্য একটা ছোট ওয়ার্কশপ আছে। কিন্তু যারা কাজ করে তাদের বেতন দেয়া হয় না। আয়ের ব্যবস্থা থাকলে সাজাপ্রাপ্ত বন্দীরা দীর্ঘ কারাভোগের পর সৎভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ পেতে পারে। সে জন্য বন্দীদের শারীরিক ও মানসিক শ্রমভিত্তিক চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। এই দিকটি ব্যাপক কারাসংস্কারের অঙ্গ হওয়া প্রয়োজন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দী ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৩ হাজার। এখন রয়েছে প্রায় ৫ হাজার। কারা প্রশাসনের ইচ্ছা থাকলেও বন্দীদের মোটামুটি ভালভাবে রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। যে সেলে একজন বন্দীর থাকার কথা সেখানে এখন তিন/চারজনও থাকে।

সাধারণ বন্দীদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে স্রেফ মোটা ভাত, মোটা রুটি, ডাল, একদিন অন্তর ২ ছটাক মাছ/মাংস, মাঝে মাঝে মাঝে সবজি। ব্যবস্থাপনা উন্নত করার মাধ্যমে খাদ্যের মান কিছুটা বাড়ান হয়তো সম্ভব। কিন্তু আসল প্রয়োজন মাথাপিছু সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধি।

সাধারণ কয়েদীদের আত্মীয় স্বজন জেলগেটে দেখা করতে এসে একেবারে হয়রানির একশেষ হয়ে যান। দূর দূর গ্রাম থেকে এসে নিয়ম-কানুন জানতেই নাজেহাল। তারপর ছোট খুপরির লোহার গারদের এপাশে ওপাশে কয়েক মিনিট কথা হয় কি না হয়, হৈ চৈ, হুলস্থুলের মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যায়। সাক্ষাতের জায়গা আরও বড় হওয়া দরকার। অন্তত কিছু সময় যেন নিরিবিলিতে কথা বলা যায়, তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আত্মীয়স্বজনের সাথে একবার দেখা করার মূলধন নিয়েই সেই বন্দীকে আবার ছয় মাস কি একবছর নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়। এই মানবিক দিকটি বিবেচনায় নিয়ে বন্দীদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে।

অসুস্থ বন্দীদের চিকিৎসার জন্য জেলহাসপাতাল রয়েছে। বন্দীদের কথায় জানা গেছে, চিকিৎসা ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন দরকার। প্রয়োজনে ওষুধ ও চিকিৎসা অবশ্য কিছুটা পাওয়া যায়। কোন বন্দীর স্বাস্থ্যহানি ঘটলে তাদের দু'এক সপ্তাহের জন্য ডিম/দুধ/মাছ-মাংস তথা বিশেষ ডায়েটের নিয়ম ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে কৃচ্ছ্রতা সাধনের নামে কি সেই ডায়েটের নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। অথচ জেলজীবনে অসুস্থ বন্দীদের জন্য বিশেষ ডায়েটের বিধান রাখা দরকার।

কারাগারে কথা হয়েছে অনেক বন্দীর সাথে, যারা গত ৮/১০ বছর থেকে সাজা খাটছেন। তাদের অনেকের বিচার হয়েছে সামরিক আদালতে। এসব সাজাপ্রাপ্ত বন্দীর কথায় জানা গেছে, তাদের সংক্ষিপ্ত

বিচারের সময় সাক্ষী-সাবুদ, কাগজ পত্র, খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ পাওয়া যায়নি। রায়ের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে উচ্চতর আদালতে আপিল করার সুযোগ পাওয়া যায়নি। অনেকেই আশা করেন, উচ্চতর আদালতে আপিলের সুযোগ দেয়া হলে হয়তো তারা নির্দোষ প্রমাণিত হবেন বা সাজার মেয়াদ কমবে। তাদের অনেক আশা ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক সরকার তাদের সে সুযোগ দিবে।

রেডিওতে এরশাদের অবিলম্বে পদত্যাগের ঘোষণা শোনার সাথে সাথে সারা জেলময় গভীর রাতের নিস্তব্ধত ভেঙ্গে আনন্দ ধ্বনি ওঠে। সেলে সে লোহার গরাদে থালা-বাটি ঠুকে ঠুকে বন্দীরা বিজয় ধ্বনি তোলে। প্রতীক্ষিত বিজয় এসেছে জেলবন্দীরাও সেই বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করেছে মনভরে। ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে তাদের অনেক আশা প্রয়োজনীয় কারাসংস্কার-এর একটি এই আশা কি ফলবতী হবে? এর উত্তর দিবে ভবিষ্যৎ।[২০৯]

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর সংবাদে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় সম্পর্কে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই উপসম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হলেও একটি স্বৈরাচারী সরকারের ভিত ও তাদের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা সহজ নয়। সে জায়গায় একটি নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণ আরও দুরূহ কাজ। কিন্তু দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে। এর মধ্যদিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানানো হয় উপসম্পাদকীয়টিতে। মতিউর রহমানের লেখা এই উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'দ্বিতীয় গণঅভ্যুত্থান, দ্বিতীয় মুক্তির সূচনা'। এতে লেখা হয়:

পৃথিবীর দেশে দেশে একনায়কতন্ত্রের শেষ পরিণতি যা হয়; বাংলাদেশেও তাই ঘটলো। শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচার পুরোপুরিভাবে পরাস্ত হলো। ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হলো জেনারেল এরশাদকে। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দ্বিতীয়বারের জন্য ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করলো। লাখ লাখ মানুষের তীব্র গণআন্দোলন, বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের মুখে স্বৈরাচারী শাসন আর নির্যাতনের শোষণযন্ত্র ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে মানুষ, সর্বত্র মানুষ, লাখ লাখ মানুষ, বন্যার মতো মানুষ অলিগলিতে রাস্তায় রাজপথে নেমে এলো। মহান বিজয় উৎসবে মেতে উঠলো গ্রাম গঞ্জ শহর আর রাজধানী ঢাকা। হাতে মুক্তিযুদ্ধের পতাকা, বুকে ঝোলানো স্বাধীনতার নিশান আর মুখে মহান বিজয়ের শ্লোগান। নতুন প্রজন্মের যারা ঊনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান বা একাত্তুরের ষোলই

ডিসেম্বরের বিজয় দেখেননি, তারা সে দু'টি ঐতিহাসিক মুহূর্তকেই যেনো একত্রে অনুভব করলেন। আর, যারা ঊনসত্তুর বা একাত্তুরের সাফল্য দেখেছেন, তারা নতুন করে স্বাধীনতাকে ফিরে পেয়েছেন। আমরা সকলেই আবার বিজয় দেখলাম। একাত্তুরের ষোলই ডিসেম্বরের বিজয় দিবস যখন সমাগত, তখন নব্বইয়ের এই উজ্জ্বল সাফল্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমাদের জন্য।

এরশাদ সরকারের প্রায় নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চলেছে প্রায় আট বছর ধরে। তিরাশির ফেব্রুয়ারীতে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ প্রথম প্রকাশ্যে সংগ্রামী সামরিক শাসন ভঙ্গ করে গণতন্ত্রের জন্য সাহসী সংগ্রাম শুরু করেছিল। তারপর থেকে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও জোট, বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিসেবীবিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ, শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক-ক্ষেতমজুর, সাংবাদিক এবং নারী সমাজ বছরের পর বছর ধরে নানা সময়ে বিভিন্নভাবে এই পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথে এই লড়াইকে সামনে অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন। শহীদ তাজুল ইসলাম, রাজনৈতিক নেতা ময়েজ উদ্দিন, ছাত্র সেলিম ও দেলওয়ার, নূর হোসেন এবং সবশেষে ডাঃ শামসুল আলম মিলনসহ বহু শহীদের আত্মদান, শত সহস্র রাজনৈতিক কর্মীর অত্যাচার আর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে এই সংগ্রাম ক্রমশঃ তীব্র হয়েছে, ব্যাপকতা পেয়েছে। আন্দোলনকারী শক্তির মধ্যে অধিকতর সচেতনতা ও সমঝোতাও বেড়েছে পাশাপাশি।

এই বিরাট অভিজ্ঞতার পটভূমিতেই চলতি বছরের ১০ই অক্টোবর তিন জোটের অবস্থান ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা ঘটে। সেদিনই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। তার পরপরই সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃত্বে ঢাকাসহ দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। একই সাথে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের জোটবদ্ধ আন্দোলনও বেগবান হয়ে ওঠে। প্রধান রাজনৈতিক জোটগুলো রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে সমঝোতার প্রচেষ্টার পাশাপাশি একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করতে থাকে। কিন্তু এই সময়ে দেশব্যাপী জঙ্গী গণআন্দোলনে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের দৃঢ়তা ও সাহসী ভূমিকা স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে বর্শাফলকের ভূমিকা পালন করে। শেষ পর্যন্ত ১৯শে নভেম্বর তিন জোটের পক্ষ থেকে 'এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচন নয়', 'সর্বাগ্রে সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন' এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এরশাদ ও তার সরকারের পদত্যাগের মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণার পরপরই দেশের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আন্দোলন দুর্বার গতিবেগ অর্জন করে, অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। এরশাদ ও তার সরকার শেষ রক্ষার জন্য ২৭শে নভেম্বর দেশে জরুরী

অবস্থা ঘোষণা এবং ৪টি প্রধান শহরে কারফিউ আরোপ করলে ছাত্র-জনতা সঙ্গে সঙ্গেই তা অমান্য করে রাস্তায়, রাজপথে বের হয়ে আসে। সরকারের শাসনভিত তখনই ভেঙ্গে পড়ে। এরশাদ, মওদুদ এবং জাফরের একের পর এক রাজনৈতিক কৌশল, সন্ত্রাস- ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। সরকার সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে যায়। সে কথা তারা মেনে না নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমতার দম্ভ প্রদর্শন করতে থাকলেও ভেতরে ভেতরে তারা হীনবল হয়ে পড়েন। ৩রা ডিসেম্বর রাতে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে এরশাদ একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন এবং মনোনয়নের ১৫ দিন আগে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা বলেন। বিরোধীদলীয় তিন জোটের প্রস্তাব অনুযায়ী একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব মেনে নেয়ার কথাও ঘোষণা করেন। তিনি জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলেন। এরশাদ ও তার সরকার এই ঘোষণা দিয়ে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবেন ভেবেছিলেন। বলেছিলেন, তৃতীয় বিশ্বের কোন সরকার এভাবে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ায় না। সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের এটাই সর্বশেষ পন্থা। তাদের মধ্যে এই ভুল চিন্তা ছিল ছিল যে, এরশাদের ঘোষণায় বিরোধীদলগুলো সাড়া দিতে পারে। পারে। তা না হলেও অন্ততঃ দেশের মানুষের এক বড় অংশ এরশাদ সরকারের কথায় গণআন্দোলনের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে। আর, তা না হলে দেশে আবার সামরিক শাসন জারি হবে। সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য। তারা এমন প্রচারও করছিলেন যে, বিরোধীদলীয় জোটগুলোর সাথে কথা হচ্ছে। সরকারের মধ্যে এ রকম আশা-নিরাশা-দুরাশার স্বপ্ন বিরাজ করছিল শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু রাজনৈতিক দল ও জোট এবং জনগণ এরশাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তাৎক্ষণিকভাবে। ৪ঠা ডিসের সকাল থেকে ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র জনতার ঢল নামে। স্বৈরাচারের পরাজয়ের শেষ ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে। তখনও সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকের শেষ ভরসা ছিল অন্যত্র। সে জায়গাটা ছিল একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকা অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনী। এরশাদ বা তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা ভেবেছিলেন যে, তারা শেষরক্ষার জন্য হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু সেখানে ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। সেদিনই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এরশাদ এবং তার সরকার সামরিক বাহিনীর জন্য ভারী বোঝা হয়ে পড়েছে। তাদের এ মনোভাব প্রত্যক্ষভাবে জানার পর এরশাদ চূড়ান্ত পরাজয় মেনে নেন। ক্ষমতা থেকে পুরোপুরিভাবে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। সে কথাই ৪ঠা ডিসেম্বর টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানিয়ে দেয়া হয়। আর, এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশের সংগ্রামী মানুষের বিজয় উল্লাস ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয় সর্বত্র।

তারপর থেকে ঘটনাবলী আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। ৫ই ডিসেম্বর (বুধবার) সকালেই আমরা বাংলাদেশ বেতারে দুই জোটের দুই নেত্রী শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়ার ভাষণ শুনতে পাই। সেদিন সন্ধ্যায় তিন জোট সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নাম প্রস্তাব করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদের জন্য। পরের দিন বৃহস্পতিবার (৬ ডিসেম্বর) সংসদ বাতিল এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে যায়। তার পরপরই বঙ্গভবনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তিন জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। শুক্রবার (৭ই ডিসেম্বর) রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশবাসী যে সংগ্রাম চালিয়েছে' তার সাথে পুরোপুরি একাত্মতা ঘোষণা করে দায়িত্ব গ্রহণে তাঁর সম্মতির পটভূমি ও তাঁর করণীয় সম্পর্কে বলেন। সারাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মরণপণ সংগ্রামের জন্য আন্দোলন সফল হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসনীয় অবদানের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শরিক হবার জন্য আহ্বান জানান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ এবং জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হলো। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হলাম আমরা।

২৭শে নভেম্বরে জরুরী আইন ও কারফিউ জারির এক সপ্তাহের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণ শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিত যেভাবে দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে তার সাথে নেপালের গণঅভ্যুত্থানে রাজতন্ত্র, ফিলিপাইনে মার্কোসের স্বৈরতন্ত্র এবং ফ্যাসিস্ট চিলির পিনোচেট সরকারের পতনের ঘটনাগুলোর সাথে বহুলাংশে তুলনীয়। আরেক দিক থেকে বিভিন্ন মাত্রায় ব্যর্থ পূর্ব ইউরোপীয় 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলোর বেশ কয়েকটি কমিউনিস্ট সরকারের পতনের ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি। সেসব দেশেও ছিল এক আওয়াজ 'গণতন্ত্র চাই'। অর্থাৎ, জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের অধীনে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বসবাস করার জন্য তারা একের পর এক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কার্যত একদলীয় শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সর্বত্র। আজকের সারা বিশ্বেই গণতন্ত্র, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্ব শাসন এখন এক প্রবল শক্তিশালী ধারায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশও এই ধারার বাইরে থাকতে পারে না।

স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুণগতভাবে যে মৌলিক পরিবর্তন হয়ে গেলো তাকে

আমরা বিশ্বব্যাপী যে গণতান্ত্রিক আবহ সৃষ্টি হয়েছে সে পটভূমিতে বিবেচনায় নিতে পারি। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটি অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে দেশবাসীর বিপুল আত্মত্যাগ এবং দীর্ঘ গণসংগ্রামই আমাদের বিজয়ের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেছে। এবং সেজন্যই আবার জন্য দু'টি বিশেষ ক্ষেত্রের ভূমিকাও অনুকূলে চলে আসে। সে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো: এক, বাংলাদেশের বৈদেশিক দাতাদেশ ও সাহায্য সংস্থাগুলোর অবস্থান; দুই, শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা। সরকার ও বিরোধীদলীয় আন্দোলনের জন্য এই দু'টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর অঞ্চলের প্রতি সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এটা বলা যায়, বিরোধীদলীয় শক্তিগুলো বিগত বছরগুলোতে তাদের সম্ভাব্য ভূমিকাকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কখনো কখনো সে হিসেবে কিছু গরমিল হলেও এটা এখন দেখা গেলো যে, চূড়ান্ত হিসাব কষতে তাঁরা ভুল করেননি।

প্রথমত: এরশাদ দেশে জরুরী আইন ও কারফিউ জারি করার পর থেকেই দাতাদেশগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং এমনকি জাপানও বেশ কড়া ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। প্রায় একই সময়ে ঢাকাস্থ বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলোর কার্যক্রমও বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সরকার সব সময়ের জন্যই দাতাদেশগুলোর রাজনৈতিক সমর্থন সুনিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছিলেন। উপসাগরীয় সঙ্কটের পর, বিশেষ করে সৌদী আরবে সৈন্য পাঠানোর পর তাদের মধ্যে এ ধারণা আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দাতাগোষ্ঠীর পর্যালোচনামূলক বৈঠকের সিদ্ধান্ত তাদের উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু দেখা গেলো, গণআন্দোলনের চাল বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অবস্থানেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। সেটা সরকারের নীতিনির্ধারকরা কিন্তু বুঝতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত: স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সম্ভাব্য ভূমিকা কি হতে পারে, এ নিয়ে নানা মত ও তর্ক-বিতর্ক থাকলেও ৬ই ডিসেম্বর টেলিভিশনে প্রদত্ত সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেঃ নূরুদ্দিন খানের সাক্ষাৎকার থেকে তা এখন স্পষ্ট বের হয়ে এসেছে। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বিশ্বের সর্বত্রই গণতন্ত্রের জোয়ার এসেছে। একনায়কত্বের পতন হয়েছে দেশে দেশে। সেজন্য অতীতের মতো বর্তমানেও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার ক্রান্তিলগ্নে সশস্ত্র বাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা করে এ প্রক্রিয়াকে সহজতর ও ত্বরান্বিত করেছে। তিনি আরও বলেছেন, সামরিক শাসন প্রবর্তন করার কোনো চিন্তা কখনোই তাদের মনে স্থান পায়নি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গণআন্দোলনের এক পর্যায়ে অতীত

অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই ভাবছিলেন সামরিক শাসন ছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তরের বিকল্প পন্থা নেই। তখন শেখ হাসিনাই প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট ভাষায় বারবার জোর দিয়ে বলেন, আরেকটি সামরিক শাসন নয়, তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সাংবিধানিক পন্থায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরই কাম্য। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যে এ রকম নিরপেক্ষ একটি অবস্থান নিতে পারে সেটা অবশ্য ২১শে নভেম্বরে সশস্ত্র বাহিনী দিবসে হরতাল পালন না করার জন্য বিরোধীদলগুলোর প্রতি আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে তা প্রথম প্রকাশ পায়। কিন্তু তার পরও এখন এ রকম শোনা যায় যে, শেষ সময়ও এরশাদ সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন বা তেমন কথা ভেবেছিলেন। তার অনেক মন্ত্রীর মধ্যেও এ রকম চিন্তা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই সশস্ত্র বাহিনীর নিরপেক্ষতা এরশাদ ও তার সরকারের পতনকে দ্রুত অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

এখন এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বর্তমান নিরপেক্ষ ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায়, বিশেষ ভূমিকা পালন তাদের নতুন ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। কারণ, এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, পঁচাত্তরের পনেরই আগস্টের পরিবর্তনের পর থেকে রাজনীতিতে দেশের রাজনীতিতে একের পর এক সরকার বদলের ব্যাপারে সামরিক অভ্যুত্থানের যে ধারা চলে এসেছে, সেটা সংবিধানবহির্ভূত। বারবার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ক্রমান্বয়ে তাদের সমর্থনে সরকারী দল গঠন, প্রত্যক্ষ- পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনার মধ্য দিয়ে যে অত্যন্ত ক্ষতিকর স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয় দেশের বুকে সেটা কারো জন্যই মঙ্গলজনক হয়নি। এই উপলব্ধি এখন সকলের।

আমাদের স্বাধীনতার প্রায় দু'দশক ধরে দেশে রাজনীতি ও সরকার পরিবর্তনের ব্যাপারে যে রকম উত্থান-পতনের ঘটনা ঘটেছে, তাতে সকলেরই বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে আমরা আশা করতে পারি। অন্যদিকে, সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান অবস্থান ও ভূমিকা গ্রহণের পেছনেও বেশ দীর্ঘ দেড় দশকের নানা ঘটনার প্রভাব রয়েছে নিঃসন্দেহে। ফলে, তাঁদের সকলের মধ্যে সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বেশ কিছুটা প্রসার ঘটেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। আমরা এখন আশা করবো যে, বিভিন্ন জোট ও ছোট-বড়ো দলগুলোর ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান সত্ত্বেও দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ ব্যাপারে যে জাতীয় সমঝোতা গড়ে উঠেছে সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েই বর্তমান প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে নেবেন তারা। আমরা জানি যে, একটি স্বৈরাচারী সরকারের ভিত ও তাদের সৃষ্ট

> প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা কঠিন হলেও সে জায়গায় একটি নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণ আরও দুরূহ কাজ। সেটা বেশ সময়েরও ব্যাপার। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন পথও নেই। এ কথা আমরা যেনো ভুলে না যাই যে, এ রকম ঐতিহাসিক সুযোগ একটি জাতির জন্য বারবার ফিরে আসে না।[২১০]

এরপর ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর সংবাদে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের করণীয় সম্পর্কে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই উপসম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, দেশের মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। মানুষের এই প্রত্যাশা পূরণ করে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয় উপসম্পাদকীয়টিতে এবং আশা প্রকাশ করা হয়, ভবিষ্যতের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন একটি মডেল সাংবিধানিক মর্যাদা পাবে। সৈয়দ আলী কবীরের লেখা এই উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'সাঁকো'। এতে লেখা হয়:

> জাতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চেয়েছিলো ও পেয়েছেও। যে শাসক অস্তাচলে গেলেন তিনি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ছাড়া দেশের সবারই একটা অভিষ্ট লক্ষ্য ছিল, দেশ যেন একটা নিরপেক্ষ ও সৎ নির্বাচন পায়। সত্যিকথা, গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত সরকার এই জাতীয় নির্বাচন দেয়। আমাদের দেশে তা সম্ভব ছিল না। এরশাদ সরকার একের পর এক ভুয়া নির্বাচন করে প্রমাণ করেছিলেন তার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। উপরন্তু খালেদা জিয়া এরশাদ সরকারের অধীন নির্বাচন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ, রাষ্ট্রপতি এরশাদ তলোয়ারের খোঁচায় মুকুট উঠিয়ে নিয়েছিলেন, যদিও প্রথমে পরিয়েছিলেন আর কাউকে, অত্যন্ত লজ্জাকর শর্তে। সেই শর্ত ছিল রাষ্ট্রপতি হবেন সম্পূর্ণভাবে প্রধান সামরিক শাসনকর্তার আজ্ঞাবহ ব্যক্তি। তবে কিছুদিন পর নিজেই মুকুট পরলেন।
>
> পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ তার অবস্থাকে হালাল করার ব্যাপারে ব্যর্থ হলেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ দেশের একজন সাবেক বিচারপতিকে ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে বসিয়ে ছিলেন। এবারও প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। অথচ তফাৎ দেখুন। একটা ঘটনা ঘটেছে জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে, যা দেশ ঐকান্তিক মনে মেনে নিয়েছে। আর অস্তগামী সরকার গণঅভ্যুত্থানের মুখে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। কোন সিদ্ধান্তের পেছনে জনগণের রায় না থাকলে মধুও হয় হলাহল। আজ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

সাহাবুদ্দিন যে সম্মান পেয়েছেন তা বিচারপতি আহসানুদ্দিন চৌধুরীর বেলায় ছিল অকল্পনীয়।

বর্তমান পরিবর্তন আইনসম্মত হয়েছে কিনা তা নিয়ে বহু লোক (যারা বেআইনের জগতে আইন নিয়ে বাস করে ও পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র জাতীয় তর্কে মত্ত থাকে) মাথা ঘামায়। তাঁরা বোঝেন না যে যখন আইনের অভাব থাকে তখন ইতিহাস তার নিজের আইন নিজে তৈরী করে। তবে কখনো কখনো সে আইন তৈরী করে স্বৈরাচারী সরকার। যেমন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও যাকে আইনসিদ্ধ করেছিলেন মুনির।

১৯৭১ সালে উল্টো হলো; যা এরশাদ বুঝেও বোঝেননি। অর্থাৎ পাকিস্তান সরকার যখন ১৯৭০ সালের নির্বাচনের রায়কে অপমান করলো, তখন জনগণের আন্দোলন ইতিহাসের বাঁক ঘোরালো।

আবার হলো এবার। অর্থাৎ জনগণ প্রার্থিত পরিবর্তন এনেছে। এখন আইনের ব্যাপার বুঝে নাও। একজন মুচিই হয়তো জুতা আবিষ্কার করেছিলো। যারা আইনের কূট তর্ক নিয়ে মাথা ঘামায়, তারা রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটি পড়তে পারেন। উপকৃত হবেন। হিংটিং ছটের জগৎ থেকে মুক্তি পাবেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সেই শ্বাসরুদ্ধকর জগৎ থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছিলো। আবার মুক্তি পেলাম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সামরিক শাসকবৃন্দ যখন সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তারাও হিংটিং ছটের জগৎকে উল্টে দেয়। তবে জনমত এই ব্যাপারটাকে সমর্থন দেয় না।

আমরা ওপরে চিত্রিত জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছি। রেলগাড়ীকে রেল লাইনে বসাতে যাচ্ছি, যাতে তা গড়িয়ে গড়িয়ে নিজ তালে রেল লাইনের ওপর দিয়ে যায়। আমাদের আশাগুলো বড় ছোট। আমরা জানি যে গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য মডেল আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু অন্তত ভারতীয় মডেলটার অনুকরণ করতে পারি। পাকিস্তানী রাজনৈতিক মডেল আমরা আদৌ চাই না। সম্প্রতি আমার এক পাকিস্তানী বন্ধু এস, এম ওসমান যিনি সিএসপি হিসাবে বাংলাদেশে পাকিস্তানী আমলে চাকরি করেছেন, তিনি জরুরী আইন ঘোষণার সময় ঢাকায় ছিলেন। তাঁকে আমি বলেছিলাম যে, পাকিস্তান ও আমরা গণতন্ত্রের স্বাদ পেলাম না। খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। তিনি বললেন যে, বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য আরো বেশী। তারা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই- এর মাধ্যমে স্বাধীনতা পেলো। আর তার বদলে পেল জিয়াউল হক মার্কা শাসন অর্থাৎ এরশাদ সরকার, পেলো জরুরী আইন। তিনি সোনারগাঁ হোটেল থেকে দেখে গিয়েছেন যে, মানুষ কারফিউ ভাঙছে। দেখে তিনি খুশী হয়েছিলেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর অনুকরণে বলতে দিন, খয়ের। এবার যাব সদর পথে। ডান-বাঁ চাইব না। আলোচনা করব অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্বন্ধে, যাকে আমি সাঁকোর সঙ্গে তুলনা করছি। আমরা এক জগৎ থেকে আর এক জগতে যেতে চাচ্ছি। গ্রামে যেমন এক গ্রাম থেকে অন্য এক গ্রামে যেতে সাঁকোর প্রয়োজন হয়, আমাদের সামনে তেমনি সাঁকো আছে। আমরা চাই সাঁকোটা শক্তিশালী হোক। কুসংস্কার আছে যে, আছে যে, হার্ডিঞ্জ ব্রীজ তৈরীর সময় নরবলি দেয়া হয়েছিল ব্রীজের কল্যাণে। ছেলেবেলায় এই গল্প শুনে ভয়ে কাঁপতাম। আমরা যে সাঁকো তৈরী করেছি, তার পেছনে মানুষের রক্ত আছে। সে শহীদের রক্ত। মিলন ও তার মত অন্য শহীদের রক্ত মানুষের জন্য নতুন মিলনক্ষেত্র তৈরী করে, যা জনগণের পারাপারে যাবার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে।

আমাদের রাজনৈতিক সাঁকো দৃঢ় হবে, পোক্ত হবে। এটাই জনগণ চায়। কিন্তু পোক্ত করা কি সহজ কাজ? কত ভাল ব্রীজ নষ্ট হয়ে যায়। আর্কিটেক্টের ভুলভাল থেকে গেল। ঠিকাদার ভুল করলো, তদারককারী ইঞ্জিনিয়ার ভুল করলো। ভুল অনিচ্ছাকৃত হতে পারে। কে জানে, কি হয়েছে।

আমরা যে রাজনৈতিক সাঁকো তৈরী করেছি তার কল্পনা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এসেছে। ভাসা ভাসা কল্পনা হঠাৎ প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করলো। সেই শক্তি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাঁকে সাহায্য করার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ খুঁজে বের করতে সাহায্য করলো। দেশ সেই উপদেষ্টা পরিষদ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট বলে বিশ্বাস করি। এই বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। তারা তিন মাসের জন্য এসেছেন। নিজেদের কাজ করে চলে যাবেন। দেশ তাঁদের গুরুদায়িত্ব দিয়েছে। সেই দায়িত্ব তারা পালন করতে পারবেন, সেই গভীর আত্মবিশ্বাস আমাদের আছে।

যেমন প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করা নতুন নয় (আমাদের ক্ষুদ্র ২০ বছরের ইতিহাসে দু'বার এই জাতের ঘটনা ঘটলো), তেমনি সরকারে বিশেষজ্ঞ লোকের সমাবেশও নতুন নয়। দেশের ডিক্টেটরী শাসনকালে বলা হয়েছে যে, তাঁরা সরকারে ট্যালেন্টের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তবে তাঁরা জনগণের সমর্থন পাননি। কিন্তু এবার যারা এসেছেন, তাঁদের পেছনে রয়েছে জনগণের রায়। তাঁদের নির্বাচন করেছেন বিভিন্ন পার্টি, কিন্তু জনগণের জানা মতে পরোক্ষভাবে মনোনয়ন ও নির্বাচনের ব্যাপারে জনগণ বা ছাত্রসমাজ হস্তক্ষেপ করেনি। তাদের দাবী ছিল যে কালহরণ করা উচিত নয়। শিগগিরই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করো। সময়ের ঘড়ি টিক টিক করে এগুচ্ছে। অতএব যা কর তাড়াতাড়ি কর, যাতে আসল কাজ আরম্ভ হতে বিলম্ব না হয়। আসল কাজটা হল সৎ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, যার জন্য জনগণ লড়েছে। প্রথম লক্ষ্য অর্জিত হলো। দাবী ছিল এরশাদ সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে

না। সে লক্ষ্য তারা অর্জন করে ছাড়লো। সন্দেহাতীতভাবে সাঁকো-সরকারের সর্বোচ্চ দায়িত্ব নির্বাচন সম্পন্ন করা। সেই নির্বাচনের জন্য এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করা তাদের দায়িত্ব, যাতে নির্বাচন সৎ ও নিরপেক্ষ হয়। জনগণ সেই ব্যাপারে সরকারকে ঐকান্তিক সাহায্য দেবে বলে বিশ্বাস করি। লক্ষ্যটা খুবই কঠিন। কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। যাদের দোয়ানো গরুর দুধের কথা মনে আছে, তারা জানে যে, গোয়ালা খাঁটি দুধ সরবরাহ করতে চায় না। তারা জানে যে কড়া পাহাড়ায় সামনে বসে দুধ দোয়ানোর ব্যবস্থা না করলে খাঁটি দুধ পাবার উপায় নেই। চোখের সামনেও চতুর গোয়ালার লোক ঠকাবার অভ্যাস আছে। দেশ এমন একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে যারা পাহারাদারের কাজ করবে।

বিভিন্ন মহলে বলা হয় যে নির্বাচন পুরো সততার সঙ্গে এদেশে করা সম্ভব নয়। কিছু ভুয়া ভোট পড়বে। তবে লোকে এমন নির্বাচন চায় না যার ফলে জেতা সদস্য হেরে যাবে। আমি এই সীমাবদ্ধ লক্ষ্য নীতি মানতে রাজি নই। যুদ্ধে হারাবার পূর্বে হারতে চাই না। ফেল করা সদস্যকে হারতেই হবে। কিন্তু জেতা মানুষের বাক্সে বেশী ভোট পড়বে কেন? একি বাতাসা বিতরণের খেলা হচ্ছে? যত পার তত নাও। যে ছাত্র একশতে ৫১ পেয়েছে, না হয় ষাটই পেয়েছে, তাকে দেয়া হবে ৮০ বা ৯০। কেন? কার বাক্সে কত ভোট পড়েছে তা জানা প্রয়োজন। এভাবেই দেশের জনমতের যাচাই করা হয়। পার্টি বোঝে তার অবস্থান কি। তার দিকে হাওয়া কতটা বইছে। এসব তথ্য জাতির মনমানসকে জানার জন্য প্রয়োজন। দুধ যখন খাবই, তখন খাঁটি দুধ চাই। পানি মেশাতে চাই না। এই কঠিন লক্ষ্য সরকার অর্জন করলে উপকৃত হবে। ছেলে পরীক্ষায় পাস করলে তো খুশী হবোই। পাস করার অভ্যাস অগণতান্ত্রিক রাজনীতিতে চলেই গিয়েছে। এবার আমরা বেশী নম্বর নিয়ে পাস করতে চাই। এমন নির্বাচন চাই যা দেখে সবার তাক লেগে যাবে। এই আশা কি বড় বেশী ? কে জানে।

নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার তরে আইন ও শৃংখলা রাখার দায়িত্ব সরকারের। তাদের অবশ্যই সৎ ও নিরপেক্ষ হতে হবে। আর সেই সঙ্গে হতে হবে নির্ভীক। অনেক চাকরি করতে হয় জীবন পণ করে। এই মনোবল ছাড়া শাসক হওয়া যায় না। সেই মনোবল ছিল বলেই বৃটিশ স্টীল ফ্রেমের সাদা অফিসাররা সুনাম কুড়িয়েছিলেন। তারা কমবেশী দেশী কর্মচারীর মনে এই মনোবল দিতে পেরেছিলেন। তা সম্ভব হয়েছিল কারণ, তদারকি করত তারা। কিন্তু পরে মনোবল ভেঙ্গে গেল। সেই প্রক্রিয়ার আরম্ভ হল ১৯৩৭ সালের পর থেকে যখন দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। আমলাতন্ত্র মুরুব্বি ধরতে আরম্ভ করলো। কিশোর বয়স থেকে এই প্রক্রিয়া দেখে আসছি। তারপরে ১৯৪৭ সালের পর থেকে ক্রমে ক্রমে আমলাতন্ত্রের মনোবলে ধস

নামলো। এখানেই আমাদের আমলাতন্ত্রের পরাজয়। খানিকটা ঝুঁকি নেয় প্রাক্তন সিএসপিগণ। তাই তাদের সুনাম। তবে তারা ধোয়া তুলসী পাতা নয়। আমাদের দেশে ধোয়া তুলসী পাতা কেউ নয়। কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জ এসেছে সৎ ও নিরপেক্ষ হবার। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন (বিচারপতি বলে, প্রাক্তন সিএসপি বলে নয়) সৎ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন। তার উপদেষ্টাবৃন্দও এ ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু জনমতকে পেছনে থেকে তাদের সামনে উৎসাহ দিতে হবে। তারা টাগ্ অব ওয়ারের রেফারী। সৎ রেফারীর কাজ তারা করবেন। আর জনগণ তাদের নিজস্ব দলকে উৎসাহ দেবে। নিজেরা নিজের জোট বা পার্টিকে বলবে, আরও জোরে, আরও জোরে টানো। এই টাগ অব ওয়ারতো কম মজার নয়। দুটো বড় জোটের পিলার দু'মহিলা, যাদেরকে ইতিহাস দিয়েছে গুরুভার।

বর্তমান সরকারের তাদের সংক্ষিপ্ত সময়কালে আরো দুটো দায়িত্ব আছে। তার একটা হলো যে, গত সরকারের অপরাধীদের কি হবে। এ ব্যাপারে জনমত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সচেতন। তারা এবং তাদের অতন্দ্রপ্রহরী ছাত্রঐক্য পরিষদ জানে যে, তিন মাসে তাদের বিচার শেষ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারা যদি চোখের আড়ালে দেশত্যাগ করে? তাহলে? প্রায় সবাই সৎ ও নিরপেক্ষ বিচার চায়। কিন্তু যারা দেশের রাজনীতিকে স্বাভাবিক হবার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছে তাদের সম্বন্ধে মানুষের ক্ষোভ আছে। আর লোকে বিশ্বাস করে, এমনকি ওপরের মহলে, যে দেশ আকাশচুম্বী দুর্নীতি দেখেছে। মানুষ চায় যে যারা অপরাধী তারা শাস্তি পাক। এটাই মানুষের আকাঙ্ক্ষা। বিচার না হয় দীর্ঘ হলো, কিন্তু যাদের হতে পারে তারা যেন দেশত্যাগ না করে। আর যেন মনে হচ্ছে যে, সামনের পার্লামেন্ট এরশাদ সরকারের আইনগত সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেবে। সপ্তম সংশোধনী ও পরবর্তী সংশোধনীকে বাতিল করা হবে। দেশের কিছু মানুষ এই অবস্থায় বিচলিত হবে, বিভ্রান্ত হবে। ঘাবড়ে উঠবে তারা যারা সরকারের কর্মকাণ্ড থেকে ন্যায়ভাবেই উপকৃত হয়েছে। তবে এই জাতের প্রবণতার অবকাশ নেই। কারণ, সার্জারীর মাধ্যমে এরশাদ সরকারের সংশোধনীগুলোর ক্ষতিকর দিকসমূহকে বাতিল করা হবে। অন্য সবকিছুকে রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

এরশাদ সরকার রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধ হবার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনাকে নাকচ করেছিলো ১৯৮৬ সালে। সেই নির্বাচনের ফলাফলকে বদলানোর জন্য যে পর্বত-প্রমাণ দুর্নীতির আশ্রয় এরশাদ সরকার নিয়েছিলেন তার ফলে মানুষ চরম হতাশায় ভুগছিলো। সেই নির্বাচন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করলো যে, এরশাদ সৎ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে পারে না। যা ছিল অনুসিদ্ধান্ত, তাই হলো থিওরি। অনেক বিজ্ঞ

ব্যক্তি বলেন যে, জানা কথার প্রমাণ কি লাগে? ইতিহাস বলে যে লাগে। তবে এই নিয়ে দ্বিমত আছে। যাক সেসব কথা। এই মুহূর্তে পদ্মা, মেঘনা, যমুনার মতো বিভিন্ন স্রোত এক জায়গায় মিশেছে। তাদের মিলিত লক্ষ্য হলো যে, ১৯৮২ সালে এরশাদ-এর ক্ষমতাভিত্তিকে নষ্ট করা। ভিত চলে গেলেই চলে যাবে তার ওপর তৈরী কাঠামো। আর্জেন্টিনায় ক'বছর পূর্বে এই জাতীয় ঘটনা ঘটেছে। তবে কাজটা সুকঠিন। অত্যন্ত দক্ষ সার্জারীর প্রয়োজন হয়। অপারেশন সফল হয়েছে, তবে রোগী দুর্ভাগ্যক্রমে মারা গেলো। একথা চলবে না।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুস্থতা আনবার জন্য এই পদক্ষেপ প্রয়োজন। আর লোক চায় যে, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক। কিন্তু তদন্তের চেষ্টা বৃথা চেষ্টা হবে যদি অপরাধীকে না পাওয়া যায়। চোর বা মাল পালিয়ে গেলে চোরকে শাস্তি দিয়ে সুখ কোথায়, চোরতো মহাসুখে বিদেশে থাকবে সেখানে তার সম্পদের পাহাড় আছে। আবার সুযোগ মতো চলে আসবে।

বর্তমান সরকারের একটা অত্যন্ত বড় গুরুদায়িত্ব আছে। তাহলো আইন ও শৃংখলা রক্ষা করা। নচেৎ সৎ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু জনগণের আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ছাড়া আইন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। খেলতে নামবো; অথচ খেলার মাঠকে কলুষিত করবো এ যুক্তি অচল। এ অবস্থায় একজন ঘাঘু রেফারীও একটা উত্তেজনাপূর্বক খেলার সামাল দিতে পারে না। আর বর্তমান খেলাতো বিরাট খেলা। কত মানুষের ভাগ্য তার সাথে জড়িত আছে। তৃষিত চাতক যেমন বৃষ্টি চায়, তেমনি মানুষ দেশে চায় একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ, যার জন্য আইন ও শৃংখলা অপরিহার্য। দেশ এখন তার মনোজগতে একটা গণতন্ত্র সরণী রচনা করেছে, যার প্রতীক হলো প্রেসক্লাব থেকে দৈনিক বাংলা পর্যন্ত পথটি। বিশ্বাস করি বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে একখণ্ড রাস্তার নাম হবে গণতন্ত্র সরণী। কিন্তু গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য আইন ও শৃংখলা অপরিহার্য। ভাঙলেই বিপদ। কারণ, গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। সরকার এখন অনেক কালাকানুন ও নীতি ভাঙ্গার ব্যাপারে ব্যস্ত। উপরন্তু প্রশাসনের খাঁজে খাঁজে এরশাদ সরকার তাদের অশুভ ছায়া বিস্তার করেছিল। দেশে মঙ্গলের জন্য পথ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তার জন্য অপেক্ষা করা যায় না। এইসব কাজ করে যেতে হবে। দেশের জনমত সরকারকে সাহস ও সমর্থন যোগাবে। যে কাজ সরকার করছে তা জনমতের দাবীতেই করছে। অর্থনৈতিক প্রশ্নে সরকারের দায়িত্ব দেশের কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যকে সচল রাখা। কৃষিক্ষেত্রে একটা জরুরী কাজ আছে। কৃষি চাষকে (বিশেষ করে ইরি-বোরো ও গমের চাষের সবলতাকে) অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। কলকারখানা ও অফিস-আদালতে-অশান্তি কাউকে সাহায্য করবে না।

বরঞ্চ অযথা অশান্তির মধ্য দিয়ে দেশের রাজনীতিতে ষোড়শ বাহিনী অনুপ্রবেশ করে। এইসব প্রবণতাকে বন্ধ করা প্রয়োজন। একবার ছাত্রঐক্য পরিষদ ও দেশের তিন জোট সাবধানবাণী উচ্চারণ করুক। তাহলেই শান্তি ফেরত আসবে।

শেষ করার পূর্বে বলবো যে, বর্তমান সরকার কৃষ্ণপক্ষের শেষ পাদের চাঁদ। অনেক দুর্যোগের পর হঠাৎ এই চাঁদ দেখা গিয়েছে। তাই মানুষ খুশী। রাতটা ভালোয় ভালোয় পার হলে মানুষ দিনের আলো দেখবে। মানুষের বিশ্বাস যে সাঁকোর ওপর দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের শেষ পাদে পার হচ্ছে, তা হবে সুদৃঢ়। মানুষের এই আশা পূরণ করলেই বর্তমান সরকার ইতিহাসে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। কে জানে হয়তো সামনে দশ/পনের বছর এটাই হবে দেশের নির্বাচনী মডেল। আমাদের সামনের শাসনতন্ত্র তাকে সিদ্ধ করতে পারে।[২১১]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর তিন রাজনৈতিক জোটের করণীয় সম্পর্কে ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবাদে আরেকটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই উপসম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিরোধী জোটসমূহ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের পতন ঘটিয়েছে। তাই স্থায়ী ও স্থিতিশীল গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতার স্বার্থে শুধু আসন্ন নির্বাচন পর্যন্ত নয়, আরও দীর্ঘদিন তিন জোটের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত। স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদের রক্তের ঋণ রাজনৈতিক জোটসমূহের কাছে এটাই দাবি করে। তানভীর মোকাম্মেলের লেখা এই উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: ' বিজয় ও গণতন্ত্র'। এতে লেখা হয়:

"কিছু মানুষকে সব সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায়, সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায়, কিন্তু সব মানুষকে সব সময়ের জন্যে বোকা বানানো যায় না"– লিঙ্কনের এই আপ্তবাক্যটি ইতিহাসে আরো একবার প্রমাণিত হোল ১৯৯০-এর বাংলাদেশে। চরম ভণ্ডামি, মিথ্যাচার ও নষ্টামির বিনিময়ে সাঙ্গোপাঙ্গরা যে এদেশের মানুষের কাছ থেকে অবিমিশ্র ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই কিনতে পারেনি তার চূড়ান্ত প্রমাণ মিলল এবারের শীতে–রাজপথে।

ডিসেম্বর মাস বাঙালীর কাছে বিজয়ের মাস হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে ডিসেম্বরে রইল। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়, ১৯৯০-এ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের। এরশাদশাহীর পতনের ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের গ্রানাইটদৃঢ় ঐক্যই যে মূল ভূমিকা রেখেছে তা আজ কোনো নতুন সংবাদ নয়। বিশেষ উল্লেখ্য শিক্ষক-ডাক্তার-পেশাজীবী-সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক কর্মীদের গৌরবোজ্বল ভূমিকাও। বহু মানুষই তার নিজস্ব অবস্থান থেকে

এ আন্দোলনে অবদান রেখেছেন। এ আন্দোলন তাই যথার্থই হয়ে উঠতে পারল এক– গণঅভ্যুত্থান।

যে কোনো সচেতন মানুষই যেমন '৯০-এর এই বিজয়ে গভীরভাবে আপ্লুত হবেন, তেমনই হয়তো বহু- আন্দোলনে পোড়-খাওয়া এদেশের মানুষ খুঁটিয়ে দেখতে চাইবেন আমাদের অতীত আন্দোলনগুলোর সঙ্গে বর্তমান গণঅভ্যুত্থানটির সমবৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যগুলোকে। এটা শুধুই নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল নয়, এই প্রতিতুলনা থেকে পাওয়া যেতে পারে আগামীর অনেক মূল্যবান শিক্ষাও।

সরকারের পতন না ঘটিয়ে ক্লাসরুমে ফিরব না এই ঘোষণা দিয়ে ছাত্ররা পথে নেমেছিল এবং ১৯৬৯- র মত 'এবারও, কেউ-কথা-রাখেনি'র এই দেশে ছাত্ররা আরেকবার তাদের কথা রেখেছে। অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব আরেকবার সফলভাবে পালন করল।

তিন জোটের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনটির চরম পর্যায়ে প্রশংসনীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। মূলতঃ মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক দলসমূহ এবং শিক্ষক-ডাক্তার-সাংবাদিক প্রমুখ পেশাজীবী সংগঠন ও যুবক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের বিশেষ ভূমিকা এ আন্দোলনকে করেছে মধ্যবিত্ত মানুষের এক গণঅভ্যুত্থান। তবে দেশের আপামর জনগণের সমর্থন ও শুভাশীষ এ আন্দোলনের পেছনে ছিল বলেই তা' হতে পারল এত গৌরবজনকভাবে সফল।

'৬৯-এর আন্দোলনেও গণতন্ত্রের দাবী একটি শক্তিশালী উপাদান ছিল। কিন্তু '৬৯-এ গণআন্দোলন যেমনটি বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল এবার তেমনটি করা যায়নি। কৃষক-ক্ষেতমজুরদের, যারা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, তাদের ভূমিকা সীমিত ছিল। '৬৯-এ অপ্রতিরোধ্য সাহস নিয়ে কার্ফু ভেঙ্গেছিল ঢাকার শহরতলির যে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী তাদের ভূমিকাও এবারে কিছুটা কম অনুভূত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা যেতে পারে দেশে কারখানা-শ্রমিকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়েনি। দেশে ক'টা নতুন কারখানা হয়েছে? স্বাধীনতার পর থেকেই তো ফটকাবাজারের অর্থনীতি। তবে সংগঠিত কারখানা-শ্রমিকদের ভূমিকা ততটা চোখে না পড়লেও শহর ও শহরতলির সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা কিন্তু অত্যন্ত জঙ্গী ভূমিকা রেখেছেন তা' মালীবাগ, রামপুরা, মীরপুর, নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশের যেকোন জায়গার শহীদদের তালিকা দেখলেই বোঝা যায়।

এই আন্দোলনে বিবিসি বা ভয়েস অব আমেরিকার মত আন্তর্জাতিক সংবাদ-মাধ্যমগুলোর গুরুত্ব আরেক-বার অনুভূত হলো। বোঝা গেল প্রযুক্তির উন্নতির এই যুগে তথ্যপ্রবাহের পদ্ধতির এত উন্নতি ঘটেছে যে কোনো বিশেষ দেশে প্রেস সেন্সরশীপ আরোপ করে আর

তথ্যের প্রবাহকে রুদ্ধ রাখা যাবে না। দূরবর্তী বাংলাদেশকেও আর বিশ্বের মূল স্রোতের মনোযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব নয়।

৬৯'-এর সঙ্গে বর্তমান আন্দোলনের একটি বড় ইতিবাচক পার্থক্য এটাই যে, যে ক্যান্টনমেন্ট থেকে আইয়ুব খাঁ এসেছিল, সেই ক্যান্টনমেন্টেই সে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে পেরেছিল, কিন্তু এরশাদ সেটা পারেনি। তাকে জনগণের পছন্দকৃত কর্তৃপক্ষের হাতেই ক্ষমতা তুলে দিয়ে কেটে পড়তে হয়েছে।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ শুধুই এক স্বাধীন আবাসভূমির জন্য ছিল না, ছিল গণতন্ত্রের জন্যেও। সকলেরই ভাল লেগেছে যখন রাজপথের অগণন মিছিলে দেখেছি '৭১-এর লাখ শহীদের রক্তে রঞ্জিত জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে। দলীয় পতাকা প্রায় কেউই আনেননি। সংকীর্ণ দলাদলির ঊর্ধ্বে এই যে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ, '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পরে স্বদেশভূমিকে আরেকবার আপন বলে আবিষ্কার, বড্ড প্রয়োজন ছিল এর, বিশেষ করে এই প্রজন্মের জন্যে যারা ১৯৭১ সাল দেখেনি। বড় ভাল লেগেছে আরেকবার এই প্রমাণে যে, এদেশের তরুণরা কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি। হিরোইন-ড্রাগস-পর্নো ছবি দিয়ে সমাজকে ভরিয়ে দিলেও শাসকগোষ্ঠী এ তারুণ্যকে পচাতে পারেনি। '৮৮-র বন্যাতেও অবশ্য এ দেশবাসী পাড়া-মহল্লার পাশের বাড়ির ছেলেটির গভীর দেশপ্রেমের প্রমাণ আরেকবার পেয়েছিল। এ যেন সুকান্তের সেই আঠারো বছরের চিরন্তন তারুণ্য। যে জাতির এমন তরুণসমাজ রয়েছে তার ভয় পাবার কিছু নেই।

তবে বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এক দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এক বড় কারণ সেই পাকিস্তান আমল থেকেই এদেশে গণতন্ত্রের পূর্বশর্তসমূহ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি, জাতীয় সংসদ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন পদ্ধতি এসব কখনোই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। '৪৭-এ ভারত হাঁটল গণতন্ত্রের পথে, আর জিন্নার ছেলেবেলার সেই দৌড়ের মত, ভূতের পায়ের মতই পাকিস্তান হাঁটল-উল্টোদিকে। আমাদের সমরনায়ক রাষ্ট্রপ্রধানরাও সেই পাকিস্তানী ধারারই বাঙলাভাষী উত্তরসূরি মাত্র। তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে সমরনায়ক রাষ্ট্রপ্রধানদের তো একই হাল– ভণ্ডামি, নষ্টামি, ক্রুরতা ও মোসাহেব- পরিবৃত এক ফ্যান্টাসীজগতে বসবাস- যথার্থই মার্কোয়েজের উপন্যাসের জেনারেলদের মত। ব্যর্থ কবিতা লেখার চেষ্টা না করে এরশাদ যদি মার্কোয়েজের গল্প-উপন্যাসগুলো পড়তেন, নিজের হালটা সঠিক বুঝতে পারতেন, দেশবাসীও বেঁচে যেত।

কেউ কেউ হয়তো এখনও বলবেন, এত সংগ্রাম, এত ত্যাগের বিনিময়ে যেটুকু অর্জিত হবে তা' তো শুধুই তথাকথিত "বুর্জোয়া গণতন্ত্র"। সবিনয়ে বলি মেহনতী জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মত

আন্দোলন করতে পারা গেছে কি? আর ওটার যে বিকল্প বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায় তা কি খুব ইতিবাচক? বরং বাংলাদেশে সম্প্রতি যা ঘটল তা বর্তমানে লাতিন আমেরিকায়, পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে, প্রতিবেশী পাকিস্তান বা নেপালের গণতন্ত্রের বিজয় ও ক্রমবিকাশেরই আরেকটি মাইলপোস্ট। এক্ষেত্রে যা নিয়ামক ভূমিকা পালন করল তা' রাজপথে জনগণের দীপ্ত আন্দোলন। কোনো কোনো মহল থেকে এই সাহসী গণআন্দোলনকে খাটো করে দেখানোর প্রবণতা রয়েছে। বলার চেষ্টা রয়েছে যে এরশাদের পতন যে এত ত্বরান্বিত হলো তার কারণ গণআন্দোলন ততটা নয়, যতটা দাতা দেশগুলোর চাপ। এটা ঠিক এরশাদের দ্রুত পতনের পেছনে কিছু দাতা দেশের চাপও কাজ করেছে, কিন্তু দাতা দেশগুলোও যে এরকমটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কারণও রাজপথের তীব্র জঙ্গী গণআন্দোলন। এমনকি যেসব মহল থেকে গণতন্ত্রের প্রতি হামলা হওয়ার আশঙ্কা ছিল এবং অতীতে হয়েছেও, তারাও যে হঠাৎ এত 'গুডবয়' হয়ে গেল, তারও কারণ রাজপথে জনতার সাহসী প্রতিরোধ। কোনো শক্তির পক্ষেই আর এ আন্দোলনকে এড়িয়ে যাওয়া, পাশ কাটানো বা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

গণতন্ত্রের সর্বদাই কিছু ইতিবাচক পার্শ্বফল রয়েছে। যেমন বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে কয়েক সপ্তাহ আগে সরকারী দলের গুণ্ডা-পাণ্ডারা পুরনো ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব অপকীর্তি ঘটাল সে কারণে আরেকটি নাজুক তারিখ ৫ই ডিসেম্বর সম্পর্কে আমরা কিছুটা উৎকণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু জনতার আন্দোলন এত বলিষ্ঠ ছিল যে বিষয়টি নিয়ে আর ভাববার কারণই রইল না। আরেকবার প্রমাণিত হলো যে গণতন্ত্র ও জনতার সচেতনতাই সাম্প্রদায়িক নোংরামির বিরুদ্ধে সবচে' বড় রক্ষাকবচ।

গণতন্ত্রের একটা ধ্রুপদী সংজ্ঞা অবশ্যই আছে। তবে আর যেকোনো সংজ্ঞার মত গণতন্ত্রের সংজ্ঞাও স্থানিক, কালিক। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তার প্রেক্ষিত ও রূপ পাল্টাবে। তবে আমার বিশ্বাস, যে গভীর আত্মত্যাগী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের দাবীকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে, সে গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো শুধু নয়, সমাজের সর্বস্তরেই গণতন্ত্রায়ন, তা হবে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বত্র, রাজনৈতিক দলসমূহের ভেতরে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদিতে, পারিবারিক জীবনেও। বুঝতে হবে গণতন্ত্র শুধুই একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম নয়, একটা মূল্যবোধেরও নাম।

এরশাদের বড় অপরাধ যে সে অসাংবিধানিক উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে বা দেশের সম্পদ লুটপাট করেছে এসবকে ছাপিয়েও যে অপরাধটি 'বেশী মাত্রা পাবে তা' হচ্ছে সে নানা কৌশলে এদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদিকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা করেছে। জাতীয়

সংসদ, যা হচ্ছে দেশের আপামর জনগণের আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তাকে সে যথার্থই বানিয়ে ফেলেছিল এক বিশেষ প্রাণীর খোঁয়াড়, যেখানে তথাকথিত বিরোধী নেতাটিও তারই খোঁয়াড়ের। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না, রাজনৈতিক দলগুলোকে ভাঙ্গিয়ে বা ভাঁড়িয়ে, না পারলে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করে মিথ্যা কুৎসা রটনা করে এরশাদ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সকল বিকাশকেই ধ্বংস করে ফেলছিল। নির্বাচন পদ্ধতি, যার মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে তাকেও সে বানিয়ে ফেলেছিল এক তামাশা। এই সবকিছুর বিরুদ্ধেই জনগণের তীব্র ক্ষোভ– ৯০'-এর আন্দোলন। এ আন্দোলন গণতন্ত্রের, যে গণতন্ত্রের জন্যে গোটা বিশ্বই আজ আন্দোলিত। গণতন্ত্র আজ যুগের দাবী। সে কারণেই আমাদের সেনাবাহিনী প্রধানকেও দেখি বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের এই আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেই তাঁর আলোচনা শুরু করেন।

পশ্চিমা দেশগুলো যেমন দীর্ঘকাল ধরে গণতন্ত্রে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আমরা তেমনি গণতন্ত্রহীনতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমাদেরকে এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এমন একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে অরওয়েলের সেই বিগ ব্রাদারদের ভীতি আর রইবে না। থাকবে না কোনো সুপার গভর্নমেন্টের অপচ্ছায়া। জনগণের নির্বাচিত জনগণের দ্বারা জবাবদিহিমূলক সরকারই শুধুমাত্র চালাবে দেশ। আমাদের চেতনায় কখনোই আর আরোপিত রইবে না কোনো চিন্তাপুলিশ। আমরা যেন আর আত্ম-সেন্সরের ডোবাতে কখনোই নিজেদের আবদ্ধ করে না ফেলি।

গণতন্ত্রের অনেক উপাদানকেই আমাদের নিত্যচর্চার মাধ্যমে অভ্যাসে পরিণত করে তুলতে হবে। যেমন, পরমতসহিষ্ণুতা। কার্লাইলের ভাষায়, "তোমার মত আমি সমর্থন করি না, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের অধিকার রক্ষায় আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।"

কিন্তু তাই বলে কি সকলের মত? সকল মত? তা অবশ্যই নয়। মৌলবাদীরা, যারা গণতন্ত্রই শুধু নয়, এমনকি এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই বিশ্বাস করে না, গোপনে পোষে খুনে ফ্যাসিস্ট বাহিনী, যেমন অতীতে আলবদর, আল-শামস, তাদেরকেও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়ার অর্থ গণতন্ত্রের পায়েই কুড়াল মারা। গণতন্ত্রের অধিকার তারই, গণতন্ত্রে যার বিশ্বাস।

তবে জনগণের এই আন্দোলনের বিজয়ের পথে বাধা আরো আছে। আপাততঃ কচ্ছপের মত গলা ঢুকিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে বহু মুখচেনা গণবিরোধী শক্তি। এরশাদ ও তার সহযোগী বড় বড় রুই-কাতলাগুলো হয়তো ধরা পড়বে। বিচারও হতে পারে। তবে আমার আশঙ্কা মাঝারিগোছের দালালরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অভিজ্ঞ তো তাই-ই বলে। বাঙলাদেশ আত্মীয়তার দেশ।

আর সবচে' বিপদ এরশাদের স্বৈরাচারের যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত সেই লুটেরা ধনীরা সমাজে রয়েই গেছে। এদের উৎখাত করতে না পারলে স্বৈরাচার প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কা দূর হবে না। ব্রেশটের নাটকের সেই সংলাপের মতই, "জঠর যদি ফলবতী থাকে কালসাপ আবারও জন্ম নিতে পারে।" এদের বিচার ও শাস্তি আজ এক জাতীয় দাবী। কেউ বলতে পারেন পরাজিত শত্রুর বিচার গণতন্ত্রের পরিপন্থী কি-না। বলব, বরং বিপরীতটাই সত্য। গণতন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্যেই প্রয়োজন এদের- বিচার এটা কোনোই প্রতিহিংসাপরায়ণতা নয়। বিচার হওয়া কাম্য যাতে ভবিষ্যতে অসাংবিধানিক উপায়ে কেউ আর ক্ষমতা দখলের সাহস না পায়।

যে অতলান্ত দুর্নীতির মাধ্যমে এরশাদ ও তার সহযোগী লুটেরারা সম্পদের পাহাড় গড়েছে সেই দুর্নীতির বিচারের জন্যে দেশের প্রচলিত আইনেই প্রচুর ধারা পাওয়া যাবে। এদের বেআইনী অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা জরুরী। এই লুটেরাদের কোনোই মান-সম্মানবোধ নেই। এরা যথার্থই বিশ্ববেহায়া। দুই-চার বছর কারাগারে কাটিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এরা আবার এদের সম্পদ ভোগ করলে শহীদদের আত্মার প্রতিই অবিচার করা হবে। এইসব অর্থগৃধুদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেই হবে এদের যথার্থ শাস্তি।

মনে রাখা প্রয়োজন গণতন্ত্রের সংগ্রাম শেষ হলো না, শুরু হলো মাত্র। গণতন্ত্রের জন্যে রাজপথের উচ্ছ্বাসকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কাজটি মোটেই সহজ নয়। বিরোধীদলসমূহকে আজ তাই হতে হবে গভীরভাবে প্রজ্ঞাবান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। আমার পরেই-প্রলয় এমন যাদের চিন্তা রাজনীতি থেকে তাদের সরে থাকাই মঙ্গল। সবাইকেই মনে রাখতে হবে তাকে একদিন বিরোধীদলে বসতে হবে। ক্ষমতা কারোরই মৌরসী পাট্টা নয়।

আর তাই যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিরোধী জোটসমূহ এরশাদের পতন ঘটাতে পারল, শুধু নির্বাচন পর্যন্ত নয়, তার পরেও আরো দীর্ঘদিন তিন জোটের যৌথ ঘোষণার উল্লেখিত সেই ঐকমত্য বজায় রাখা কাম্য। গণতন্ত্র মানেই ধারাবাহিকতা– সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা। যেকোন মূল্যে সেই স্থায়ী ও স্থিতিশীল গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। শহীদের রক্তের এটাই দাবী রাজনৈতিক দল ও সংগ্রামী ছাত্র-গণসংগঠনগুলোর কাছে।[২১২]

গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র, জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় এই বিষয়ে একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। উপসম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের এক অবিশ্বাস্য সম্ভাবনার ফসল নিয়ে আমাদের দুয়ারে এসে

উপস্থিত হয়েছে। তাই উপসম্পাদকীয়তে এই সম্ভাবনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরির জন্য আটদলীয় রাজনৈতিক জোট নেত্রী শেখ হাসিনা, সাতদলীয় রাজনৈতিক জোট নেত্রী খালেদা জিয়াসহ গণতান্ত্রিক সকল দলকে অভিনন্দন জানানো হয়। 'দর্শক' ছদ্মনামে লেখা এই উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের মর্মবাণী'। এই উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> বাংলাদেশে অবিস্মরণীয় এক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘটনার সূচনা ঘটিয়াছে। ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন শুধু একটি সরকারের পতন মাত্র নহে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাইয়াছে। সরকার আসে, সরকার যায়। কিন্তু ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের পতন ঐরূপ সাধারণ ঘটনা নহে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের মানুষ তাহাদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খার প্রকৃত পরিচয় উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেও আন্দোলন সংঘটিত হইয়াছে। এই-বারকার আন্দোলন গোটা সমাজকে আলোড়িত করিয়াছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। সকল প্রকার স্বৈর আচরণের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন।
>
> সমাজের ভিতর বহু মতাবলম্বী মানুষের বাস। সমাজের ভিতর বহু মতের অবস্থান। সমাজের ভিতর নানা আইডিয়ার উত্থান, পতন ও বিলয়। বাংলাদেশের মানুষ নব্বই-এর আন্দোলনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অসাধারণ বিকাশ ঘটাইয়াছে। সকল মানুষ স্বৈরাচার উৎখাতে সামিল মানুষ হইয়াছিল। কেহবা বামে, কেহ দক্ষিণে, কেহ মধ্যে, কেহবা মধ্যের বামে অথবা মধ্যের দক্ষিণে। সূর্যালোকের মধ্যে যেমন সপ্তবর্ণের সমাহার এই- বারকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তেমনি সপ্তবর্ণের সমাহার ঘটিয়াছে। কেহ রক্তিম বর্ণ পছন্দ করে। কেহবা স্নিগ্ধ সবুজ। আবার কেহ বেগুনি। কেহবা নীল। সমাজের ভিতর এইরূপ বিচিত্র পছন্দের অবকাশ থাকিতে হইবে। শত মত প্রস্ফুটিত হইতে দিতে হইবে। শত মতের মধ্যে সংঘাত সহ্য করিতে হইবে। সংঘাতের ভিতর দিয়া শ্রেষ্ঠ মত বাহির হইয়া আসিবে। ইহাই গণতন্ত্রের মূল কথা।
>
> যুগে যুগে আইডিয়ার মধ্যে সংঘাত ঘটিয়াছে। পক্ষে, বিপক্ষে মত প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ পক্ষে বলিয়াছে, কেহ বিপক্ষে। হয় আইডিয়ার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়াছে, নয় একটি আইডিয়া অপর একটি আইডিয়ার উপর জয়ী হইয়াছে। ইহাই গণতন্ত্রের নিয়ম। মানব সভ্যতা আজ পর্যন্ত মেজরিটি ওপিনিয়ন অথবা মেজরিটি রুলের বাহিরে রাষ্ট্র পরিচালনা কিংবা মতাদর্শগত বিরোধ প্রকাশের বাহিরে নতুন কোন ফর্মুলা উদ্ভাবন করিতে পারে নাই।
>
> পুঁজিবাদের সহিত সমাজতন্ত্রের সংঘাত ঘটিয়াছে। এই সংঘাতে এক সময় সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বহুলাংশে জয়ী হইয়াছিল।

সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মানবেতর জীবন- যাপন করিবে ইহা কেমন কথা। দেশে রক্ত পতাকার নীচে বিপ্লব ঘটিয়াছে। সরকার বদল হইয়াছে। সমাজ বদল হইয়াছে। এক সময় মনে হইয়াছিল নিরন্ন নির্বিত্ত মানুষের কাছে সুফল পৌঁছাইতে হইলে প্রোলেতারিয়েতের ডিকটেটরশীপের প্রয়োজন রহিয়াছে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে পৃথিবীতে দেশে দেশে বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। সমাজতান্ত্রিক আইডিয়ার সঙ্গে বুর্জোয়া আইডিয়ায় মহা সংঘাত ঘটিয়াছিল। এক সময় পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আইডিয়ার সমান্তরাল বিকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু প্রযুক্তি বিকাশ মার্কসীয় ধ্যান-ধারণাকে একরকম ধসাইয়া দিয়াছে। অর্থনৈতিক ভিত্তি যখন ধসিয়া যায় তখন সাংস্কৃতিক ভিত্তিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

স্বীকার করিতে হইবে সমগ্র পৃথিবীতে আইডিয়ার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে। প্রযুক্তিগত বিপ্লব আইডিয়ার ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় পরিবর্তন আনিয়াছে। প্রযুক্তির এক অবস্থায় কাল মার্কস সারপ্লাস ভ্যালুস থিউরির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর উত্থানকে তিনি নিশ্চিত বলিয়া জানাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রযুক্তি বিপ্লব পুঁজিবাদী সমাজের ভিতরও উৎপাদন ক্রিয়া এতখানি বাড়াইয়া দিয়াছে যে সারপ্লাস ভ্যালুস থিউরির কার্যকারিতা আজ আর নাই। তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে থাকিতে পারে। কিন্তু অগ্রসর দেশগুলির ক্ষেত্রে ভিন্ন এক অবস্থার প্রবর্তন ঘটিয়াছে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিতর হইতে সাধারণ শ্রমিককে যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা সর্বহারার বিপ্লব দমন করিবার পক্ষে হয়তো যথেষ্ট । তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। এইসব কারণে সম্ভবত চীন, কিউবা ও উত্তর কোরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়গান উচ্চারিত হইতেছে। এই অবস্থা কতদিন টিকিয়া থাকিবে বলা কঠিন।

আমরা বলিতেছিলাম বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণবিপ্লবের কথা। সেই প্রসঙ্গ হইতে মনে হয় কিছুটা দূরে সরিয়া আসিয়াছি। ৯০ এর গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজ পরিবর্তনের এক অবিশ্বাস্য সম্ভাবনার ফসল লইয়া আমাদের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বেগম খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন। শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন। গণতান্ত্রিক সকল দলকে অভিনন্দন। তাহারা মত প্রকাশের স্বাধীনতা উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন। এই উৎসরণ প্রয়োজন ছিল। আমাদের সমাজের মধ্যে আইডিয়ার প্রবল দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। সমাজের জন্য কি ভাল, কি মন্দ সে সম্পর্কে আমরা নিসংশয় নহি। কেহ বলিবেন "বাঙ্গালী"। কেহবা 'বাংলাদেশী'। কেহবা রবীন্দ্রনাথকে চাহিবেন। আবার কেহ নজরুলকে। পুরাতন অভ্যাস।

সমাজের মধ্যে বিবিধ আইডিয়া ও মতাদর্শের অবস্থান রহিয়াছে। খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে, আন্দোলনের মাধ্যমে কোন আইডিয়া শ্রেষ্ঠ তাহার নিষ্পত্তি ঘটানোর প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌল উপাদান অবশ্যই অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ অবশ্যই গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ। তবে গণতন্ত্রে মাইনরিটির কণ্ঠস্বরও উপেক্ষিত নহে। গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের স্বার্থে মাইনরিটির কথা মনে রাখিতে হয়। কারণ মাইনরিটি একদিন মেজরিটি হইয়া যায়।

পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের মূল কথা। কেহ ভিন্নমত লইয়া উপস্থিত হইলে ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। ভিন্নমত যদি অবান্তর কিছু হয়, যুক্তির সম্মুখে উহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

মোদ্দা কথা হইতেছে গণতন্ত্রে শতমত বিকশিত হইতে দিতে হইবে। শতমতের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রেষ্ঠ মত জয়ী হইবে। গণতন্ত্রে আরও কথা হইতেছে, "তুমি যাহা বল উহার সহিত আমি একমত নহি। কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করিতে আমি আত্মদান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি।" ইহাই গণতন্ত্রের মর্মকথা।

রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে। আইডিয়ার ক্ষেত্রেও স্বৈর-ভাবনার অবসান ঘটাইতে হইবে। জনগণকে শেষ বিচারক বলিয়া মানিতে হইবে। ধৈর্যশীল হইতে হইবে। স্থিতধী হইতে হইবে। তাহা না হইলে গণতন্ত্রের মর্মবাণী আবারও নানা বিধি-নিষেধের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরিবে।[২১৩]

১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর সংবাদে এই বিষয়ে অনুরূপ একটি উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। উপসম্পাদকীয়তে গণঅভ্যুত্থানের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তিন রাজনৈতিক জোটকে অভিনন্দন জানানো হয়। একই সঙ্গে উপসম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত মহৎ এবং এটাই স্বাভাবিক। সৈয়দ আলী কবিরের লেখা এই উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'অবাক পৃথিবী অবাক'। এই উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

বাংলাদেশের মানুষ দেখালো বটে। বিশ বছর পর বিজয় দিবসের এগারো দিন পূর্বে মানুষকে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের জয়ের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ দিল। দেশ গত বিশ বছর নানারকম সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। বিজয় দিবসের আনন্দ ফিকে হয়ে গিয়েছিল। দেশ সেই আনন্দ পুনরায় পেল। নতুন প্রজন্মের জন্য এই আনন্দের প্রয়োজন

ছিল। তার স্বাদ তাদের তৃষিত প্রাণ চাচ্ছিল, কিন্তু পাচ্ছিল না। এরশাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এসেছিল মূলত নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে। ভেবে দেখুন। স্বাধীনতার সময় তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বড়, তাদের বয়স ছিল বয়স ৫/৬। আর বেশীরভাগ জন্মেছে একাত্তর সালের পর। এরাতো বড় হয়েছে এরশাদের আমলে। অথচ তারা তাকে পছন্দ করলো না। কেন করলো না? এটা নিজেদের প্রশ্ন করতে হয়।

মুক্তির সন্ধানে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা বদ্ধপরিকর ছিল যে তারা ১৯৮৭ সালের মত হার আর মানবে না। শেষ অবধি মানুষ জিতলো। বিভিন্ন অংশ সংগ্রামের জন্য ধন্যবাদ দাবী করতে পারে। এই অল্প পরিসর লেখায় সবাইকে অভিনন্দন জানানো সম্ভব নয়। তবে আমি দু'পক্ষকে দেব। সর্বপ্রথম দেবো সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যকে। তারাই গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংগ্রামের সূচনা করেছিল।

২৭ শে নভেম্বর এরশাদ জরুরী অবস্থার ঘোষণা দিলেন। প্রেস সেন্সরশীপ বলবৎ করলেন। ঘোষণায় হাজার রকমের নিষেধাজ্ঞা ছিল। বলা হয়েছিল কারফিউ দেয়া হল। লোকে কারফিউ ভাঙলো। বলা হল, হরতাল বন্ধ। সমানে হরতাল হল। বলা হল ধর্মঘট চলবে না। কিন্তু কে না ধর্মঘট করেছে? যেন ধর্মঘটের সিজন পড়ে গিয়েছে। আর প্রেস সেন্সরশীপের মুখে খবরের কাগজ বেরুলোই না।

বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষ সংগ্রামী ছাত্র ও তরুণদের নেতৃত্বে বুক চিতিয়ে দিল। তারা সরকারকে ছেড়ে কথা বলবে না। সরকার যদি ঢিলটা মারে পাটকেলটা খেতে হবে। তারা সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চায়, Party is over। দাওয়াত শেষ হয়ে গিয়েছে। স্বৈরতান্ত্রিক সরকার সুযোগ পেলে বেধড়ক মার দিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করতে চায়। এটাই দেখতে আমরা অভ্যস্ত। শেষ অবধি স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় হল। আশা করি স্বৈরতন্ত্র আর দেশে জাগবে না। জাগলে মূল্য দিতে হবে। সময় তার মূল্য নেবেই। যেমন এবার নিয়েছে। বাংলাদেশের মাটিতে স্বৈরতন্ত্রের শেকড় গাঁড়ার সুযোগ মোটেই নেই।

আমি জয়ের গল্প ৩রা ডিসেম্বরেই পেয়েছিলাম। সেদিন অংশত জিতেছি আমরা। এরশাদ ঘোষণা করলেন ইমার্জেন্সী তুলে নেয়া হচ্ছে ক'দিনের মধ্যে। প্রেস সেন্সরশীপ ওঠানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেদিন। আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এই দুই ঘোষণার মধ্য দিয়ে। পরদিন সন্দেহাতীত বিজয় এল। গণতন্ত্রের লড়াইয়ে এটা বিরাট বিজয়। তবে আসল রাজনৈতিক বিজয় সেদিন পুরোপুরি হয়নি। এরশাদ বললেন তিনি নির্বাচনের পূর্বে সরে দাঁড়াবেন। নিজের মনোনয়নপত্র দাখিলের ১৫ দিন পূর্বে পদত্যাগ করবেন। আরও বললেন কে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপতি হবে তা বিচার-বিবেচনা করা হোক। আরও কি কি বললেন। যাক্‌গে লোকে কিছুই মানলো না। চব্বিশঘণ্টা পর তাঁর

পায়ের তলা থেকে মাটি সরে পড়লো। জয়ের আনন্দে ফেটে পড়লো মানুষ। একজন তরুণের কপালে খানিকটা আঘাত লেগেছিল ককটেল ফাটার ফলে। তার রক্তের দাগকে সেই নীরব-শান্ত তরুণটি-যার বাবা ১৯৭১ সালের ঘাতকের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন- জয়তিলক বলে মনে করলো। তার অশান্ত ছোট ভাই, যে ১৯৭১ সালে জন্মেছে, ছুটে গেল একটা প্রসেশনের সঙ্গে। তার এক ফুফাতো বোনের নাম মুক্তি। বিজয় দিবসের সময়কালে জন্মেছিল বলে সেই নামকরণ হয়েছে। এরা আরও ছোটরা, দেশের কিশোর সমাজ মুক্তির আনন্দে পাগল। মুক্তি 'জয়বাংলা' গোষ্ঠী আর তরুণদ্বয়ের একজন খাঁটি জিয়াপন্থী। তেলে-জলে মেশে না? মিশেতো গেল । একজন বিজ্ঞানের ছাত্র বলেছিল 'emulsion' হলে তেলে-জল মেশে। এক্ষেত্রে মিশবে না কেন? তর্ক হয়েছিল তার সঙ্গে। সে তার বিশ্বাসে অটুট ছিল। আমি ৩ মাসের পুরাতন ঘটনার কথা বলছি।

আশ্চর্য! এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সবাই ছিল, তার কিছু চামচা ছাড়া। এরশাদ সরকারের আমলে যে হতাশা ওপরতলায় দেখেছি, তেমন হতাশা আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। তার কারণ বলে দুর্নীতি। সদর পথে দুর্নীতি, চোরাপথে দুর্নীতি। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবার জন্য বলে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি গড়ে তুলতে দেয়া হয়নি। যাক যেসব কথা। সেসব আলোচনা কিছু করেছি, ভবিষ্যতে আরও করবো। আজ না হয় রাজনীতি নিয়ে থাকি।

এরশাদ একটা বিরাট লোক হাসানি কথা বলেছিলেন সম্প্রতি। রক্তধৌত মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন একটা আমাদেরকে শাসনতন্ত্র দিয়েছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারিনি। পারলে আজ আমাদের রাজনৈতিক দুর্দশা হতো না। অর্থনৈতিক দুঃখ-কষ্ট অনেক লঘু হতো। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার সূচনা হতো। সেসব বন্ধ হয়ে গেল। তাই বলে রক্তেরঞ্জিত সর্বজনস্বীকৃত শাসনতন্ত্র মিথ্যা, যেহেতু তা তৈরী করেছিল তারা যারা ১৯৭০ সালে নির্বাচিত হয়েছিল? কি জাতের কথা এটা? একটা শাসনতন্ত্র রচনার উপাদানগুলো জানলে জাতীয় ভুল মন্তব্য এই করা হয় না। শাসনতন্ত্র রচনায় একটা রাজনৈতিক ভিত্তি প্রয়োজন ও তার পেছনে একটা যুক্তিসঙ্গত আইনগত ফ্রেমওয়ার্ক থাকবে। কেবল ১৯৭২ সালের সংবিধানের পেছনে দুটোই ছিল। সেই শাসনতন্ত্রের কিছু দোষত্রুটি ছিল। আমলাতন্ত্র পিও ১০৯-কে হালাল করার পক্ষে ছিলেন না। ইতিহাস এই ধারাকে নিশ্চয়ই একসময় উৎপাটিত করতো। কোন শাসনতন্ত্রই দোষমুক্ত নয়। অনেক শাসনতন্ত্রকে সংগ্রাম ও ইতিহাস মানে দেয়। দেখুন না মার্কিন শাসনতন্ত্র। তারা বলছে যে সব মানুষ সমান অধিকার নিয়ে জন্মেছে। অথচ প্রথমে তারা মেয়েদের ভোটাধিকার দেয়নি। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক

দেশে মেয়েদের ভোটাধিকার বিশ দশকে অর্জিত হয়েছে। সুইজারল্যান্ডে আজও নেই। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিগ্রোর সংখ্যা ছিল মোট সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। তারাতো মানুষ হিসেবে স্বীকৃতিই পায়নি। অথচ দ্বন্দ্বের মাধ্যমে মানুষ তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে ও সে লড়াই আজও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অব্যাহত। মুক্তির পিপাসা মানুষের আমৃত্যু থাকে। শেকল দেহকে বাঁধতে পারে, মনকে নয়।

আমাদের শাসনতন্ত্রে সবচেয়ে সর্বনেশে ব্যাপার হল দ্বিতীয় সংশোধনী। তারই মাধ্যমে জরুরী আইনকে প্রতিষ্ঠা করা হল। এটা থাকবে কি থাকবে না, নিশ্চয় কামাল হোসেন, ইশতিয়াক আহমদ ও অন্যান্য বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তা বিবেচনা করবেন। তবে একটা ব্যাপার এবারের আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। জরুরী আইনের অন্যায় ব্যবহার চলবে না, চলবে না।

১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রের কথায় আসা যাক। মানুষ তার নিজস্ব রক্ত দিয়ে সেই শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। ওটা যদি সিদ্ধ না হয় তবে কোন্‌টা সিদ্ধ?

এরশাদ যেমনভাবে মঞ্চে নেমেছেন তা মানুষ পছন্দ করেনি। সামরিক বাহিনীর প্রতিভূ হিসেবে এসেছিলেন, অথচ রাষ্ট্রপতি সাত্তার নির্বাচনে জিতেছেন। আর ব্যাংক কর্মচারীদের দায়িত্বহীন ধর্মঘটকে তার সরকার দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করেছিলেন। জনমত নির্বিশেষে তার সরকারের পদক্ষেপ মানুষ গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু শাসনতন্ত্র টিকলো না। যেন তার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করার মানে নেই। এরশাদ রাষ্ট্রপতি হয়ে সেই শাসনতন্ত্রকে পুনর্বহাল করলেন যা তিনি ভেঙ্গে ছিলেন। তবে এরশাদ সাহেব অনেক চেষ্টা করেও তার শাসনতন্ত্রকে রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধ করতে পারেননি। যদিও তার আইনগত ভিত্তিকে মানুষ আপাততঃ স্বীকৃতি জানিয়েছিল শাসনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য। তবে তারা পরিবর্তন চায়। তারা চায় সংসদের সার্বভৌমত্ব, যাকে বলে সংসদীয় গণতন্ত্র। সুধীবৃন্দ, সবিনয় নিবেদন করছি যে, ব্যাপারটা বেজায় কঠিন। তার পেছনে যেমন প্রয়োজন আইনের তেমনি প্রয়োজন ঐতিহ্যের। সে ঐতিহ্যের নমুনাতো মিসেস থ্যাচারের বেলায় দেখলেন। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে মেলা বেশী ভোট পেয়েও প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারলেন না। আর যুক্তরাজ্যের রক্ষণশীল পার্টিতো মাত্র সেদিন থেকে নেতার নির্বাচন মেনে নিলো।

প্রথম পার্টি নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেতা এডওয়ার্ড হীথ। তার পূর্বে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী রানী (রাজা)-র কাছে গিয়ে কানে কানে বলতেন অমুককে ডাকুন। সিংহাসনের কাছে যাবার পূর্বে দু'চারজনের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেন। লোকে বলতো ষড়যন্ত্র করতেন অনেক সময়। সেই কারণে আ, এ বাটলার দু'দু'বার প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে বঞ্চিত হলেন।

মিসেস থ্যাচার গেলেন কেন? কারণ তার পেছনে পার্টি একতাবদ্ধ নয়। আর দুটো নির্বাচনে রক্ষণশীল পার্টি মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়েছে। তাই আরও প্রায় দেড়বছর থাকার আইনগত সুযোগ থাকলেও যেতে হলো।

ওপরের ব্যাপারটা আনলাম তার প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে। এক, আমাদের দেশে এরশাদ কত পানি ঘোলা করে আসন ত্যাগ করলেন। আর মিসেস থ্যাচার গেলেন কত সহজে। দ্বিতীয় কথাটা হলো মূল কথা। সংসদীয় গণতন্ত্র চালাতে প্রয়োজন হয় ধৈর্যশীল ও সহনশীল সমাজ ও অত্যন্ত শক্তিশালী ঐতিহ্য। দুটো ব্যাপার যে কোন গণতন্ত্রেই প্রয়োজন। সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রয়োজন খুব বেশী। তবে দেশের অধিকাংশ মানুষ সংসদীয় গণতন্ত্র চায়। অতএব দেয়াই দেশের কর্তব্য।

আর একটা ব্যক্তিগত আলোচনায় ডঃ কামাল হোসেন খুবই মূল্যবান যুক্তি দেখিয়েছিলেন। আমাদের অনুন্নত দেশে প্রেসিডেন্টের একনায়ক হবার ঝোঁক আছে। আর আমেরিকার মত checks and balance আমাদের দেশে হবে অচল। দুই, সংসদীয় গণতন্ত্রের নানা ঝামেলার মধ্যেও নিজকে সামলে নেবার ক্ষমতা আছে। অনেক সঙ্কট সত্ত্বেও ভারত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালিয়ে নিয়েছে। আর দেখুন বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার অবস্থা। এই যুক্তিগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। দুটো মন্তব্য করে লেখার ইতি টানবো।

আমাদের সমাজের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব যাবে না, গণতন্ত্রকে দ্বন্দ্ব নিয়েই বাস করতে হয়, যদি এই ধারা পাকাপাকিভাবে দূরীভূত না হয়। গণতন্ত্রের মডেলটা একনায়কতন্ত্রের মত ইঞ্জিনিয়ারিং ধর্মী নয়। কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যাপার নয়। একনায়কতন্ত্রেও তা নয়, তবে সেখানে সমস্ত সমস্যাকে কার্পেটের নীচে রাখা হয়। একদিন সমাজ বারুদের মত ফেটে পড়ে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছেন। এককালে তারা রাষ্ট্রপতি আইয়ুবের উপাসক ছিলেন।

দুই এবং এটা অত্যন্ত বড় কথা। আমরা একটা নিরপেক্ষ ও সৎ নির্বাচন চাই। এরশাদও নির্বাচন দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু- লোকে আদৌ বিশ্বাস করেনি যে তিনি নিরপেক্ষ ও সৎ নির্বাচন দিবেন। আমরা আশা করবো যে দলমত নির্বিশেষে আমরা নিরপেক্ষ ও সৎ নির্বাচনের জন্য সংগ্রাম করবো। তার জন্য সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নিশ্চয়ই ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। বাংলাদেশ তরুণদের দেশ। নিরপেক্ষ নির্বাচন তাদের ভবিষ্যতকে গড়ে তুলবে। এই চেতনাই দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তি যুগিয়েছে। এই চেতনা অব্যাহত থাকবে বলে আশা রাখবো।

এই মুহূর্তে আওয়াজ তুলুন: জয় গণতন্ত্র, গণতন্ত্র জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। তবে ইনকিলাব আমাদের (বিপ্লব) আমরা

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে চাই। গণতন্ত্রকে আমাদের শয়নের-স্বপনের অঙ্গ করতে হবে। তাহলেই আমরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির পথ খুঁজে পাবো। পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী, সত্তর বছরেরও বেশী সময়ের পর সোভিয়েত রাশিয়া তার মানুষকে খাবার দেবার অক্ষমতা সেই কথাই প্রমাণ করলো।

আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দেশের নারীমুক্তির ক্ষেত্রে একটা বিরাট প্রভাব ফেলবে। দেশের দু'জন প্রধান নেত্রী মহিলা। এটা যে কোন দেশে রাজনীতিতে অনন্য ও বিরল ঘটনা। সম্ভাব্য সরকার ও বিরোধী পক্ষ দলেরই নেতা মহিলা। এমনটি এখনও অন্যদেশে নেই। ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দু'জনেই আমাদের দেশে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাই জন্য দু'জনেই নিরলস পরিশ্রম করেছেন। মানুষের সংগ্রামী মনকে তীক্ষ্ণ করেছেন। তবে তাঁরা দেশের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে কতদিন থাকবেন, তা তাদের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করবে। আমরা আশা করবো যে তাঁরা বিচক্ষণতা দেখাবেন। দেশবাসী আন্তরিক মনে তাদের সাফল্য কামনা করবে।

আমার একটা বিনীত অনুরোধ তারা যেন বিদেশীদের সাথে বাংলায় কথা বলেন। এইটাই তাদের নিয়ম যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী নয়। জার্মান, ফরাসী, জাপানী, চীনা সবাই তাই করে। বিদেশীদের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা অনুবাদ করবে ইন্টারপ্রেটার যাদের ভাষাগত দক্ষত আছে। আমার এই অনুরোধ তারা যদি রাখেন, তাহলে দেশে ও বিদেশে আমাদের সম্মান বাড়বে, যে সম্মানের তারা সন্দেহাতীত দাবীদার।

ঐক্যজোটকে অভিনন্দন জানাতে হয় যে দেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইটাই স্বাভাবিক ও মহৎ সিদ্ধান্ত। ব্যতিক্রম হলে বোঝা পড়ার অভাব অনুভূত হতো। ভাগ্যক্রমে দেশের প্রধান বিচারপতি বিতর্কের উর্ধ্বে, যা স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যক্রমে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুনীম সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। শেষে বলবো, দেশ সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্র চায় না। একজন তরুণী যে দেশের আপামর জনসাধারণকে চিনতে শিখেছে, এই কথা বললো।[২১৪]

কলাম:

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোর নিয়মিত কলামে গণঅভ্যুত্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী নিয়ে বেশ কিছু অভিমত তুলে ধরা হয়। বেশির ভাগ কলামে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে এই ধরনের একটি কলাম প্রকাশিত হয়। এই কলামে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে খুব শান্ত এবং পরিচ্ছন্নভাবে লালন করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পরামর্শ দেওয়া হয়। কলামটির শিরোনাম: 'নিবেদন ইতি'। 'অভাজন' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

> সর্বাগ্রে একটি হিসাবের কথা বলি। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলগ্ন হইতে এ পর্যন্ত সময়কার হিসাব। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রথম স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭২ সালে। ঐ সালেই রচিত হয় বাংলাদেশের সংবিধান। ইহার পর ১৯৭৫ সালে সপরিবারে নিহত হন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ের অস্থায়ী সরকারের চার নেতা জেলখানায় নির্মমভাবে নিহত হন সেই সময়ই। মাত্র তিন বছরের মাথায় ক্ষমতার পট পরিবর্তন। ইহার পর ১৯৭৮ সাল। জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে প্রথম বড় ধরনের সামরিক বিদ্রোহ। বিমান বাহিনীর অনেক মেধাবী অফিসার নিহত হইয়াছিলেন এই বিদ্রোহে। কঠোর হস্তে দমন করা হয় বিদ্রোহ। সামরিক বাহিনী ও বিমানবাহিনীর অনেক সদস্য কঠোর সাজাপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৯৮১ সাল। চট্টগ্রামে সামরিক অফিসারদের বিদ্রোহের পরিণতিতে নিহত হন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নিহত হন জেনারেল মঞ্জুরও। ইহার পর ১৯৮৪ সাল। এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ ও আন্দোলন। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছিল ছাত্র সমাজ আর বুদ্ধিজীবী। পেশাজীবী সংগঠনসমূহ সহযোগিতা দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই আন্দোলন স্থায়ী হয় নাই। ইহারও তিনবছর পর ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সূচিত হয় বৃহত্তর আন্দোলন। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া সেই প্রথম ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নেত্রীত্বদান করেন। কিন্তু সেই আন্দোলনও ব্যর্থ হয়। দুই জোটের মধ্যে শুরু হয় বৈরিতার সম্পর্ক। ইহার পর আরও তিনটি বছর। ১৯৯০ সালে তিন জোটের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর ভিতর দিয়া সূচনা হয় গণআন্দোলনের। আর এই ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী প্রণয়নের পিছনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ছাত্রসমাজ। তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণে বাধ্য করে। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন পরিণত হয় অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানে। সাংবাদিক ও সংবাদপত্রও আন্দোলনকে অনেক শক্তি যোগাইয়াছে। চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বেতার-টেলিভিশনের শিল্পীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিতর দিয়া এই গণআন্দোলন এক সময় অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। সরকারী কর্মচারীদের সরাসরি আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার ভিতর দিয়া এরশাদ সরকারের পতন সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে। সর্বশেষে এই নব্বই

সালেই সমাপ্ত হয় এরশাদ এপিসোড। অর্থাৎ প্রতি তিন বছরের মাথায় একটি করিয়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে এই বাংলাদেশে।

ইহাই হইল হিসাব। পুরা বিষয়টিই কাকতালীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া এক ধরনের অস্বস্তিকর চিত্র ফুটিয়া উঠে। কেমন যেন অস্থিরতা! পঁচাত্তর, আটাত্তর এবং একাশি–এই তিন সালে যে ঘটনা ঘটে উহার সঙ্গে জনগণের কোন যোগ ছিল না, ভূমিকা ছিল না। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক অভিলাষের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনের পট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু চুরাশির আন্দোলন ও সাতাশির আন্দোলনে রাজনীতি সচেতন কর্মীর ভূমিকা প্রধান ছিল। আর সর্বশেষ নব্বই-এ প্রধান চালিকাশক্তি রূপে ছাত্রসমাজ আবির্ভূত হইলেও সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে আন্দোলন অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। এরশাদ সাহেব ছিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতায় সেনাবাহিনীর সর্বশেষ প্রতিনিধি। তাঁহার অন্তর্ধান ঘটিয়াছে রাজনৈতিক গণ বিস্ফোরণের মুখে। হিসাব যদি করিতে হয় তাহা হইলে এইভাবেই হিসাব করা দরকার। কারণ এই হিসাবের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের একটি সামগ্রিক চিত্র প্রস্ফুটিত হইতে পারে। দেখা যাইতে পারে, দেশের সুদীর্ঘ ঊনিশ বছরের রাজনৈতিক অভিযাত্রায় কখন কাহার পদচিহ্ন পড়িয়াছে, কিভাবে পড়িয়াছে এবং এই পথ তৈরীর কারিগর কাহারা ছিল।

একটা সুবিশাল রাজনৈতিক তোলপাড় যখন গণ-বিস্ফোরণের ভিতর দিয়া ঘটিয়া যায় তখন সমগ্র আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোটি বড় অগোছালো থাকে। প্রবল আবেগ, সুতীব্র ক্রোধ দিয়া পুরাতন কাঠামোকে ভাঙ্গিয়া ফেলা কিন্তু খুব যে কঠিন, তাহা নহে। তবে আসল কঠিন ব্যাপার হইল ঐ জায়গায় একটি প্রত্যাশিত কাঠামো তৈরী করা। এজন্য সময় দরকার, ধৈর্য দরকার, দরকার এমন একটি সুস্থির চিন্তা-যাহা দ্বারা সমগ্র পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে। জয় সহজ, কিন্তু জয়কে রক্ষা করা কঠিন।

সেক্ষেত্রে যদি কোন ভুল হয়, বিচ্যুতি ঘটে তাহা হইলে উহার প্রতিক্রিয়া অন্যান্য সময় অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। কাঁচা অবস্থায় মাটির মূর্তিতে যে দাগ পড়িবে শুকাইলে তো উহাই স্থায়ী হইয়া যাইবে। আজ এই কথাটি বলিতে হইতেছে বিশেষ প্রয়োজনে। আমি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, প্রত্যক্ষ সাক্ষী বাহাত্তরের অবস্থায়। আইয়ুব খানের পতন ঘটিল গণঅভ্যুত্থানের মুখে। সেই সময় রাস্তায় রাস্তায়, অফিসে-অফিসে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল দালাল খোঁজার তোড়। কাহারা আইয়ুব সরকারের সহযোগিতা করিয়াছে, কাহারা আইয়ুবের আমলে ফায়দা লুটিয়াছে, তাহাদের বিশাল বিশাল তালিকা বাহির হইত। কে বা কাহারা এই উদ্যোগ লইত, কেহই জানে নাই; কিন্তু ঐসব তালিকা পারস্পরিক

সন্দেহ বাড়াইয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে অনেক নিরীহ মানুষও লাঞ্ছিত হইতে বসিয়াছিলেন। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের ফলে প্রকৃতপক্ষে যাহারা অত্যুৎসাহী হইয়া আইয়ুব বন্দনা করিয়াছিল তাহাদের অপরাধ হালকা এবং কুয়াশাচ্ছন্ন হওয়া সহজ হইয়াছিল। ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখল সেই সময় অনেককে নিশ্চিন্ত করিতে পারিয়াছিল কেবল সেজন্যই। বাহাত্তর সালে স্বাধীনতার পর আবার সেই তালিকা। প্রকৃতপক্ষে যাহারা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সরাসরি দোসর ছিল তাহারা নির্বিঘ্নে হাত মুছিয়া দূর হইতে দেখিয়াছিল সেই দালাল খোঁজার অভিযান। ফলাফল কি হইয়াছে উহাও সকলেরই জানা। ইহার ফলে ব্যক্তিগত ক্রোধ, প্রতিহিংসা, স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেকেই আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিল অকস্মাৎ। ইহা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর যেমন সত্য ছিল, বাহাত্তরে স্বাধীনতার পরও তেমনি সত্য ছিল, এখনও তাহাই হইতেছে। কে বা কাহারা একের পর এক তালিকা বাজারে ছাড়িতেছে আর সেগুলি মানুষের মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইতেছে। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ব্যাপার, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, শিক্ষক প্রভৃতি যেসব পেশাজীবী এ বারকার গণঅভ্যুত্থানে অত্যন্ত সংগ্রামী ভূমিকা রাখিয়াছিলেন, এই তালিকা-হামলার শিকার সর্বপ্রথম তাঁহারাই হইতেছেন। শুধু তাহাই নহে ঘটনার রেশ কাটিতে না কাটিতে পত্রিকা অফিসে হামলা করার মাধ্যমে এক পেশার সঙ্গে অন্য পেশার মধ্যে একটি সন্দেহজনক সম্পর্ক ঢুকাইয়া দেওয়ার মত ঘটনাও ঘটিতেছে। কেহ বলিতে পারেন, এসব সুদীর্ঘ নয় বৎসরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, কেহ বলিতে পারেন এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং কাহারও কাহারও ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের অপপ্রয়াস। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার বাহিরেও অন্য কিছু থাকিতে পারে–এমন কিছু যাহা দ্বারা বড় রকমের ক্ষতি হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে।

আমরা জাতি হিসাবে যেমন দুর্ভাগা তেমনি সৌভাগ্যবানও বটে। চুয়ান্ন সালে ব্যালটের জোরে আমরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিয়াছি, উনসত্তরে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে উৎখাত করিয়াছি, একাত্তরে যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে পরাভূত করিয়াছি আবার এই নব্বই এ আবার গণ-অভ্যুত্থান ঘটাইয়া 'নিজের ভোট নিজে দেওয়ার' অধিকারটি অর্জন করিতে চলিয়াছি। ইহা যেমন শ্লাঘার বিষয়, তেমনি আমাদের সুদীর্ঘ সময়ে স্বশাসনের এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ পাইবার সুযোগ তেমনটি ঘটে নাই, ইহাই হইল দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এই দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্যের ভিতর দিয়াই আমাদের পথ চলা। পৃথিবীর আর কোন জাতির ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে দুই দুইটি গণ-অভ্যুত্থান এবং একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ হইয়াছে কিনা আমার জানা নাই। এতকিছুর পরেও আমরা গণতন্ত্র কাহাকে বলে জানি না, বুঝি না। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ইতিমধ্যে কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন, এবার তো দুই নেত্রীর মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যাইবে। গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় তো ইহাতে বাধা নাই। চন্দ্রশেখর আর ভিপি সিং একই দলে ছিলেন। তাঁহাদের দলগত বিরোধে তো সরকারও বদলাইয়াছে, মার্গারেট থেচার এবং জন মেজর তো একই পার্টির। তাহাতে কি গণতন্ত্রের কোন ক্ষতি হইয়াছে? রাজনৈতিক মতবিরোধের ফলে সংকট সৃষ্টি হইলেই অন্য কোন মুরুব্বী আসিয়া উপস্থিত হইবে এমন ঘটনা তো ঘটে নাই অন্যত্র। তবে এখানে কেন ঘটিয়াছে বারংবার? এই জন্যই আমাদের সতর্কতা প্রয়োজন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে উহাকে অত্যন্ত শান্ত এবং পরিচ্ছন্নভাবে লালন করিয়া অভীষ্ট লক্ষ্যটি অর্জন করা দরকার।[২১৫]

পরের সপ্তাহে ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম: 'নিবেদন ইতি' প্রকাশিত হয়। এইদিন কলামটিতে জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনের সময় সরকারি কর্মচারীদের তাঁবেদারির নানা নজির তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে কলামটিতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা প্রকৃতপক্ষে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এবং জনসাধারণের সেবক। 'অভাজন' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

পাখীটি ছিল খাঁচায়। দিনের পর দিন পিঞ্জরাবদ্ধ সেই পাখী নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকিত নীল আকাশের দিকে। মুক্ত বিহঙ্গের ঝাঁক যখন পাখা মেলিয়া উড়িত, তখন সেই খাঁচার পাখী সেদিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিত আর ভাবিত, আহা, যদি এই পিঞ্জরের অর্গল খুলিয়া যাইত তাহা হইলে আমিও উহাদের মত সুদূর নীলিমায় হারাইয়া যাইতে পারিতাম, বাতাসে ডানা ঝাপটাইয়া পাড়ি দিতে পারিতাম কত সবুজ অরণ্য, নদী-নালা, পাহাড়-পবর্ত। একদিন সত্যসত্যই সেই খাঁচার অর্গল খুলিয়া গেল। আনন্দে উদ্ভাসিত পাখীটি খাঁচার বাহিরে পা রাখিল। মুক্ত বাতাস গ্রহণ করিল বুক ভরিয়া। তারপর পাখা ঝাপটাইল কিন্তু তাহার পাখা দুইটি ভারী হইয়া গিয়াছে ততদিনে। উড়িবার সাধ্য নাই, একটু উড়িতে গেলে মুখ থুবড়াইয়া পড়ার ভয়। যে মুক্ত আকাশ তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে উহাতে সাড়া দিবার সাধ থাকিলেও সাধ্য তো নাই। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেই পাখী আবার গুটি গুটি পায়ে প্রবেশ করিল সেই খাঁচার মধ্যে, যেন ঐখানেই সে নিরাপদ, ঐ খাঁচাই যেন তাহার শেষ আশ্রয়।

এই উপমার কথা বারংবার মনে হইয়াছে এবার বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবিয়া। যেন কি এক সংশয়, দ্বিধা সেখানকার মানুষগুলির চেতনাকে অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে। নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করার, নিজের পেশাকে প্রতিষ্ঠিত করার সেই শক্তি যেন কাহারা নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে। ইহা তো একদিন-দুই-

দিনের ব্যাপার নয়, মাসের পর বছরের পর বছর। সবার মুখে তোতাপাখীর মত একটাই বুলি, 'আমরা সরকারী কর্মচারী।' সরকার যাহা বলিবেন, যেভাবে বলিবেন আমাদিগকেও সেইভাবেই চলিতে হইবে, বলিতে হইবে। যেন দেশের স্বার্থ, মানুষের স্বার্থ অপেক্ষা সরকার অনেক বেশী শক্তিমান। অথচ সংবিধানে যে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার স্বাধীন অধিকার তাঁহাদের দেওয়াই আছে উহাকে তাঁহারা ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এই না পারার পিছনেও অনেক কারণ আছে। আছে চাপ, আছে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, আছে ভীতি। এগুলির কারণে চাপা পড়িয়া গিয়াছে সেই সংবিধন বর্ণিত রক্ষাকবচ। ইহার ফলে দস্যুবৃত্তি এবং লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে সর্বত্র। মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইবার শক্তি হইয়াছে নিঃশেষিত। শুনিয়াছি, বেশ কিছুদিন আগে ঢাকা হইতে নির্বাচিত (?) সদ্য বিলুপ্ত সংসদের একজন সরকারী এমপি বেশ রসাইয়া রসাইয়া বলিয়াছিলেন খাস ঢাকাইয়া ভাষায়: 'আমার তো ঈমান ঠিকই আছে। হগল সময় সরকারী পার্টিই আছি। মগর সরকার যদি পালটাইয়া যায় তয় আমি কি করুম? যাঁহারা সরকারী কর্মচারী তাঁহারা কি এইভাবেই ভাবেন? আলাদীনের প্রদীপের সেই দৈত্যটির মত- 'এই প্রদীপ যাহার হাতে আমি তাহার গোলাম।' ক্ষমতার দণ্ডটিই কি সকলকে পরাধীন করার একমাত্র উপকরণ? আমার প্রশ্ন এইখানেই। তাই আমি মনে করি যদি এখন হইতে এই কথাটি চালু করা যাইত যে, সরকারী কর্মচারী নই, 'রাষ্ট্রীয় কর্মচারী'–তাহা হইলে মনের ভিতরে শক্তি সঞ্চারিত হইত। অন্ততঃপক্ষে রাষ্ট্রের শক্তি তাঁহাদের মনের সমস্ত অসহায়ত্ব কাটাইয়া তুলিতে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারিত। আজ এই কথা বলার এবং এইভাবে ভাবনা-চিন্তা করার সময় আসিয়াছে। কারণ অতীতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আজ সুনিশ্চিতভাবে এইবোধ সৃষ্টি করিবে যে, এভাবে চলে না, চলা যায় না। এরশাদ সরকারই সর্বশেষ সরকার যেমন ছিল না, ইহার পরবর্তীতে যে সরকার আসিবে উহাও সর্বশেষ সরকার হইবে না। দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হইলে বারংবার সরকার পাল্টাইতে তখনও কি চলিতে থাকিবে এই ওলটপালটের প্রক্রিয়া? কাজেই পরিচিতি যদি হয় রাষ্ট্রীয় কর্মচারী, তাহা হইলে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব বাড়িবে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ স্থান পাইবে সর্বোচ্চ। এখন সরকারী কর্মচারী হওয়ার কারণে অনেকেই এই কথা বলিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিতে পারেন যে, সরকারী কর্মচারী হিসেবে সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলাই আমার দায়িত্ব। অতীতেও করিয়াছি তাই ভবিষ্যতেও তাহাই করিব। ইহাতে আমার দোষ কোথায়? এ ধরনের কৌশলী যুক্তির সামনে বিব্রত হইতে হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হইলে রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করিলে উহার জবাবদিহি নেওয়ার সুযোগ থাকিবে।

একটা কথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, বিগত কয়েক বছরে লাঞ্ছিত হইয়াছে প্রতিটি পেশা। ছাত্রদের মধ্যে সন্ত্রাস ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাইজ্যাকারের অপবাদ দিয়া তাহাদের উপর মানুষের আস্থা কমাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। প্রতিটি পেশায় সুবিধাভোগী শ্রেণী তৈরী করা হইয়াছে, এক পেশার সঙ্গে অন্য পেশার, এক অবস্থানের সঙ্গে অন্য অবস্থানের সংঘাত বাধাইয়া দেওয়া হইয়াছে নিপুণভাবে। ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসি কায়েম করা হইয়াছে বিভিন্ন অঙ্গনে। বিগত বছরগুলিতে প্রতিটি স্তরে এত আবর্জনা জন্মিয়াছে যে, সেগুলি পরিষ্কার করা এত সহজ ব্যাপার নহে। কাজেই অত্যন্ত সংযতভাবে আবেগকে প্রশয় না দিয়া এ ব্যাপারে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমে যে পাখীর কথা বলিয়াছিলাম, শেষেও সেই পাখীর কথাই বলি। খাঁচা এখন অর্গলমুক্ত। পাখীটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে খাঁচার বাহিরে। তাহার সম্মুখে মুক্ত পৃথিবী, উদার নীলাকাশ। কিন্তু তাহার ডানা এখনও ভারী। এখন এমন কাহারও সস্নেহ পরিচর্যা দরকার– যাহাতে সে সঞ্চয় করিতে পারে পাখা মেলার শক্তি। যাহাতে সে আর ভীরু পায়ে সেই খাঁচার ভিতরেই না ঢুকিয়া বসে। আজ যদি সেই শক্তি তাহাকে যোগানো না যায় তাহা হইলে এত ত্যাগ, এত সংগ্রাম, এত ক্রোধ, পরিবর্তনের এত আকাংক্ষা ইহার কোনকিছুই কোন মূল্য থাকিবে না।[২১৬]

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের সাপ্তাহিক নিয়মিত কলাম 'স্থান-কাল-পাত্র' প্রকাশিত হয়। এই কলামে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মন্তব্য করা হয়, রাষ্ট্র ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত মালিক জনসাধারণ। প্রকৃত ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে। জনসাধারণ সমর্থন করলে ক্ষমতায় থাকা যায়। প্রত্যাখ্যান করলে পদচ্যুত হতে হয়। ইতিহাসের শিক্ষা এটাই। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে তা আবার নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের এই সত্যটিতে ভবিষ্যত ক্ষমতাসীনদের স্মরণ রাখার আহ্বান জানানো হয়। 'লুব্ধক' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

ইতিহাসের শিক্ষা এটাই যে, ইতিহাসে থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিলে যুগে যুগে দেশে দেশে এরকম রক্ত ঝরত না; অত্যাচার ও নিপীড়ন এতটা তুঙ্গে উঠত না এবং স্বৈরতা যত স্বল্প কিংবা দীর্ঘ সময়ের জন্যই হোক, কোথায়ও শিকড় গাড়তে পারত না। আমাদের সময়েই ইতিহাসের কত ঘটনাই না ঘটে গেছে,–ঘটে যাচ্ছে। অথচ সব কিছু দেখেও যেন আমাদের অনেকেই তা দেখতে চান না। মনে পড়ে, ইথিওপিয়ার ক্ষমতাধর সম্রাট হাইলে সেলাসীর কথা। ক্ষমতাচ্যুতির পরও তিনি নাকি তাঁর রাজকীয় হম্বিতম্বি বজায় রেখে চলছিলেন। তাহলে এটাই কি সত্য যে, স্বৈরতন্ত্রের ধারক মাত্রই এক

সময়ে ম্যাগালোমেনিয়া প্যারেনিয়া ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন? মার্কোসের ইতিহাস তো খুব বেশী দিনের কথা নয়। কি করুণ পরিণতিই না তাকে বহন করে বিদেশ বিভুঁইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলীও তো এখনো বাসী হয় নাই। জনগণের উত্তাল আন্দোলনের মুখে একে একে পতন ঘটেছে সে সব দেশের স্বৈর শাসকদের। বিজয় সূচিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনার ও গণতন্ত্রের।

অথচ এই মাত্র কিছুদিন আগে বৃটেনের মার্গারেট থেচার গণআন্দোলনের মুখে নয়, স্বীয় রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার কারণে হাসিমুখে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। এখানেই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব যে, গণতন্ত্র মানুষকে ক্ষমতার দাসে পরিণত করে না।–ক্ষমতাই বরং তার পিছে পিছে চলে। দুঃখের বিষয়, তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেই গণতন্ত্রের এই মূল্যবোধ অনুপস্থিত। গণতন্ত্রের সার কথা হচ্ছে, দেশ শাসনে জনগণের শরিকানা। অর্থাৎ জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ শাসন। অথচ এই ব্যাপারটার মধ্যেই এসব দেশের শাসকবর্গ ভেলকিবাজির চূড়ান্ত করে ছাড়েন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কেউ টিকতে পারেন না। ফ্রঙ্কোর মত দশকের পর দশক ধরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকলেও না। এক সময় না এক সময় তাদের বিদায় নিতে হয়–হতমান অবস্থায়–নিন্দা ও ধিক্কারের ঝুড়ি বহন করে।

কেন এমনটি হয়? হয় এই কারণে যে, স্বৈরতা শুধু একক বিষয় নয়, স্বৈরতার পিছনে থাকে স্বৈর মানসিকতাসম্পন্ন কিছু লোকের বৈষয়িক সমর্থন। এরা বস্তুতঃই মওসুমী পাখীর মত। সময় বুঝে একদেশে আসে; সময় বুঝে অন্য দেশে যায়। যারা যখন ক্ষমতায় থাকে–তখনই এরা তাদের চার পাশে ভীড় জমায়। শাসকদের পতনে ভোল পাল্টাতেও তাদের দেরী হয় না। বরং এরাই তখন বড় বেশী বিপ্লবী সাজে। নতুন আলখেল্লা পরে আবার আবির্ভূত হয় মঞ্চে। এরাই স্বৈর শাসকদের বুঝাতে শুরু করে যে, সব কুছ ঠিক হ্যায়। কিন্তু কিছুই যে ঠিক থাকে না, জনগণের শরিকানাহীন শাসনে কোন কিছুই যে ঠিক থাকতে পারে না, সেই সত্যটা সযত্নে এড়িয়ে চলেন যে- কোন স্বৈরশাসক এবং তার দোসররা। তোসামুদের একটা অর্থ এই যে, যিনি যা নন, তাকে তা বলা এবং সেই ব্যক্তিরও নিজেকে তাই ভেবে পুলকিত বোধ করা। সেই যেবারে ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন 'মিসা' ইত্যাদি কালাকানুন জারির পরিণতিতে, সেবারে ইলেকশনের রেজাল্ট শোনার পরেও নাকি তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নাই যে, জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

জনগণের সমর্থনের যেমন একটা ভাষা আছে; তেমনি প্রত্যাখ্যানেরও একটা ভাষা রয়েছে। কেবল গণতন্ত্রই শাসকবর্গকে সেই ভাষা শেখাতে পারে। যে কেউ অন্য যেকোন দিক থেকে যত বিজ্ঞ ও

যত যোগ্যই হোক, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে এই ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যান এবং সমর্থন ও প্রত্যাখ্যানের ভাষা বুঝতে পারা তাঁর পক্ষে কোনকালেই সম্ভব হয় না। ফলে কোনট্া জিন্দাবাদ আর কোন্টা নিন্দাবাদ তা-ও এই শ্রেণীর শাসক ঠাওর করতে পারেন না। অন্যদিকে পুকুর কাৎ বলতে না বলতেই পুকুর কাৎ বলার মত একদল সাইকোফ্যান্ট সবসময়ই যেকোন স্বৈরশাসকের আশেপাশে গিয়ে জমায়েত হয়। তারা নিন্দাবাদকে জিন্দাবাদ বলে চালিয়ে দিতে কসুর করে না।

আজ এদেশে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয় এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগে বহুদিন আগে পড়া মেরী কোলেরিজের একটা গল্পের কথাই বার বার করে মনে পড়ছে। এই কলামে এর আগেও বিভিন্নভাবে এই গল্পটা তুলে ধরেছিলাম। আজো তুলে ধরতে চাই একটিমাত্র কারণে যে, শাসক আসবেন, শাসক যাবেন, কিন্তু দেশটা টিকে থাকবে; থাকবে জনগণ–যারা রাজনীতির ধারায় সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণই যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস তা অবশ্য সকলে মেনে নিতে চান না। সমস্যা দেখা দেয় সে কারণেই। বলাই বাহুল্য যে, দেশে দেশে যারা ক্ষমতায় আসেন তা যেকোনভাবেই হোক তারা কিন্তু আসেন এই জনগণের মধ্য থেকেই। জনগণ বলতে সর্বস্তরের জনগণকেই বুঝানো হচ্ছে–সকল পেশার, সবস্তরের মানুষকেই ধরা হচ্ছে। ক্ষমতা যাদের মাথা ও মগজ বিগড়ে দিতে পারে না–তারাই কেবল জনদরদী শাসক হিসাবে টিকে থাকেন।

যহোক, মেরী কোলেরিজের যে গল্পটার কথা বলছিলাম। এক রাজা মারা গেছেন। ফেরেশতারা তাঁর আত্মাকে নিতে এসেছেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই যেতে চাইছেন না। বলছেন, আমি আমার জনগণকে এত ভালবাসতাম, তারাও আমাকে কত ভালবাসত–এদের ছেড়ে আমি যাবো না। ফেরেশতারা তাঁকে যতই বুঝান, আপনার সময় হয়ে এসেছে, আপনাকে যেতেই হবে, রাজা ততই বেঁকে বসেন। বলেন, আমি মারা গেলে গোটা দেশে কান্নার রোল পড়ে যাবে। আমি যেখানে যেতাম, সেখানে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হত। তারা আমাকে দেখার জন্য, আমার হাতের সামান্য ছোঁয়া নেয়ার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠত। তাছাড়া আমি তাদের উন্নতির জন্য কত কাজ করেছি–তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেছি–আপনারা জনমত যাচাই করে দেখুন, তারা কেউ চাইবে না–আমি চলে যাই।

ফেরেশতারা হাসলেন। বললেন, আপনি জানেন না ইতিমধ্যে সব কিছু উল্টে গেছে। আপনার কথা আজ আর কেউ মনেও করছে না। যারা মনে করছে, তারাও আপনার নিন্দাই করছে শুধু। রাজা প্রতিবাদ জানালেন, অসম্ভব, এ হতেই পারে না। কতজনের কত উপকার আমি

করেছি– দেশের মানুষের জন্য দিনেরাতে, সময়ে-অসময়ে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছি, আর তারা এর মধ্যেই সবকিছু ভুলে গেছে, ভুলে যাবে, এ হতেই পারে না।

ফেরেশতারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করলেন। তারপর রাজাকে বললেন, ঠিক আছে, আপনাকে তিন ঘণ্টা সময় দেওয়া হল, এই সময়ের মধ্যে আপনি যদি অন্ততঃ তিনজন লোককে খুঁজে দিতে পারেন যারা চায় আপনি বেঁচে থাকুন, তাহলে আপনার জীবন আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

রাজা লাফিয়ে উঠলেন। বললেন তিনজন কেন, তিন লাখ লোক যোগাড় করে দেব–দেখবেন, তারা সবাই চাইবে যেন আমি থাকি।

ফেরেশতাদের অনুমতি নিয়ে অতঃপর রাজা ভিন্ন মূর্তি ধরে বেরিয়ে পড়লেন। দেখলেন, গোটা রাজধানী জুড়ে আনন্দ-উল্লাসের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। রাজা অবাক হলেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ভাই, এত আনন্দ-উল্লাস কেন? লোকটা অবাক হয়ে বলল, আপনি কিছুই কি জানেন না? শোনেন নাই, আগের বদমাশ রাজাটা নিপাত গেছে। এখন এসেছেন নতুন রাজা গোটা দেশ নতুন রাজাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য এই আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করেছে।

রাজা বিরাট একটা ধাক্কা খেলেন। ভাবলেন, এবারে প্রাণের বন্ধু অমিয়াসের কাছে যাওয়া যাক। অর যারাই তাঁকে পরিত্যাগ করুক, অমিয়াস তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। কিন্তু অমিয়াসের বাড়ীতে গিয়ে রাজা আহাম্মক বনে গেলেন। কোথায় বন্ধুর বিয়োগে গোটা বাড়ী শোকবেশ ধারণ করবে, তা নয়, বরং অন্য আর পাঁচটি বাড়ীর চেয়েও এ বাড়ীতে যেন অনেক বেশী ফূর্তি-উল্লাস। কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করে রাজা জানতে পেলেন, আগের রাজার সাথে দোস্তি আর দহরম-মহরম থাকার কারণে অমিয়াসের প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়েছিল; কিন্তু তা তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। তিনি এখন নতুন রাজার পারিষদদের একজন। সে জন্যই আজ এই আনন্দ-উৎসব।

বিমর্ষ মুখে রাজা আবারও পথে নামলেন। চলতে চলতে চারদিক তাকাচ্ছিলেন। কানে আসছিল পথচারীদের কথা। কিন্তু কই, কেউতো তাঁর মৃত্যুতে এতটুকু শোক প্রকাশ করছে না। একটা পথের মোড়ে গিয়ে রাজা থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, একটা বাসার পাশে বাচ্চা একটা মেয়ে কাঁদছে। রাজা এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে খুকি, কাঁদছ কেন? কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি জওয়াব দিল, রাজা নাকি মারা গেছেন। বাড়ীর সবাই নতুন রাজাকে ফুলের মালা দিতে গেছে। এদিকে আমার পুতুলটার হাত ভেঙ্গে গেছে। ভাল করে দেওয়ার কেউ নাই। রাজাটা যদি মারা না যেত তাহলে ভাল হত। আমার পুতুলটা ভেঙ্গে যেত না।

ইতিমধ্যে এক ঘণ্টা গুজরে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে রাজা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বাঁক ঘুরে আরেক পথে এগুলেন। সামনেই জেলখানা। একটা লোক জেলখানার গেটে ছোট্ট একটা পুঁটলি হাতে আহাম্মকের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজা এগিয়ে গেলেন। দেখেই চিনতে পারলেন, এই সেই দাগী আসামী, মৃত্যুর মাত্র একদিন আগে তিনি একে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। লোকটি রাজাকে দেখেই এগিয়ে এলো। বললো–আচ্ছা ভাই, শুনলাম আগের রাজা নাকি নাই, নতুন রাজা এসেছে। এসেই সব জেলখানার দরজা খুলে দিয়েছে। সবাই চলে গেছে আনন্দ-উৎসবে। রাজা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তা তুমি চলে যাও নাই কেন? লোকটা বলল, কোথায় যাব, বুঝতে পারছি না।

এরপর রাজা আবার পথে নামলেন। ঘুরতে ঘুরতে পেরেশান হয়ে পড়েছেন। কোথায় যাবেন বুঝতে পারছেন না। ইতিমধ্যে দুঘণ্টা গুজরে গেছে। এই দুঘণ্টায় তিনি পেয়েছেন একট অবুঝ মেয়ে আর একজন মাত্র ফাঁসির আসামী–যারা চেয়েছে তিনি বেঁচে থাকুন। রাজার সারা শরীর রি রি করে উঠল। ভাবলেন, শেষ পর্যন্ত রাণীর কাছেই যেতে হবে; তাকে পেলেই তিনজন পূর্ণ হবে এবং তারপর বেঁচে উঠে তিনি সবাইকে দেখে নেবেন। কিন্তু রাণীর কামরায় ঢুকতে গিয়ে রাজা থমকে গেলেন। রাণী তখন অন্য এক পুরুষের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ। ভগ্নমনোরথ রাজা ফেরেশতাদের কাছেই ফিরে গেলেন। বললেন, না ভাই, আমি আর বাঁচতে চাই না। আমার মরাই ভাল।

গল্পটির মাধ্যমে লেখিকা মেরী কোলেরিজ কি বলতে ও কি বুঝাতে চেয়েছেন, তা নিয়ে অনেকে অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু কেউ কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নাই। তবে, এই গল্পটির কথা মনে হলেই আমার মনে পড়ে যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে ক্ষমতার হাতবদল আর সেই সাথে খাত বদলের পালা। আগেই বলেছি, শাসক আসবে, শাসক যাবেন কিন্তু দেশ থাকবে এবং থাকবে দেশবাসী। ভবিষ্যতে যাঁরা ক্ষমতার আসবেন, তাঁরাও যে ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে এই গল্পটি পড়ে কারো মনে যদি ক্ষণিকের জন্য হলেও কিছুটা ক্রিয়া কিংবা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহলেই শ্রম সার্থক মনে করব।[২১৭]

পরের সপ্তাহে ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম: 'স্থান-কাল-পাত্র' প্রকাশিত হয়। এই কলামে মন্তব্য করা হয় যে, স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে সংযম, সহনশীলতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা বজায় রাখায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেনি। তবে এই কলামে একই সঙ্গে সতর্ক করা হয় যেন অগণতান্ত্রিক কোনো নীতি বা সিদ্ধান্ত দেশবাসীর ওপরে চাপিয়ে দেওয়া না

হয়। কোন মহল বা গোষ্ঠী যাতে এই বিজয়কে পশ্চাদমুখী, অগণতান্ত্রিক এবং মানবাধিকারের পরিপন্থি করার সুযোগ না পায়। 'লুব্ধক' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

> এই কলাম যেদিন প্রকাশিত হচ্ছে সেদিন ১৬ই ডিসেম্বর– বিজয় দিবস। খুব সম্ভব এই দেশে এই প্রথমবারের মত বিজয় দিবস সম্পূর্ণ নতুনভাবে মূল্যায়ন হওয়ার অবকাশ পাচ্ছে। সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়–এই বিজয় দিবসের সাথে যুক্ত হয়ে যে নতুন মাত্রা লাভ করেছে–তাও এই মূল্যায়নের সপক্ষে কাজ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করতে চাই। বস্তুতঃ আজকের বিজয় দিবসের মূল্যায়ন এবারের মূল্যায়নের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবেই বিজড়িত। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। এবারের আন্দোলন, রক্তদান ও গণঅভ্যুত্থানেরও মূল লক্ষ্য সেটাই।
>
> অনেকে উভয় বিজয়কে 'বিপ্লব' হিসাবে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। আমরা এই আগ্রহের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে চাই এবং বলতে চাই, পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আমাদের উভয় বিপ্লবই ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বরং ৮০ দশকের শেষ পর্যায়ে এসে পূর্ব ইউরোপে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তাল জোয়ার লক্ষ্য করা গেছে এবং পরিণতিতে সে অঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে বিজয় অর্জিত হয়েছে এই অঞ্চলে সেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা ঘটেছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে–সেই ৭০ দশকের গোড়াতেই।
>
> ইতিমধ্যে শুধু পূর্ব ইউরোপেই নয়, এই দক্ষিণ এশিয়াতেও একাধিক দেশে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এসব 'পরিবর্তন' হয়ত 'বিপ্লব' অভিধায় চিহ্নিত করতে অনেকেই আপত্তি করবেন, কিন্তু গণতন্ত্রের আদর্শ ও মূল্যবোধের নিরিখে এসব পরিবর্তনকেও গণতান্ত্রিক 'বিপ্লবের' অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন পাকিস্তানের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের পরিবর্তন, ভারতের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, নেপালের রাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ শিথিল ও পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি, শ্রীলংকায় গণতান্ত্রিক সরকারের দাবীর মুখে সেখান থেকে বিদেশী সৈন্যের অপসারণ ইত্যাদি ইত্যাদি।
>
> বিপ্লব শব্দটা মূলতঃ ছিল গণতন্ত্রের নিজস্ব শব্দ। ফরাসী বিপ্লবের সেই ত্রয়ী শ্লোগান সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা– সেটাও ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই এক অনবদ্য উচ্চারণ। দুঃখের বিষয়, ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পরে, বিপ্লবের আবেগ-উত্তেজনায় প্যারিসের মোড়ে মোড়ে লিবার্টি দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে; কিন্তু লাগামহীন ভাবাবেগের কারণে ফ্রান্সের মাটিতে গণতন্ত্র সেদিন তেমনভাবে শেকড় গাড়তে পারে নাই। বরং আন্দোলন, বিজয়-উত্তেজনার তোড়ে সমাজের বুক থেকে

সুস্থির চিন্তা সৎবুদ্ধি ও রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতা খড়কুটার মত ভেসে গিয়েছিল। আর তারই জের ধরে রুশোভলটেয়ারের দেশ ফ্রান্সের বুকে সম্ভব হয়েছিল নেপোলিয়ানের (১৭৬৯-১৮২১) মত একনায়কের আর্বিভাব।

এর পূর্বেও ১৭৭৬ সালে আরেক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উন্মেষ আমরা দেখতে পাই আমেরিকায়। এই বিপ্লবেও কম রক্ত ঝরে নাই; কম লোক-ক্ষয় ঘটে নাই। কেননা এটা ছিল উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার গণতন্ত্রকামী জনগণের সংগ্রামী বিপ্লব। কিন্তু এই বিপ্লবকে নেতৃবর্গ গণতন্ত্রের আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হতে দেন নাই। জর্জ ওয়াশিংটন 'জেনারেল' ছিলেন ঠিকই; ব্যক্তিজীবনেও তাঁর মধ্যে কঠোরতা কম ছিল না; কিন্তু প্রথম সারির নেতৃবর্গের গণতান্ত্রিক চেতনা, গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আনুগত্য ও দৃঢ়তা রক্তাক্ত এই বিপ্লবের সকল ভাবাবেগকে সংযত ও সংহত করে তাকে পুরামাত্রায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ প্রদানে সক্ষম হয়েছিল। মার্কিন ইতিহাসে তাই এইসব ব্যক্তিত্বকে যৌথভাবে ফাউণ্ডিং ফাদার্স বা জাতির প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষের সম্মান ও মর্যাদার আসন প্রদান করা হয়েছে। আর 'বিপ্লব' বলতে যে পরিবর্তনের কথা বুঝায়- সেই বিপ্লবের সূচনার কথাই যদি বলতে হয় তাহলে স্মরণ করতে হয় বৃটিশ সিংহাসনের অধিকারী রাজা ২য় জেমস-এর (১৬৮৮-৮৯) ক্ষমতা খর্বকারী সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবের কথা।

কিন্তু পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লব সব বিপ্লবকে ছাপিয়ে গেল। মার্কসবাদ ও কম্যুনিজমের নামে এই বিপ্লব এবং বিপ্লব-পরবর্তী গোটা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে এতবেশী মানুষের মৃত্যুর কারণ হল যে, বিপ্লব বলতে অতঃপর মানুষ হত্যাকাণ্ড তথা রক্তাক্ত বিপ্লবকেই বুঝতে শুরু করল। কম্যুনিষ্টরা এভাবে গণতন্ত্রের একটি উচ্চ মূল্যবোধকে শুধু ভূলুণ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হল না–তারা 'বিপ্লব' এই শব্দটির অভিধা পর্যন্ত পরিবর্তন করে ছাড়ল। শুধু তাই নয়, গত ৭০ বৎসরের এই কম্যুনিজম-এর কিম্বা সমাজতন্ত্রের বিপ্লব বিশ্বের ইতিহাসকে ভাল কিছু দেওয়ার সাথে সাথে এমন কতকগুলি 'মন্দও' দান করেছিল–যার পরিণতিতে এসেছিল ৮০-র দশকের শেষ পর্যায়ের সমাজতন্ত্র তথ্য কম্যুনিজমের ধ্বংস ও বিপর্যয়।

গণতান্ত্রিকক বিপ্লব আর তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বা কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের মৌল পার্থক্য এখানে লক্ষণীয়। একটার ভূমিকা যেখানে পজিটিভ বা ইতিবাচক; অন্যটার ভূমিকা সেখানে নেগেটিভ বা নেতিবাচক। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেই ঘাপটি মেরে বসে থাকে গণতন্ত্রের আদর্শ-বিরোধী তথাকথিত অতিবিপ্লবীরা– যারা বিপ্লবের নামে বিপ্লবের মূল সত্যকে নস্যাৎ করতে চায়। এর মধ্যে নিহিলিজমের সুর চড়া গলায় গেয়ে গোটা বিপ্লবের

ধারাকেই তারা টেনে নিতে চায় নৈরাজ্যের সপক্ষে। একান্ত হালে পূর্ব ইউরোপে হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী ও রুমানিয়ায় একে একে যে বিপ্লব (অবশ্যই গণতান্ত্রিক বিপ্লব) ঘটে গেছে, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক– এই দুই ধারার বিপ্লবের মধ্যকার মৌল পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সংযম, সহনশীলতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা– সেটাই যুগে যুগে এই বিপ্লবকে অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। আর তাই, ৭০ বছরের মাথায় সকল রকম বিরুদ্ধ মত ও বিরোধিতা দমনকারী, মানবাধিকার হরণকারী, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন নস্যাৎকারী কম্যুনিস্ট/সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধ্বংসস্তূপের উপরে উড্ডীন হতে পেরেছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পতাকা।

আমাদের এবারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের মুখে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যসহ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ গণতন্ত্রের আদর্শকে সমুন্নত রেখে চলেছেন বলেই এই আন্দোলনে যতটা ম্যাসাকার হতে পারত বলে ধারণা করা হয়েছিল, তা হয় নাই; হতে পারে নাই। এই গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ যাতে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন হতে না পারে; বিপ্লবের নামে অগণতান্ত্রিক নীতি ও সিদ্ধান্ত দেশবাসীর উপরে চাপিয়ে দিয়ে কোন মহল বা গোষ্ঠী যাতে আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং তার এই বিজয়কে পশ্চাদমুখী, অগণতান্ত্রিক এবং মানবাধিকারের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করার অবকাশ না পায়– এই আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের গণতান্ত্রিক চেতনার নিকট এটাই আমাদের ঐকান্তিক আবেদন।[২১৮]

১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের সাপ্তাহিক নিয়মিত কলাম 'ঘরে-বাইরে' প্রকাশিত হয়। এই কলামে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিবিদ ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করা হয়, রাজনীতিবিদদের মনে রাখতে হবে যে জনসাধারণ না চাইলে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। আবার জনসাধারণেরও মনে রাখতে হবে, রাতারাতি কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। গণদাবি আদায়ের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সহনশীল হতে হবে। 'সন্ধানী' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

> জাহাজ নোঙ্গর তুলেছে গন্তব্যস্থল বহুদূর। উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে সে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে হবে। কাজটা সহজ নয়। যথেষ্ট কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন নাবিকের দক্ষতা এবং আবহাওয়া বুঝে ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এক্ষেত্রে বড় রকমের ভুল-চুক্ হলে আশা পেণ্ডোরার বাক্সও হয়ে পড়তে পারে।

প্রবল গণজাগরণের ভেতর দিয়ে সূচিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাহাজের হাল ধরেছেন প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদ। প্রশাসক এবং সৎ ও সাহসী মানুষ হিসাবে তাঁর পরিচিতি সর্বজ্ঞাত। জেলা ও মহকুমা প্রশাসক হিসাবে তিনি প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। তাঁর শাসিত জেলা ও মহকুমাসমূহ প্রশাসনিক শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করে। গণমানুষের বিপুল আস্থা নিয়ে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সংবিধান সম্মতভাবে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান এ সময়ের মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছেন। কামনা করেছেন দল-মত নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা। তিন জোট এবং ছাত্রঐক্য ছাড়াও অন্যান্য মহল এ ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

মূল কাজ তিন মাসের মধ্যে অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হলেও এর অর্থ অন্যান্য সমস্যা উপেক্ষা করা নয়। বাংলাদেশ সমস্যারই দেশ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে এর ঘা। এ অবস্থায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মধ্যে জরুরী কোন সমস্যা দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। সরকারকে দক্ষতা, আইন এবং নিয়ম-সিদ্ধভাবে এর সুরাহা করতে হবে। এরিমধ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বিতর্কিত স্বাস্থ্য ও শিক্ষানীতি বাতিল ঘোষণা করেছেন। বিশেষ ক্ষমতা আইন সম্পর্কেও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে। ধরে নেওয়া যায়, উপযুক্ত সময়ে এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এখানে 'উপযুক্ত সময়' কথাটা বললাম এজন্য যে, রাতারাতি সব কিছু করা যায় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বহু কাজ সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এ ব্যবস্থা ব্যক্তির মর্জিমাফিক চলে না। কোন একজন ইচ্ছে করলেই কিছু একটা করে ফেলতে পারেন না। তাকে দশদিক চিন্তা করতে হয়। আলোচনা করতে হয় বিভিন্ন জন ও মহলের সাথে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা সময় লেগে যায়। গণতন্ত্রকামী মানুষকে এ বৈশিষ্ট্যটুকু বুঝাতে হয়। আর হয় বলেই ধৈর্য ও সহনশীলতা গণতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। অতীতে এ সহনশীলতার পরিচয় দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম আড়াই-তিন বছর দেশে গণতন্ত্র ছিল। তখন এমন সব কাণ্ড-কীর্তি শুরু করা হয় যাকে উশৃঙ্খলতা ছাড়া কিছু বলার উপায় ছিল না। বিভিন্ন মহল একের পর এক দাবী পেশ করতে থাকেন। এবং সামর্থ্য-অসামর্থ্য বিচার-বিবেচনা না করে প্রতিটি দাবীর রাতারাতি সমাধান চান। এমনকি বিশ্বব্যাপী মহামন্দার অভিঘাতের বিষয়টিও বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়। পরিণতি কি দাঁড়ায়, ইতিহাস এর সাক্ষী। ইতিহাস থেকে তাই শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন তাঁর নিজের মত করেই দেশ চালাবেন। এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই। শুধু একটা কথাই বলার আছে যে, তাঁর শাসনকে মানুষ ভবিষ্যতে অনুসরণযোগ্য একটি মডেল হিসেবে দেখতে চায়। এক দিনের কাজ এক বছরেও হয় না–এর পরও তুষ্ট করতে হয়, এ অবস্থা অসহ্য। এটা দেশের জন্য শুভ নয় এবং উন্নতিরও সহায়ক নয়। মানুষ আশা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দু-চারটা কাজ যাই করুন, এমনভাবে করবেন– যা ভবিষ্যৎ নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের জন্য একটা শিক্ষার বিষয় হয়ে থাকবে। তাঁরা এ থেকে পাঠ গ্রহণ করে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দেশ চালাতে সক্ষম হবেন। দেশে ঘটবে নতুন উষার অভ্যুদয়। বলা বাহুল্য, এ আশা থেকেই মানুষ সংগ্রাম করেছে। প্রত্যেকে রাজাসনে বসে রাজা হওয়ার জন্য নয়। সাধারণ মানুষ জানে, বড় আমলার পদ বা বড় ব্যবসা তাদের জন্য নয়। তারা চায় ক্ষুধার অন্ন, পরনের কাপড়, উদার আকাশ আর নির্মল বায়ু। দেশব্যাপী অভূতপূর্ব বিজয় উৎসবের প্রেরণা এখানেই। লক্ষ্য করলে যে কেউ স্বীকার করবেন যে, এবার পরিবর্তন সূচিত হওয়ার সাথে সাথে নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে যে উল্লাস সৃষ্টি হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয় অর্জিত হওয়ার পর সৃষ্ট উল্লাস ছাড়া এমন আর হয়নি। ন'মাস স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জনতার প্লাবন নেমেছিল পথে-ঘাটে। মানুষের চোখে-মুখে ছিল নতুন দিনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন সফল হয়েছে–না, বিবর্ণ মলিন, তা কম-বেশী সবার জানা। বিস্তারিত আলোচনা অবান্তর। শুধু এটুকু বলার আছে যে, এবারও ঠিক একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে যে উল্লাস ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তা নিছক অনুভূতির বিষয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং জোটকে এ উল্লাসমুখর পরিবেশ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আশা ভঙ্গের বেদনা বড় দুর্বহ। এ বেদনা মানুষকে উন্নাসিক আর না হয় উদাস করে তোলে। তেমন অবস্থায় মানুষের মনে এমন অনাস্থার ভাব জাগে যে, তাকে টেনে তোলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। লক্ষ্য পথের একটা স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে মাত্র। অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। এ মুক্তি অর্জনের জন্য বহু কিছু করা দরকার। এর একটি হচ্ছে প্রশাসনকে গণমুখীকরণ। অসাধু পন্থায় কাড়ি কাড়ি টাকা কামানোর কাজে লিপ্ত গুটিকয় ব্যক্তির খেদমত করা যথার্থ প্রশাসন নয়। তদ্রূপ সংকীর্ণ স্বার্থে দুষ্টের আস্কারা প্রদান করাও নয়। দুষ্ট শিষ্ট হয় ক্বচিৎ। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন হয় বেশীর ভাগ সময়। সদ্য স্থগিত ঘোষিত আন্দোলনের সময়ও এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব বিষয়ে সতর্ক থেকেই সামনের দিকে পা বাড়াতে হবে। সাথে সাথে এ-ও মনে রাখতে হবে যে, কথা-বার্তায় সংযমের অভাব নানা অনর্থের জন্ম দেয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসংযত কথাবার্তা এরি মধ্যে শোনা যাচ্ছে। বক্তৃতা-বিবৃতি এবং প্রতিবেদনের মাধ্যমে এরা হালকাভাবে হলেও কাদা ছোঁড়ার চেষ্টা করছেন। এটা শুভ লক্ষণ নয়। পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। সবসময় পাপ করা হবে আর কোন সময়ই কিছু হবে না এতোটা আশা করা যায় না। তাই দর্পণে নিজেদের চেহারা দেখে নিজেদের সংশোধন করাই উত্তম– কাদা ছুঁড়ে গা হালকা করার চেষ্টা করা নয়।

বাংলা অভিযানে 'লুক্কায়িত বিবর' বলে একটা কথা আছে। এতে বাস করে এক শ্রেণীর বিষাক্ত জীব। এ জীবের কাজ হচ্ছে ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে সময় ও সুযোগ মত ছোবল মারা। আর এক শ্রেণীর জীব আছে সময় বুঝে যারা পরবর্তী ট্রেনের টিকিট কবজা করে। দুধ-কলা খেয়ে নধরকান্তি হওয়ার পর সময় বুঝে এরা বিপ্লবী হয় এবং জনতার ভিড়ে ঢুকে জনতাকে প্রকারান্তরে বিভ্রান্ত করে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার স্বার্থে এদের প্রতিও নজর রাখা প্রয়োজন। বার বার একই ভুল যারা করে তাদের পক্ষে জনগণের হিত সাধন করা সম্ভব হয় না।

মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল, পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু নিছক পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তন বাঞ্ছিত হতে পারে না। যে পরিবর্তনে মানুষের আশা পূর্ণ হয় না, দুঃখ রজনী গভীরতরই থেকে যায়, এর কোন সার্থকতা নেই। তত্ত্বাবধায়ক এবং পরবর্তীকালে যারাই সরকার গঠন করুন, তাদের এ বিষয়টি সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন। জনতা কেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তা ভুলে যাওয়াও অকল্যাণকর। জনতা আজ জেগেছে আর কোনদিন জাগবে না, এমন মনে করা প্রচণ্ড গার্দভ্যপনা। তাই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সর্বোচ্চ ঠাঁই দিতে হবে। জনগণকেও মনে রাখতে হবে যে, রাতারাতি কিছুই সম্ভব নয়। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে তাদেরও ধৈর্য ধরতে হবে। রাজনৈতিক খেলা রাজনীতিসুলভ করতে হবে। এমন একটা ব্যবস্থা নিশিচত করতে হবে–যাতে একটি সরকার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পায় এবং সংবিধানসম্মতভাবে নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রাপ্তি এবং জনগণের আশা পূরণের মধ্যেই সব ত্যাগের সার্থকতা নিহিত।[২১৯]

পরের সপ্তাহে ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম: 'ঘরে-বাইরে' প্রকাশিত হয়। এই কলামে সরকার এবং স্বৈরাচারবিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলকে সতর্ক করা হয় যে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর স্বৈরাচারের বর্ণচোরা সহচররা আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। তাদের জাতির সামনে ধিক্কৃত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা দরকার। অন্যথায়

সুযোগ পেলেই তারা আবার পুনর্বাসিত হয়ে অপতৎপরতা শুরু করবে। 'সন্ধানী' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

> সবকিছুরই একটা সময় আছে। সমস্যা নিয়ে আলোচনাও তাই। গরীব দেশে এমনি সমস্যার আকাল থাকে না। এর উপর যুগব্যাপী শাসন যদি জনগণের প্রাথমিক চাহিদা পূর্ণ করার অনুকূল না হয় তবে তো কথাই নেই। নাক পর্যন্ত ডুবে যাওয়ার উপক্রম ঘটে। কোন যাদুমন্ত্র বলে রাতারাতি এর সমাধান করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন চাহিদার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে, উচ্চ পর্যায়ে কৃচ্ছ্রসাধন। এবং গোটা স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থে কাজ করা।
>
> অন্তর্বর্তীকালীন কোন সরকারের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব সীমিত ও নির্দিষ্ট। এর বাইরে যেটুকু তা হলো দৈনন্দিন কাজ দেখা-শোনা করা। বর্তমান সরকারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। গোটা প্রশাসন ঢেলে সাজানো বা দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা এ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সংবিধানসম্মতভাবে তিন মাসের মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা এ সরকারের মূল দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালন করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। বিভিন্ন মহল থেকে বিপুল সাড়াও পাওয়া গেছে। দু-একটা ক্ষুদ্র মন্ত মহল অবশ্য বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। তবে তা যত না দেশের স্বার্থ, এর চেয়ে বেশী নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থে। এর পেছনে সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তার চেতনা খুব কম।
>
> অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করা এ সরকারের মূল দায়িত্ব হলেও বিপুল গণদাবীর প্রেক্ষিতে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উচ্চপর্যায়ে রদবদল এর মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন মহলের তথ্য হতে অনুমান করা যায় যে, সরকার আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এর প্রকৃতি কি তা জানা যায়নি। তবে একটা কথা বলা দরকার যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই চলার একটা স্বাভাবিক গতি আছে। যানবাহনও এর বাইরে নয়। অনেক যানবাহন আছে–যা ঘণ্টায় সত্তর-আশি মাইল চলতে সক্ষম। কিন্তু সে গতিতে চলতে দেওয়া হয় না। স্থানে স্থানে স্পীড ব্রেকার তৈরী করে গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্ঘটনা এড়ানো। পথঘাটের অবস্থা চিন্তা না করে ছুটতে আরম্ভ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে বলেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, জীবনের সবক্ষেত্রেই কথাটা কম-বেশী সত্য। মুক্ত এবং সমস্যাপীড়িত মানুষ পরিবর্তনের মধ্যে তার আশার পূর্ণতা দেখবেই। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু আশা পূর্ণ করার দায়িত্ব যার বা যাদের উপর ন্যস্ত, তাদের চিন্তা করা

প্রয়োজন কাজটা কত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এ মাত্রাজ্ঞান থেকেই পদক্ষেপ নেওয়া এবং মানুষকে আশাবাদী করে তোলা মঙ্গলজনক। ব্যতিক্রম কিছু করতে গেলেই হিতে বিপরীত হতে পারে। অতীতে এ ধরনের একটি পরিবর্তন ঘটার পর জনতার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এর কোন তাল-লয় ছিল না। সরকার জনগণকে বাস্তবের প্রতি আকৃষ্ট না করে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন। পরিণতি হয়েছিল তপ্ত কড়াই হতে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া একই নাটকের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং জন-প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রত্যাশী প্রতিটি ভোট এবং দলের কথাবার্তায় সংযমী হওয়া আবশ্যক। দরকার জনগণকে প্রতিটি পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলা কথাটা আমরা বলছি এ জন্য যে, এরই মাঝে বিভিন্ন দাবী উঠতে শুরু করেছে। সরকারও বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। হয়তো আরো নেবেন। এ সব যাতে অতিরিক্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে না পড়ে, এর জন্য প্রয়োজন সতর্কতা।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাবধানে 'পা' ফেলা দরকার। বিশেষ করে বর্ণচোরাদের ক্ষেত্রে। '৭১ সালের ষোলই ডিসেম্বর ঢাকা পৌঁছার পর বোধ হয়েছিল ষোড়শ বাহিনীর অরণ্যে হারিয়ে গেলাম। কে যে সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা সেটাই বুঝে উঠা দায় হয়ে পড়েছিল। ক'বছর না যেতে এ ষোড়শ বাহিনীর বর্ণচোরা ব্যক্তিরাই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেউকেটা হয়ে উঠে। সাম্প্রতিক পট-পরিবর্তনের পরও একই আলামত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দীর্ঘ এক যুগের বেশী সময় ধরে যারা বিভিন্ন সরকারের স্তাবকতা করে বিভিন্ন সংগঠনের নেতা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, এরাই আবার ভোল পাল্টে হয়েছে তৎপর। কণ্ঠে এদের বিপ্লবী শ্লোগান এবং পূর্ববর্তী সরকারের নিকুচি। কথায় কথায় এরা এখন স্বৈরাচার নিপাত করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের কণ্ঠ এত উচ্চ এবং কনুই ধাক্কা এতো প্রবল যে, বলার নয়। এদের বিশ্বাস করা উচিত কিনা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বিরোধী দল ও জোটগুলোর তা চিন্তা করার বিষয়। নিমকহারামি যে করে, সে সব সময়ই করতে পারে। দেশে স্বার্থে অন্ততঃ একবার এদের চিহ্নিত করা ও ধিক্কৃত করা প্রয়োজন। না হলে আবার কোথায় এরা কি করে বসবে বলা কঠিন।

আগেই বলেছি, সমস্যার কথা বলার উপযুক্ত সময় এখন নয়। তবু জীবনের বাস্তবতা এতোই কঠিন যে, ইচ্ছে করলেও সব সমস্যার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তাই বাধ্য হয়েই মানুষের একটি আশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশাটি হলো, জিনিসপত্রের মূল্যের স্বাভাবিক দর-দাম। জিনিসপত্রের দাম এখন আকাশছোঁয়া। চাল-ডাল থেকে এমন কোন জিনিস নেই– যাকে সুলভ বলা যায়। আটক আনার বেগুনের সের চৌদ্দ টাকা, পেঁয়াজ প্রতি সের আটাশ-ঊনত্রিশ টাকা। চাল-ডাল সব ক্ষেত্রেই এক অবস্থা। কোন জিনিসের দামই সাধারণ

মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নেই। এ মানুষকেই আবার বহন করতে হচ্ছে ষ্ট্যাম্পের ভারী বোঝা, মাত্র পক্ষকাল আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গ্রাম-বাংলার করুণ ছবি তুলে ধরা হয়েছে। নিদারুণ সংকটে মানুষ বাধ্য হচ্ছে আগাম শ্রম-বিক্রি করতে। মহাজনের দ্বারস্থ হয়ে এরা নিজেরাই এ প্রস্তাব করছে। আর্থিক অবস্থা কতোটা খারাপ হলে এ সম্ভব হতে পারে তা সহজবোধ্য। এর প্রতিকার করার জন্য আমরা টেষ্ট রিলিফ ও খাদ্যের বিনিময়ে কাজের কর্মসূচী আরম্ভ করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। এখন আমন ফসল উঠছে। ক্ষেত-খামারের কাজ কিছু বেড়েছে । ভূমিহীন লোকও কিছু না কিছু আয় করার সুযোগ পাচ্ছে। এর অর্থ এ নয় যে, টেষ্ট রিলিফ ও খাদ্যের বিনিময়ে কাজের কর্মসূচী চালু করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। দেশের যা অবস্থা, এতে এ ধরনের কাজের প্রয়োজন সহসা ফুরিয়ে যাবে না।

তিন মাস বা ছ'মাস একটা জাতির জন্য দীর্ঘ সময় নয়। দেখতে না দেখতে সময় পার হয়ে যাবে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে নির্বাচনী তোড়জোড়। কোন কোন জোট এরি মধ্যে মনোনয়নপত্র আহ্বান করেছেন। পত্র-পত্রিকায় নোটিস মারফত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার এ সম্পর্কিত স্পষ্ট ঘোষণা দেবেন বলে ধরে নেওয়া যায়। একটি মহল সূত্রে এ-ও জানা যায় যে, সরকার নির্বাচনী ব্যয় সীমিত করার ব্যবস্থা নিতে পারেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ দিক। আজকাল নির্বাচন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দশ লাখ টাকার নীচে চিন্তাই করা যায় না। কেউ কেউ কোটি টাকার বেশীও ব্যয় করে থাকেন। এর অপকারিতা প্রধানতঃ দুটি। এক, ব্যয়-বহুল হওয়ায় বহু সৎ এবং যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে পারেন না। দুই, কোটি টাকা খরচ করার পেছনে থাকে সামাজিক ও আর্থিক সুবিধা আদায় করার চিন্তা। কেউ কেউ বিভিন্ন শিল্পপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা গ্রহণ করেন। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি একটা 'এলিগেশন' দাঁড়িয়ে যায়। নির্বাচিত হওয়ার পর উক্ত ব্যক্তির অন্যায় আবদারও তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। অন্যদিকে কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচিত হওয়ার পর মথায় থাকে টাকা তোলার চিন্তা। ফলে দেশের কাজ অপেক্ষা মুনাফাসহ নিজের টাকা উসুল করার চিন্তা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করার ব্যবস্থা এ দুই প্রবণতা দূর করতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ সব বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেবেন বলার উপায় নেই। তবে প্রত্যেকেই আশা করে–যে দু-চারটি কাজই তারা করুন, সে যেন অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।[২২০]

১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের সাপ্তাহিক নিয়মিত কলাম 'পথে-প্রান্তরে' প্রকাশিত হয়। এই কলামে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে,

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর শুধু একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই শেষ কথা না হয়। এটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। তাই দেশের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হওয়ার জন্য সব রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এই কলামটিতে। 'পথচারী' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

> গণআন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উঁচু মঞ্চ থেকে জেনারেল এরশাদের পতন হয়েছে। এত সহজে তাঁর পতন হবে এটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। তবে তাঁর আগমন ও প্রত্যাগমনের মধ্যে যথেষ্ট কারণ না দেখিয়েই একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এবার তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন গণআন্দোলনের রূপ নেয়, তখন তিনি আকস্মিকভাবে পদ ছেড়ে দিলেন। তাঁর এই আসা-যাওয়ার সাথে জেনারেল আইউবের আসা-যাওয়ার কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে। ব্যতিক্রম এই, আইউব খান একজন জেনারেল হিসাবে ক্ষমতা দখল করে যাবার সময় আর এক জেনারেলের হাতেই ক্ষমতা দিয়ে গিয়েছিলেন। জেনারেল এরশাদ তা পারেননি, তাঁকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়েছে জনতার কাছে কিংবা বলা যায় জনতার অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে। জেনারেল এরশাদ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর মনে কতটা আনন্দ হয়েছিল জানি না, তবে তিনি যেভাবে চলে গেলেন তাতে তাঁর বিদায়ের মুহূর্তটি যে আনন্দের ছিল না, তা হলপ করে বলা যায়। দীর্ঘ ন'বছর কী দাপটেই তিনি সরকার চালিয়েছেন। তাঁর ভয়ে বাঘে-মোষে এক ঘাটে পানি খেয়েছে। জনসভায় মন্ত্রী থেকে শুরু করে দলের নেতা সবাই জনগণের উদ্দেশে বক্তৃতা করার পরিবর্তে বক্তৃতা করেছেন তাঁর উদ্দেশে। সবটাই গুণ-কীর্তন। আসলে তাঁর আমলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ ছিলেন না। ছিলেন নিজেই। একনায়কতন্ত্রে ভুল হয় বেশী। দুর্নীতি হয় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁর আমলেও তাই হয়েছে। তিনি একবার কথা প্রসঙ্গে এক সাংবাদিককে নাকি বলেছিলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে ক্ষমতা ভোগ করেন তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা ভোগ করেন তিনি। তিনি সত্য কথাই বলেছেন। কেননা, 'যুক্তরাষ্ট্র 'চেক এণ্ড ব্যালান্স' আছে। আছে সিনেট, কংগ্রেস। উপরন্তু জনগণ অত্যন্ত সচেতন। প্রেসিডেন্ট ভুল কিংবা অতিরিক্ত করতে গেলেই তাঁরা টেনে ধরেন। মধ্যপ্রাচ্যে প্রেসিডেন্ট বুশের ভূমিকা দেখেই ব্যাপারটি অনুমান করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে প্রেসিডেন্টের বাড়া-বাড়ি রুখবার মত কোন প্রতিষ্ঠান নেই। জাতীয় সংসদ বলে যে গণপ্রতিনিধি সংস্থা রয়েছে তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। প্রেসিডেন্টকে একনায়ক হাতে বাধা দেয়ার মত ক্ষমতা তার নেই। অন্যদিকে যে প্রক্রিয়ায় বহুদিন

যাবৎ দেশে নির্বাচন হয়েছে তাতে জনগণের ভোটাধিকার অস্বীকৃত ও অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। আর এ জন্য কিছু কিছু ভাল ও যোগ্য লোকের পাশাপাশি সংসদ সদস্য হয়ে এসেছে মস্তান প্রকৃতির লোক। আমি আমার নিজের এলাকার একটি উদাহরণ দেই। গত নির্বাচনে এই এলাকা থেকে এক মাস্তান তরুণ অস্ত্রবাজি, বোমাবাজি ও বুথ দখল করে নির্বাচিত হয়েছিল। নির্বাচনের পূর্বে এলাকার সঙ্গে তার কোন পরিচয়ও ছিল না। একজন এলাকাবাসী আমাকে কথা প্রসঙ্গে ঐ এমপি ছেলেটির নামোল্লেখ করে বলেছিলেন, আমাদের কাছে জাতীয় সংসদ ও সরকারের প্রতীক এই ছেলেটি। ক্ষমতায় আরোহণ ও নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ যে ভ্রান্ত ও বিকৃত প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছিলেন তা জনগণের মনঃপূত ছিল না। সম্ভবত সে কারণে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ নাগরিকদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এবং তাঁর স্বৈরশাসনের আকস্মিক অবসান ঘটেছে সে কারণে।

বলা বাহুল্য, এই আন্দোলনে অতীতের মত এবারও ছাত্রসমাজ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। তবে তাদের এবারকার আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক ছিল না। ছিল শিক্ষা আন্দোলনও। স্বাধীনতার পর দেশে যে সম্প্রদায়টি সবচেয়ে বেশী অবহেলিত হয়েছে তারা এই ছাত্র সম্প্রদায়। বড় চক্রান্তের শিকারও হয়েছে তারা। বিভিন্ন মহল নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের ব্যবহার করেছে। তবে শিক্ষাঙ্গনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে অস্ত্র। গোড়া থেকে এমনিতে এক শ্রেণীর তরুণের হাতে অস্ত্র ছিল। পরে আরো অস্ত্র ও অর্থের যোগান দিয়েছে সরকারের একটি বিশেষ এজেন্সী। ফলে বিভিন্ন ছাত্রদলের ছদ্মাবরণে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্ত্রের মহড়া হয়েছে, বহু তরুণের জীবন প্রদীপ অকালে নিভে গেছে এবং এক পর্যায়ে ছাত্র রাজনীতি এদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেশন জটের পেছনে অন্য অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা বড় কারণ। এ পর্যায়ে ছাত্রদলগুলোর মধ্যেকার মত পার্থক্য ভুলে গিয়ে এই চক্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এক্ষেত্রে ডাকসুর উদ্যোগটি ছিল সময়োচিত। ছাত্রসমাজের ঐক্য না হলে একনায়কতন্ত্রের অবসান হ'ত বলে মনে হয় না। দেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে ঐক্য এখন দেখা যায় তাও সৃষ্টি হত না। তবে ছাত্র আন্দোলনের একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেহেতু এটি একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন। তাই একপর্যায়ে এসে স্বাভাবিক নিয়মে তারা আন্দোলনের দায়িত্ব রাজনীতিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। রাজনীতিকরা এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে তা পরিচালিতও করেছেন। তাঁদের সাহায্য করেছেন শিক্ষক, সাংবাদিক, পেশাজীবী ও অন্যরা, ইতিমধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সরকারের দায়িত্ব দেশ ও প্রশাসন

আগলে রাখা এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণ প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা। তবে এই সরকারের গত কয়েকদিনের ভূমিকায় জনগণের মধ্যে কিছু কিছু সমালোচনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। কেউ বলছেন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান পক্ষপাতহীন নন। কেউ বলছেন তিনি স্থায়ী সরকারের মত আচরণ করছেন। সম্ভবত এ রকম এক ক্রান্তিকালে সরকার পরিচালনায় যে বিচক্ষণতা প্রদর্শন আবশ্যক, অভিজ্ঞতার অভাবে হয়তো তা অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান এখনো প্রদর্শন করতে পারেননি। সামনের দিনগুলো শুধু তাঁর জন্যই নয়, সমগ্র জাতির জন্য সংকটপূর্ণ। সে কারণে তাঁকে সাহায্য করার জন্য এখন প্রয়োজন প্রাজ্ঞ-বিচক্ষণ উপদেষ্টা। অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কেননা, এই আন্দোলন যত না ছিল এরশাদ উৎখাত আন্দোলন, তারচেয়ে বেশী হ'ল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। দেশে গণতন্ত্রের ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরই কেবল এ আন্দোলনের সমাপ্তি হতে পারে।

তবে তিন মাসের এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার গুরুত্ব অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভূমিকা থেকে কোন অংশে কম নয়। বিশেষ করে শীর্ষস্থানীয় প্রধান দু'টি জোট ও দলের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, ভূমিকা সবকিছু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেই নয়, আগামী নির্বাচন ও দেশের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক ধারাকেও প্রভাবিত করবে। সেজন্য তাঁদের উচিত হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থাকতে সহযোগিতা করা এবং এই তিন মাসের মধ্যে জনগণ ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ও সংযমবোধ চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা। বলা বাহুল্য, ক্ষেত্রটিতে আমরা দারুণভাবে পিছিয়ে আছি। অতীতে কোন কোন সময় এক একটি রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া দেখে দারুণভাবে হতাশ হতে হয়েছে। কেননা, সেখানে গণতান্ত্রিক ধারা ব্যাহত হওয়ার লক্ষণই দেখা গেছে। পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ কোন বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দলের প্রেসিডেন্টের ওপর অর্পণ করেছে।

এই প্রক্রিয়া গ্রামের মাতবর ও শহরের সর্দারদের সালিস ও শাসন প্রক্রিয়ার মত। এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত তা সঠিক হোক বা না হোক, তাই সঠিক বলে সকলকে মানতে হয়। এই প্রক্রিয়া কোনক্রমেই গণতন্ত্রসম্মত নয়। এই প্রক্রিয়া ব্যক্তির মধ্যে একনায়কত্ব ও স্বৈরতার জন্ম দেয়।

বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করে বলাই ভাল। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব রয়েছে তা নিশ্চয়ই বলা যাবে না। হতে পারে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত হতে পারছেন না। মত পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। এ

পরিস্থিতিতে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গণতান্ত্রিক নিয়ম, কিন্তু এটি যে সব দলে সব ক্ষেত্রে ঘটে তা নয়। বস্তুত সে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা নেই, সে দলের দ্বারা দেশে গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন ও সংরক্ষণ সত্যই কষ্টকর। বিশেষ করে এই ধরনের দল যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, দেখা গেছে, তাদের নেতা বা নেতারা একশ্রেণীর তোষামোদনকারী ও সুবিধাবাদী লোকদ্বারা পরিবৃত হন। দেশ ও সমাজ সমস্যার সঠিক চিত্র তুলে ধরার প্রকৃত লোক আর তাঁদের কাছে পাওয়া যায় না। নেতা জনগণ থেকে তো বটে, দলের সৎ কর্মীদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরিশেষে তিনি স্বৈরশাসকে পরিণত হন এবং ধীক্কৃত হন।

এখন দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, অবাধ নির্বাচন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। নির্বাচনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা শেষ হয়ে যায় না। গণতন্ত্র আসলে একটি উচুমানের মূল্যবোধ। ব্যক্তির মধ্যে, নেতার মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ না থাকলে ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করে তা সে রাজনৈতিক দল হোক কিংবা সরকার বা প্রশাসন হোক, সেখানে গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমাদের মত দেশে বৃটেন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক ধারা রাতারাতি সৃষ্টি হবে তা মনে করি না। তবে যেহেতু দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে তাই মনে করি, প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের নেতা ও কর্মীরা অবাধ নির্বাচনই নয়, দেশের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবেন। বিশ্বাস, রাজনৈতিক দল ও তাঁর নেতাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় হলে প্রশাসনসহ সমাজের সর্বস্তরে তার প্রতিফলন ঘটবে। পাকিস্তান আমলের চব্বিশ বছর এবং বাংলাদেশ আমলের উনিশ বছরের গণতান্ত্রিক সংকট দেখে গণতন্ত্রের পক্ষে এ বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হবে এ আশা আমরা অবশ্যই করতে পারি।[২২১]

১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের সাপ্তাহিক নিয়মিত কলাম 'চতুরঙ্গ' প্রকাশিত হয়। এই কলামে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। ছাত্রদের দেশ ও জাতির সম্পদ অভিহিত করে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ব্যবহার না করার জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। 'সুহৃদ' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

> গণআন্দোলনের জোয়ারে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। যা মনে করা হত দুর্ভেদ্য দুর্গ, তাসের ঘরের মতো তা ভেঙ্গে পড়েছে। নব্বই'র গণ-আন্দোলনে নতুনভাবে

আর একবার প্রমাণিত হল যে স্বৈরাচার যত ক্ষমতাশালী আর কৌশলী হোক, জনগণের শক্তি ও রুদ্ররোষের কাছে তা টিকতে পারে না। বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, ছেষট্টি সালের ছয়দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসে এইবার জনগণের শক্তি, সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের আরো একটি অধ্যায় যুক্ত হল।

এইবারের গণ-আন্দোলনে দেশের সর্বস্তরের জনগণেরই অংশগ্রহণ ও সমর্থন ছিল। বরাবরের মত এইবারও ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল আপোষহীন ও অনমনীয়। স্বৈরাচার উৎখাত না করে ঘরে ফিরব না, এই ছিল তাদের ঘোষণা তারা তাদের সেই কথা রক্ষা করেছে। স্বৈরাচারের পক্ষে স্বাক্ষর অভিযান চালিয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নস্যাতের চেষ্টা হয়েছিল। কিছু ছেলেকে অস্ত্র ও অর্থ যুগিয়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে চেষ্টা হয়েছিল ছাত্রদের দমিয়ে দেওয়ার; কিন্তু বৃহত্তর ছাত্র সমাজের অনমনীয় সঙ্কল্পের কাছে কোন চেষ্টাই টেকেনি। ব্যর্থ হয়ে গেছে টাকার খেলা। অস্ত্রের সন্ত্রাস। এইবার দেশের প্রতিটি ক্যাম্পাস ছিল গণ-আন্দোলনের একেকটি দুর্জয় ঘাঁটি। আন্দোলনের শুরুতে দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে স্বৈরাচার উৎখাতে আলাদা আলাদা অবস্থান গ্রহণের মনোভাব ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সেই মনোভাব অপনোদন ও দৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতেও অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

এই বারের আন্দোলনে ছাত্র সমাজের বিশেষ ও অনন্য ভূমিকাটি আলাদাভাবে উল্লেখ করার কারণ আছে। পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়া এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন সমাবেশে স্বৈরাচার বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে ছাত্রসমাজের রয়েছে আপোষহীন ভূমিকা ও অবস্থান নেওয়ার রেকর্ড। অথচ দেখা গেছে, স্বৈরাচারী সরকার তো বটেই, এমনকি গণ-আন্দোলনের ধারায় প্রতিষ্ঠিত সরকারও সময়ে ছাত্র সমাজের অবদান, সমস্যা ও দুরবস্থার কথা মনে রাখে না। ছাত্র সমাজ যেন ক্ষমতায় যাওয়ার ঘুঁটি। অতীতে দেখা গেছে, স্বৈরাচারী চরিত্র অর্জনের পর অতীতের প্রতিটি সরকার নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কাজে ছাত্রসমাজের একটি ক্ষুদ্র দুর্নীতিপরায়ণ অংশকে ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হয়। অর্থ ও অস্ত্র যুগিয়ে কিছুসংখ্যক ছাত্রকে বানান হয় গুণ্ডা-মাস্তান। স্বৈরাচারের প্রয়োজনের সময় তাদেরকে বৃহত্তর ছাত্রসমাজের বিপক্ষেই ব্যবহার করা হয়। এইবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সন্ত্রাসের মুখে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য বৃহত্তর ছাত্রসমাজের বিপক্ষে ছাত্র নামধারী কতিপয় গুণ্ডা ও মাস্তানকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ মিলনের রক্তে ভিজে গেছে বাংলার মাটি।

ছাত্র সমাজ বরাবরই উপেক্ষিত। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তারা রক্ত দেয়। দেখায় সংগ্রাম ও ঐক্যের পথ। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগায় মোমেন্টাম বা সর্বোচ্চ প্রেরণা। অথচ পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অতীতের কোন সরকারের আমলেই তাদের সমস্যা ও দুরবস্থার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। এজন্যেই দেখি স্বল্প শিক্ষিতের এই দেশে ৭৫ লক্ষ শিক্ষিত যুবক আজ বেকার। সেশন জ্যামে আটকা পড়ে গেছে ছাত্রদের চারটি অমূল্য বছর। দেশ দু'দুবার স্বাধীন হয়েছে, অথচ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্বাধীনতা ও শাশ্বত মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন সিলেবাস আজ পর্যন্ত তৈরী হতে পারল না। অতীতের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, এই দেশে বিভিন্ন সরকারের আমলে যাদের শিক্ষামন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়েছে, দু'একজন বাদ দিলে তাঁদের সবাই রাজনেতিক সুযোগ-সন্ধানী ও টাউটের বেশী কিছু নন। এঁরা মন্ত্রী হয়ে শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের বদলে ক্যাম্পাসে খোকা-পাঁচপাত্তুরদের তৈরী করেছেন। সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার যে কতোটা জরুরী তা তারা কোনদিন বিবেচনার মধ্যে স্থান দেননি। ছাত্রদের সমস্যাও বরাবর উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

ছাত্রদের বহুবিধ সমস্যা। বছরের বেশীরভাগ সময়ই তাদের ক্লাস হয় না। এক শ্রেণীর শিক্ষক আছেন, পড়ানো ছাড়া যাবতীয় কাজে ও অকাজে তারা ব্যস্ত। ক্লাস নেওয়ার তাদের সময় কই? এই শ্রেণীর শিক্ষক পরীক্ষার খাতাও ঠিক সময়ে ফেরত দেন না। ঠিক সময়ে খাতা ফেরত না দিলে যখন পার পাওয়া যায় তখন আর সময়সূচী ঠিক রাখার গরজ কি? দিব্যি এই শ্রেণীর শিক্ষকেরা আছেন। তারা বিপ্লব করেন, লাল, নীল, সুবজ গ্রুপের রাজনীতি করেন, এনজিও'র কাজ করেন–বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিন প্রক্রিয়ায় কোথাও তাদের কৈফিয়ত দিতে হয় না। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সেশন জ্যাম হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে বেশীর ভাগ শিক্ষকের নিয়মিত ক্লাস না নেওয়া, সময়মত খাতা না দেখা ও খাতা ফেরত না দেওয়া এবং ছাত্রনামধারী গুণ্ডা-মাস্তানদের যখন-তখন শ্রেণীকক্ষে তালা দিয়ে দেওয়া। দুঃখের বিষয় হল, অতীতে কোন সরকারই এই বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দেয়নি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন বেশীরভাগ সময় ক্লাস হয় না, এই ব্যাপারেও কোন সরকার আজ পর্যন্ত একটা বক্তব্য দিয়েছে বলে জানা নেই। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের বেশীরভাগ সময় ক্লাস না হওয়া, সময়মত পরীক্ষার খাতা না দেখা, বার বার পরীক্ষার তারিখ পিছানো,–এই গাড্ডার মধ্যে পড়ে ইতিমধ্যে ছাত্রদের চারটি অমূল্য বছর বিসর্জিত হয়েছে। টাকার হিসাবে এই ক্ষতি হয়তো কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি। কিন্তু সময় ও মেধা অপচয়ের হিসাবে এই ক্ষতি

অপূরণীয়। বলতে গেলে সেশন জ্যামে পড়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎই অনিশ্চিত হয়ে দেখা দিয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পথ ধরে যারা এই দেশ শাসনের ভার পাবেন তারা কি স্বৈরাচার উৎখাতে ছাত্রদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অগ্রণী ভূমিকাটি মনে রেখে ছাত্রদের সমস্যা ও দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেবেন? অর্থ ও অস্ত্র বিলিয়ে ছাত্রদের খোকা-পাঁচপাণ্ডুর, নীরু-অভি বানানো আর যেন না হয় নতুন প্রজন্ম তৈরীর জন্য চাই জাতীয় ও শাশ্বত মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সিলেবাস,–এই সিলেবাস প্রণয়নে যেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ডিগ্রী-সর্বস্ব। এই পদ্ধতি না পাল্টালে পরীক্ষার নকলবাজি বন্ধ হবে না, বন্ধ হবে না সত্যিকার কিছু শেখার বদলে মুখস্থ জিনিস উগড়ে যেনতেন প্রকারে পরীক্ষা বৈতরণী পার ও ডিগ্রী লাভের চেষ্টা। আগামীতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পথ ধরে যাঁরা এই দেশ শাসনের ভার পাবেন, তাঁরা কি অধিকার ও দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির জন্য এই ডিগ্রী সর্বস্ব পরীক্ষা পদ্ধতি বদলাবেন এবং প্রবর্তন করবেন তেমন একটি পরীক্ষা পদ্ধতি– যেখানে ফাঁকি দেওয়া যায় না? বর্তমানে সেশন জ্যামই ছাত্রদের জন্য সবচে' প্রকট সমস্যা। আমরা আশা করব, আগামীর নির্বাচিত সরকার বিশেষ ব্যবস্থাধীনে এই সেশন জ্যাম দূর করার কার্যক্রম নেবেন। ছাত্র সমাজ স্বৈরাচার উৎখাতে যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেশন জ্যাম দূরীকরণ এবং সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করতে পারলে তা হবে নির্বাচিত সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্র সমাজের জন্য সমুচিত উপহার।

ছাত্রদের জন্য শিক্ষাগত সমস্যা ও জটিলতা ছাড়াও রয়েছে পাস করে চাকরি বা কাজ না পাওয়ার হতাশা। চোখের সামনে তারা পরিবারের দুর্দশা দ্যাখে। দ্রব্যমূল্য হু হু করে বেড়ে চলেছে। পাস করে বেরিয়ে একটা কোন কাজ যে পাওয়া যাবে তার সম্ভাবনা দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। কি করবে তারা? পরিবারের দুর্দশা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে?

দেশে পঁচাত্তর লাখ শিক্ষিত বেকার রয়েছে। বেকারত্বের সীমায় পা রাখতে চলেছে, এমন লোকের সংখ্যাও কয়েক লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এরা বর্তমানে ছাত্র। আগামীকাল বেকারের খাতায় নাম লেখাবে। অতীতে কত সরকার এল- গেল, কোন সরকারই বেকার সমস্যা দূরীকরণে জরুরী কার্যক্রম নেয়নি। নেওয়ার গরজও দেখায়নি। দেখাবার দরকারইবা কি? স্বৈরাচারের আওতায় জনগণ নয়, ব্যক্তিই ক্ষমতার উৎস। ব্যক্তির তোয়াজ-তোষামোদ করা এবং তার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণই তখন হয়ে দাঁড়ায় সরকারের মন্ত্রী ও প্রশাসনের আমলা-কর্মচারীর প্রধান

কাজ। এর সাথে যোগ দেয় একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ শ্রমিক নেতৃত্ব। জনগণের ডাল-ভাতের সমস্যা দূর করার বদলে রাজনীতিতে স্থান পায় ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের তৎপরতা। বেকার সমস্যা দূর করার বদলে দেশের অর্থনীতি হয়ে উঠে 'ব্যক্তির' আশীর্বাদপুষ্ট গুটি কয়েক লোকের পাহাড় সমান সম্পদ ও অর্থ রোজগারের উপায়। সেই সম্পদ ও অর্থেরও বেশীর ভাগটা পাচার হয়ে যায় বাইরে।

যারা দেশের সম্পদ, জাতির সম্পদ–সেই ছাত্রদের মঙ্গলামঙ্গলের খোঁজ রাখে না কেউ। অথচ প্রয়োজনে তাদেরই ক্ষমতায় যাওয়ার খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতে। এই উপেক্ষিত ছাত্র সমাজের সমস্যা ও দুরবস্থার প্রতি আগামীর নির্বাচিত সরকার দৃষ্টি দেবেন, এই প্রত্যাশা জানিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চলমান প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাই।[২২২]

পরের সপ্তাহে ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম: 'চতুরঙ্গ' প্রকাশিত হয়। এই কলামে সতর্ক করা হয় যে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেলেও সব ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ স্বৈরশাসনের মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। সুযোগ পেলেই তা বিস্তার লাভ করতে পারে। 'সুহৃদ' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

এই বছরের বিজয় দিবসের উৎসব বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল ১৯৭১ সালের সেই বিজয় ও উৎসবের স্মৃতি। জনগণের কণ্ঠে ছিল তেমনি বাধা-বন্ধনহীন আনন্দ ও উল্লাসের ধ্বনি। এই দুই বিজয় উৎসবের মধ্যে প্রধান ঘটনার একটা মিলও আছে। ১৯৭১ সালে জনগণের সম্মিলিত সংগ্রামের কাছে পতন ঘটেছিল হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর। আর ১৯৯০ সালে জনগণের ক্ষমতার কাছে পতন হয়েছে স্বৈরশাসনের।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের দিনটি স্মৃতির মণিকোঠায় আজো জ্বলজ্বল করে। ৩রা ডিসেম্বর থেকেই পাকিস্তান বাহিনীর পতন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। ঐ রাতে ভারতীয় মিগ বিমানের আক্রমণে ঢাকায় মোতায়েন পাকিস্তানের দুই স্কোয়াড্রন স্যাবর জেট ঘণ্টা চারেকের আকাশ যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। রাত বারটার দিকে বিপদ ও ঝুঁকি উপেক্ষা করে বাড়ীর ছাদে উঠে আমরা অনেকে সেই যুদ্ধ দেখেছি।

৩রা ডিসেম্বরের পর থেকে আমরা ঢাকার অবরুদ্ধ নাগরিকেরা মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকিস্তানের নতি স্বীকারের দিন গুনছিলাম। ভারতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মানেকশ পাকিস্তান বাহিনীকে বার বার আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। পাকিস্তান তখন তার পশ্চিম ফ্রন্টেও ভারতীয় বাহিনীর হাতে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত। কিন্তু তারপরও মাতাল

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তান বাহিনীর বীরত্ব ও ইজ্জত নিয়ে সেকি আস্ফালন। যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, প্রচার মাধ্যমগুলিতে, ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলল 'অপরাজেয়' পাকিস্তান বাহিনীর মুখপাত্রদের তর্জন-গর্জন।

১৫ই ডিসেম্বর ঘটল আরেক ঘটনা। গোটা বাঙালী জাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বিজয়ের মুহূর্তটির জন্য, এ সময় পাকিস্তান বাহিনীর এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদরের লোকেরা ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় সকাল-বিকাল একনাগাড়ে মাইকযোগে প্রচার করতে থাকে যে, পাকিস্তানের বীর জনগণের জন্য একটা 'উমদা খোশ-খবরী' আছে, মার্কিন ৭ম নৌবহর দ্রুত এগিয়ে আসছে পাকিস্তানের সাহায্যার্থে, আর কোন ভয় নেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিলকুল সব ঠিক হয়ে যাবে। মাইকে রাজাকার-আলবদরদের এই প্রচার শুনে অনেকেরই একেবারে মুষড়ে পড়ার অবস্থা দাঁড়ায়। তার ওপর ১৪ই ডিসেম্বর থেকে ঢাকা মহানগরীর চারদিক ধরে ভারী কামানের শব্দ ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছিল। আমরা ধরে নিলাম বাঙালীর বিজয় আসবেই। তবে সেই বিজয় দেখতে আমরা কেউ বেঁচে থাকব না, শেষ যুদ্ধে আমরা সবাই মারা পড়ব। মৃত্যুচিন্তা তখন ৯ মাসের নিত্যসঙ্গী। মৃত্যু নিয়ে খুব যে আকুলিত হচ্ছিলাম তা নয়। বাঁচার সব পথ বন্ধ হয়ে গেলে মৃত্যুর জন্য মানুষের অপেক্ষা বোধহয় এরকমই নীরব ও অসহায় হয়। ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলল শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা। তারপর ১৬ই ডিসেম্বর বেলা এগারোটায় বেতারের শোনা গেল পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘোষণা।

সেই মুহূর্তটি ভোলা যায় না। কী যে এক বাধা-বন্ধহীন উল্লাস-ধ্বনি কণ্ঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল তা কোন ভাষা দিয়েই বর্ণনা করা যাবে না। বাসা থেকে বেরিয়ে ছুটলাম রাস্তায়। দেখি প্রতিবেশী জাহেদুর রহীম আমার বাসার দিকে ছুটে আসছেন। ইনি সেই প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী জাহেদুর রহীম, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে এবং সত্তরের নির্বাচনী দিনগুলিতে যিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শুধু 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিই গাইতেন। এই গানটি গাওয়ার জন্য সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছিল তাঁর বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। জাহেদুর রহীম এসে আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সেগুনবাগিচার ঝকঝকে নীল আকাশের নীচে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দে কাঁদতে থাকি।

১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের মুহূর্তটি বাঙালী জাতির ইতিহাসে সবচাইতে গর্বিত ও মূল্যবান অর্জন। এই মুহূর্তটি দেখার সুযোগ হয়েছে বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। গত ৫ই ডিসেম্বর আবার আমরা ইতিহাসের সেই মুখ অবলোকন করেছি। জনতার কণ্ঠে শুনেছি সেই একই উল্লাস-ধ্বনি। স্বৈরশাসনের দুর্গ ধসে পড়েছে শুনে ঢাকার মানুষ

রাতের বেলাই রাস্তায় নেমে এসেছিল। সারারাত ধরে ঢাকার মহানগরী ছিল জনতার পদচারণা ও শ্লোগান ধ্বনিতে মুখরিত। রাত কথা বলেছে উল্লাস ও শ্লোগানের ভাষায়। এমন মুহূর্ত যে কোন জাতির জীবনে কমই আসে।

এবারের গণ-অভ্যুত্থান স্বৈরশাসনের দুর্গ ধসিয়ে দিয়েছে। দেশে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা মূর্ত করে তুলেছে। ইতিমধ্যে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ২রা মার্চ নির্ধারিত হয়েছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যদি দেশে একটি সার্বভৌম পার্লামেন্ট এবং পার্লামেন্ট ও জনগণের কাছে কৈফিয়তদানকারী একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা শাব্দিক অর্থেই নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের জন্য একটি অনন্য গৌরবোজ্জ্বল বিজয় চিহ্নিত করবে। এতোদিন স্বৈরশাসকেরা যা কোনদিনই দিতে পারে নি, নব্বইয়ের গণআন্দোলন দেশকে সেই উপহারই দিতে চলেছে : গণতন্ত্র।

স্বাধীনতার পর উনিশটি বছর চলে গেছে। আশা করা গিয়েছিল, পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি অর্জনের পর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তির ওপর একটি সুখী, নিরাপদ ও সম্পন্ন বাংলাদেশ গড়ার কাজ সর্বতোভাবে সর্বপর্যায়ে শুরু হবে। দেশ গড়ার কাজ যে একেবারেই হয়নি তা নয়। তবে যতটুকু হয়েছে তা বিচ্ছিন্নভাবে। বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা না হওয়াটা সব অর্জনকে ম্লান করে দেয়। নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন জাতিকে আবার ধরিয়ে দিয়েছে সেই সূচনা, সেই প্রথম পদক্ষেপ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে যে উদ্দীপনামূলক ধ্বনি ও গান শোনা যেত, তার অনেকগুলির প্রচারই দুর্বোধ্য কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেন বন্ধ করা হয়েছিল তার ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ত কোনকালে দেওয়া হয়নি। আতরঘষা স্মৃতির মতো এই নিষিদ্ধ গানগুলি মাঝে-মধ্যে মনে পড়ত আর ভেসে উঠত মুক্তিযুদ্ধের সেইসব দিনের স্মৃতি। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে সেইসব ধ্বনি ও গান। ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগর সরকার গঠনের পর স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয় অংশুমান রায়ের গাওয়া সেই বিখ্যাত গানটি–'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।' গানটি ইংরেজী ভাষায়ও গাওয়া হয় এবং এই গানের ডিস্ক ইউরোপ-আমেরিকায় হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। 'শোন একটি মুজিবরের', 'একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি' 'পূর্ব গগনে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল', 'জয় বাংলা বাংলার জয়', 'মুজিব বাইয়া যাওরে' প্রভৃতি গান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার গণমনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত এই গানগুলি, এম,

আর আখতার মুকুলের কণ্ঠ ও ফিচার এবং সংবাদ বুলেটিন মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ বাঙালীকে যে নৈতিক সাহস যুগিয়েছে, যে কথা ভোলার নয়।

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান আবার সেইসব গান বাংলার মানুষকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এবারের বিজয় দিবসে নানা অনুষ্ঠানে শুনেছি সেইসব গান, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। ভোরবেলা রমনা পার্কে হাঁটার সময় প্রভাতী সংঘ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে 'পূর্ব গগনে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল, রক্ত লাল' গানটি শুনে ফিরে গিয়েছিলাম উনিশ বছর আগের বাঙালীর সেই মৃত্যু-পণ লড়াইয়ের দিনগুলিতে।

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনগণ শুধু নয়, বন্দী রেডিও ও টেলিভিশনকেও উদ্ধার করেছে। এই দুটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা একেবারেই হয়ে উঠেছিল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পত্তি। তাদের ছাড়া আর কারুর খবর সেখান থেকে প্রচারিত হত না। হতে পারত না। রেডিও টেলিভিশনে বিরোধীদলের খবর প্রচার কিংবা বিরোধী দলের নেত্রী ও নেতাদের নাম উচ্চারণ ছিল কার্যতঃ নিষিদ্ধ। ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর এই বাড়াবাড়ি কোন কোন ক্ষেত্রে সব সীমা অতিক্রম করেছে। বহু বছর পর নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের সুবাদে আমরা রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদ বুলেটিন আবার বঙ্গবন্ধুর নামের উচ্চারণ শুনলাম, বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার ছবি দেখলাম ও বক্তৃতা শুনলাম। রেডিও ও টেলিভিশনে এখন অহরহ শুনছি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সেইসব উদ্দীপনামূলক গান। বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে কথকের বর্ণনায় অন্যান্যবারের 'হানাদার বাহিনীর'র জায়গায় এইবার 'পাকিস্তান হানাদার বাহিনী' শোনা গেল। ইতিহাসকে কেউ কি 'এডিট' করতে পারে? বোধ হয় না। সে চেষ্টা ইতিহাসের নিজস্ব ও অন্তর্গত প্রতিরোধের ধাক্কায়ই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এইবার বহু ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে।

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান বহু বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। সাথে সাথে কোন ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়িয়ে না যাওয়ার কিংবা বাড়াবাড়ি না করার হুঁশিয়ারিও আছে। বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে কিংবা সীমা ছাড়াতে গিয়ে অতীতে বহু কাফ্‌ফারা দিতে হয়েছে জাতিকে। বাড়াবাড়ি করার ভুল যেন না হয়, সে ব্যাপারে রাজনৈতিক নেত্রী ও নেতা, সাংস্কৃতিক পর্যায়ের নেতা ও ব্যক্তিত্ব এবং সজাগ-সচেতন জনগণের সতর্ক থাকতে হবে। স্বৈরশাসনের অন্য নাম রক্তবীজ। এই রক্তবীজের ধ্বংস সাধন সহজে হতে চায় না। সচেতন ও সতর্ক না থাকলে বাহ্যতঃ নিশ্চিহ্ন হওয়া রক্তবীজ আবার অক্টোপাসের মতো শতবাহু বিস্তার করে ছোবল দিতে উদ্যত হয়। এই ব্যাপারে তাই সাবধান ও সতর্ক থাকাই এই মুহূর্তের কর্তব্য।[২২৩]

১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের সাপ্তাহিক নিয়মিত কলাম 'প্রিয় অপ্রিয়' প্রকাশিত হয়। এই কলামে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ের পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয় এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শহিদদের অবদান চিরস্মরণীয় করে রাখার আহ্বান জানানো হয়। কারণ তাদের প্রাণের বিনিময়েই স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। 'সত্যদর্শী' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

> আমাদের নতুন প্রজন্মের কিশোর-তরুণ যারা–ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কিংবা একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের বিজয় দেখেনি তারা এবার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করলো। আমরা যারা সেই দিনগুলো দেখেছিলাম তারাও আবার সেই আনন্দ ও গৌরবের মুখোমুখি হলাম। এ এক বিরল সৌভাগ্য। ডিসেম্বরের ৪ তারিখ রাতে রাজপথে মানুষ আর মানুষ। মানুষের এক অনিঃশেষ শোভাযাত্রা। মুহূর্তে রাজধানী হয়ে উঠলো মিছিলের নগরী। শহর, বন্দর, গ্রাম সর্বত্র মানুষ। এই দুর্বার জনস্রোতের সাথে কেবল উদ্দাম ঝর্ণারই বোধ হয় তুলনা করা চলে, যাকে কোনো বাধাই ঠেকাতে পারে না। বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো সেই বিপুল জনস্রোত তোপখানা-পল্টনের মোড়ে এসে রূপান্তরিত হলো বিশাল জনসমুদ্রে। ততোক্ষণে স্বৈরশাসনের পতন-ঘণ্টা বেজে উঠেছে। পৃথিবীর সব দেশে স্বৈরশাসকদের যে পরিণতি হয়, বাংলাদেশেও তা-ই ঘটলো। ক্ষমতার আসন থেকে বিদায় নিতে হলো জেনারেল এরশাদকে। অভূতপূর্ব জনজাগরণ ও গণ-আন্দোলনের মুখে এই ছিলো তার অনিবার্য পরিণতি। যারা জনগণের শক্তিকে উপেক্ষা করে নিপীড়ন আর নির্যাতনের পথে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায় তাদের শেষ পরিণতি এ-ই হয়। ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তের অভাব নেই। পৃথিবীতে কোনো স্বৈরশাসকই শেষ পর্যন্ত জনগণের রুদ্ররোষের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।
>
> এদেশের সব গণআন্দোলন সচেতন ছাত্র সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬৪ ও '৬৮-'৬৯র গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-র মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ছাত্র তরুণের বিপ্লবী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এবারের এই ঐতিহাসিক গণআন্দোলনেও ছাত্র ঐক্যের বিশাল অবদান এদেশের আপোষহীন সংগ্রামী তারুণ্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। পুঞ্জীভূত হতাশা ও অন্ধকারের মধ্যেও বারে বারে তারাই আমাদের মধ্যে আশার আলো জ্বেলে দিয়েছে। নিঃশেষে জীবন দিয়ে তারা জয় করেছে মৃত্যুকে। এদেশের ছাত্র, জনতা, সংগ্রামী মানুষ সৃষ্টি করেছে এই অনন্য ইতিহাস। সব দেশের স্বৈরশাসকদের মতো স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারও জনগণের এই গৌরবগাথা আড়াল করে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের কোনো ছল-চাতুরী আর ষড়যন্ত্রই এবার জনতার বিজয়কে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি। আন্দোলন তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে। জরুরী অবস্থা,

কারফিউ এসব কোনো কিছুই জনগণের বিপ্লবী অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে পারেনি। জেনারেল এরশাদ দেখেছেন তার পায়ের তলায় আর কোনো মাটি নেই। তখন নিরুপায় জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। যে আসন পাকাপোক্ত করতে তাকে একের পর এক ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে অবশেষে তার সেই ক্ষমতার দুর্গই বালির বাঁধের মতো মুহূর্তে ধসে গেছে। ২৭ নভেম্বর কারফিউ ও জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর পরিস্থিতি আরো দ্রুত মোড় নিতে থাকে। কারফিউ ও জরুরী আইন অগ্রাহ্য করে মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। জনগণের সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম স্বৈরশাসকদের পতন ত্বরান্বিত করে তোলে। ২৭ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর ৪ তারিখের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র কয়টি দিনের। কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই বাংলাদেশে স্বৈরশাসনের চূড়ান্ত পতন সাধিত হয়। বুকের রক্ত ঢেলে বাংলাদেশের বীর ছাত্র জনতা চুরাশি থেকে ধাপে ধাপে যে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে এই সময়ের মধ্যে তা উপনীত হয় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। স্বৈরাচারের পতনের মধ্য দিয়ে তার বিজয় সূচিত হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক বিজয় সুনিশ্চিত হবে দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠা হওয়ার মধ্য দিয়ে। সে জন্যেও আমাদের সকলের সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন। বাংলাদেশে স্বৈরশাসনের এই পতনকে অনেকাংশে ফিলিপাইনে মার্কোসের পতনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এক সপ্তাহের মধ্যে একটি দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার দুর্গ যেভাবে ভেঙ্গে পড়ে তা দেখে নেপালে রাজতন্ত্রের পতনের কথাও হয়তো অনেকের মনে হবে। আর ক্ষমতার দুর্গ যখন ভেঙ্গে পড়ে, তখন বোধহয় এভাবেই তা নিমিষে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু জনবিচ্ছিন্ন স্বৈরাচারী শাসকেরা তা সহজে স্বীকার করতে চায় না। জনগণের শক্তি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই বলেই বাহুবলকেই তারা সর্বস্ব ভাবে। কিন্তু জনগণের কাছে সব শক্তিধর স্বৈরশাসককেই শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শামসুজ্জোহা। ডঃ জোহা প্রাণ দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন প্রাণের আগুন। এবার ১৯৯০-এর এই গণআন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে শহীদ হয়েছেন ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন। আলো দিয়ে আলো জ্বালার কথা আমরা জানি। কিন্তু নিজের প্রাণের বিনিময়েও যে প্রাণের আগুন জ্বালাতে হয় তা আমাদের ডাঃ মিলন আরেকবার দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জ্বলে উঠলো হাজার হাজার প্রাণ প্রদীপ। ছাত্রঐক্যের বিজয় উৎসব মঞ্চে মিলনের শিশু কন্যাটিকে কোলে নিয়ে তাঁর স্ত্রী যখন সেই উৎসবের উদ্বোধন করলেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি এস সি চত্বরকে কোন এক অনিঃশেষ জনসমুদ্রের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। মিলন মানুষের এই মহামিলন উৎসব দেখে যেতে পারেননি সত্য;

কিন্তু কোনো কোনো মানুষ আছেন–যাঁরা নিজেদেরকে বর্তমান মানুষের ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করেন, মিলন তাঁদেরই একজন। তাই এই মিলন উৎসবে মিলন না থেকেও সব চেয়ে বেশী উপস্থিত ছিলেন। গণতান্ত্রিক বিজয়ের এই লগ্নে বাংলাদেশ শ্রদ্ধাভরে তার এই বীর শহীদদের স্মরণ করে। ডিসেম্বর মাস আসলে আমাদের আনন্দ-বেদনার মিশ্র অনুভূতি রঞ্জিত। এই ডিসেম্বর মাসেই আমাদের মহান বিজয় দিবস। কিন্তু এই বিজয় দিবসের মাত্র দুদিন আগেই ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। এই মাসে আমরা আমাদের অসংখ্য গুণীজন হারিয়েছি। এবার গণতন্ত্রের এই বিজয় উৎসব এসে ১৬ ডিসেম্বরের মহান বিজয় দিবসের বিজয়ের আনন্দকে আরো উজ্জ্বল করে তুলবে। ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিজয় উৎসব, বিজয় মেলা। স্বৈরশাসন মুক্ত বাংলাদেশে এবার আমরা ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় উৎসব পালন করছি। এই উৎসব, এই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে, সব প্রাণে।[২২৪]

পরের সপ্তাহে ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের নিয়মিত কলাম: 'প্রিয় অপ্রিয়' প্রকাশিত হয়। এই কলামে মন্তব্য করা হয় যে, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের দুঃশাসন রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে তুলেছিলো। স্বৈরশাসনের নিষ্পেষণে প্রান্তিক মানুষেরা ক্রমাগত নিঃস্ব থেকে নিঃস্ব হয়েছে। তাই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় কলামটিতে। 'সত্যদর্শী' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

নেত্রকোনা জেলার ২৭ হাজার কৃষকের মাথার ওপর ঝুলছে সার্টিফিকেট মামলা। একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এই সংবাদ। জানা গেছে, কৃষি ব্যাংকসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনাদায়ী অর্থের জন্য এ পর্যন্ত ২৬ হাজার ৮শো ১৪টি সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে কৃষকেরা ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় চলতি আর্থিক বছরে বরাদ্দকৃত কৃষিঋণের সামান্য অংশও বিতরণ করা হয়নি। একদিকে কৃষিঋণ আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে কৃষিঋণ বিতরণের হার আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি কৃষিক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে কিনা সে সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন হওয়া আবশ্যক। বলাবাহুল্য, কৃষিঋণ ও সার্টিফিকেট মামলার এই বোঝা যে কেবল নেত্রকোনা জেলার কৃষকদের জীবনে দুর্ভোগ ডেকে আনছে তা-ই নয়, দেশের অন্যান্য স্থানেও দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত কৃষকদের এই একই পরিস্থিতির অসহায় শিকার হতে হচ্ছে। কৃষক ও কৃষির উন্নতির জন্যই এই কৃষিঋণের জটিলতা ও সার্টিফিকেট মামলার এই বিড়ম্বনা থেকে বিত্তহীন দুস্থ কৃষকদের মুক্তি দিতে হবে।

দেশে স্বৈরশাসনের পতনের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। কেবল স্বাধীন গণতান্ত্রিক পরিবেশেই মানুষ তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার জনজীবনের স্বাভাবিক বিকাশকেই স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। আর স্বৈরাচারী দুঃশাসনের মধ্য দিয়ে যা হয় অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই তারা বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে তুলেছিলো। দুর্নীতি, অসততা, মিথ্যাচার ও স্খলনই যেন হয়ে উঠেছিলো সে সময়ের চারিত্র্যলক্ষণ। অসত্য ও মিথ্যা প্রচার হয়ে উঠেছিলো সার্বক্ষণিক ব্যাপার। হিটলার ও গয়েবলীয় মিথ্যা প্রচারের পরিণতি দেখেও দেশে স্বৈরশাসকদের চৈতন্যোদয় হয় না। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারও সেই নীতিই অনুসরণ করে চলেছিলো। গ্রাম ও কৃষি সম্পর্কে তাদের আকর্ষণীয় শ্লোগান ও প্রচারণা সত্ত্বেও তাদের শাসনামলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি, কৃষক ও গ্রামজীবন। এক কথায় গ্রামজীবনকে করা হয়েছে লণ্ডভণ্ড। তাদের তথাকথিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর নামে বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল গ্রামকে রূপান্তরিত করা হয়েছে নিঃস্ব বস্তিতে–যেখানে শহরের বস্তিরই সম্প্রসারণ করা হয়েছে মাত্র। বিজলি বাতির নামে বিজ্ঞানের ছেঁড়া তার গ্রাম জীবনকে কিভাবে দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে এবং সুস্থ লোক-সংস্কৃতির প্রায় উচ্ছেদ সাধন করে কিভাবে সেখানে ভিডিও কালচারের বিস্তার ঘটানো হয়েছে তা দুচার কথায় লিখে শেষ করা যাবে না। ভিন্ন প্রসঙ্গে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। স্বৈরশাসন দেশের কৃষি ও কৃষকের জীবনকে কতোটা দুর্বিষহ করে তুলেছে গ্রামীণ দারিদ্র্য ও দুর্দশার দিকে তাকালেই তা উপলব্ধি করা যায়। গ্রাম জীবন প্রকৃত অর্থেই নিঃস্ব ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অথচ কৃষি উন্নয়ন নিয়ে বাগাড়ম্বরের কোনো শেষ ছিলো না। কৃষকের দুঃখে মায়া-কান্না ও কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণেরও কোনো অন্ত ছিলো না। মুখে কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কথা বলে একের পর এক বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ-সরঞ্জাম ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করে কৃষি উন্নয়নের পথকেই যে ক্রমাগত রুদ্ধ করা হচ্ছিলো তা বোধ করি না বললেও চলে। তার ওপর ছিলো কৃষিঋণের জটিলতা, সার্টিফিকেট মামলার বোঝা ইত্যাদি। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাধারণ দরিদ্র কৃষকেরা পরিণত হচ্ছিলো ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীতে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্রমাগত ব্যয়বহুল করে তুলে সাধারণ দরিদ্র কৃষকদের সুকৌশলে করা হচ্ছিলো হাল-লাঙ্গল হারানো ছিন্নমূল মানুষ। সেচ, সার, কীটনাশকের উচ্চমূল্য ছিলো তাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। অথচ তথাকথিত কৃষি উন্নয়নের প্রবক্তারা সে কথাটি একবারো ভেবে দেখার গরজ বোধ করেনি। তাদের লক্ষ্য ছিলো খামার রাজত্ব গড়ে তোলা যেখানে দু'চারজন বিত্তশালী খামারপতি রাজত্ব করবে।

এই অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশের কৃষি ও কৃষক সমাজকে দীর্ঘ নয় বছর অতিক্রম করতে হয়েছে। আজ স্বৈরাচারমুক্ত এই নতুন পরিবেশে আমাদের এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রের মতো সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে নিগৃহীত হয়েছে। সেইসব ক্ষত আমাদের সযত্ন পরিচর্যায় নিরাময় করে তুলতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রের সমস্যা এবং কৃষকদের জীবনে নেমে আসা দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দশা বিষয়ে দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক কৃষি ও কৃষক সংগঠনগুলো এর বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরবেন এবং সমাধানের দিকনির্দেশ করবেন। এই কলামে আমি তার সামান্য কিছু অংশ উল্লেখ করলাম মাত্র। স্বৈরাচারী শাসকেরা কৃষকদের প্রতি যে শঠতা প্রদর্শন করেছে এবং কৃষিঋণ প্রদান, কৃষিঋণের মামলা দায়ের এবং কখনো কখনো চমক সৃষ্টির জন্য লোক দেখানো ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রতারণার যে আশ্রয় নিয়েছে তার কোনো তুলনা হয় না। এই শঠতা, প্রতারণা ও দুঃশাসনে কৃষি ক্ষেত্রটি হয়ে পড়েছে দুঃস্থ ও বিপন্ন। বছরের পর বছর পাটের মন্দাবাজার কৃষি অর্থনীতিকে কতোটা নির্জীব করে তুলেছে তাও আজ আর কোনো অজানা বিষয় নয়। সব মিলে এই হচ্ছে কৃষির অবস্থা। বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টিসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো তার ওপর দিয়ে যাচ্ছেই। তদুপরি আছে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় সৃষ্ট এই বিপর্যয়। কৃষি উন্নয়নের নামে কৃষিই হয়েছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এদেশে কৃষির গুরুত্ব ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। সকলেই জানেন কৃষিই এদেশের প্রাণ। কৃষি ও কৃষকদের উপেক্ষা করে কোনো উন্নতি বা অগ্রগতিই সম্ভব নয়। সেজন্যে কৃষির উন্নতি ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা বিশেষভাবে জরুরী। মনে রাখতে হবে হাল-লাঙ্গল হাতে কৃষির সঙ্গে জড়িত যাদের জীবন এই স্বৈরশাসন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অভাব-অনটন ও অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত তারাই কিন্তু আরো নিঃস্ব থেকে নিঃস্ব হয়েছে। তাদেরই ক্ষুধায় অন্ন জোটে না, শীতে বস্ত্র মেলে না। আমাদের চিন্তা, বোধ, সংবেদনশীলতা ও অনুভূতি যেন তাদের ঘিরেই আবর্তিত হয়। তাদের মুখে এখনো ভাষা নেই, তারা তাদের কথা ঠিকমতো বলতেও পারে না। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে তাদের দাবি ও আবেদন সবসময় এসে পৌছায়ও না এতো দূরে। সেই অসহায় বিপন্ন মুখগুলো যেন আজ আমাদের চোখে ভাসে। সেই বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত মানুষেরা যেন সর্বাধিক গুরুত্ব পায়, ভালোবাসা পায়। তাদের সকলের দুঃখ দূর করেই তো কেবল আমরা সবাই মিলে গাইতে পারবো– ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এ বসুন্ধরা।[২২৫]

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক নিয়মিত এই কলামগুলোতে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। ১৯৯০

সালের ৭ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় সাপ্তাহিক নিয়মিত কলাম 'নগর দর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই কলামে মন্তব্য করা হয় যে, স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য ও নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে সাধারণ মানুষ কি অমিত শক্তি ধারণ করে। একই সঙ্গে কলামটিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীনদের সতর্ক করা হয় তারা যেন কখনো সাধারণ মানুষকে হিসাবের বাইরে রাখার চিন্তা না করেন। তাতে বিপর্যয় ঘটা অস্বাভাবিক না। 'সুপান্থ' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

ঢাকা উৎসবের নগরী। মিছিলের নগরী। সভার নগরী। আনন্দের নগরী। মনে পড়ে না বিগত দিনগুলিতে আর কখনও এমন ছবি দেখেছি কি না। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে দলে দলে মানুষ। মিছিলে মিছিলে মানুষ। কেউ সভা করছে। কেউ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিনভর কেবল মানুষ। কেবল ভিড়। কেবল জটলা।

মানুষের বিজয় হয়েছে। বাংলাদেশে অবাধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। জরুরী অবস্থা, কারফিউ, প্রতিবাদ, লাঠি, গুলি ও টিয়ার গ্যাসের একটি অধ্যায়ের পর জয়লাভ করেছে. সাধারণ মানুষের সংকল্প। মানুষের প্রতিরোধের মুখে সব বাধা বিপত্তি ভেঙে পড়েছে। মানুষ জয়ী হয়েছে।

অবরুদ্ধ প্রাণশক্তির এই উৎসারণ দেখার মত, শেখার মত, মনে রাখার মত। সমস্ত পৃথিবীতে এখন গণতন্ত্রের জয় জয়কার। গোটা পৃথিবীর মানুষ সব দেয়াল ভেঙে ফেলছে। গণতন্ত্রের জয়স্তম্ভ তুলছে। কি রাষ্ট্র পরিচালনা, কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কি উন্নয়ন-মানব ইতিহাসে আজ পর্যন্ত মেজরিটি রুলস বা মেজরিটি ভোটের বাইরে আর কোন ফর্মুলা উদ্ভাবিত হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই সরকার নির্বাচিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর বাইরে আর কোন কল্যাণকর পদ্ধতি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। গণতান্ত্রিক সমাজে সংখ্যালঘিষ্ঠেরও ভূমিকা স্বীকৃত। সংখ্যালঘিষ্ঠের অস্তিত্ব স্বীকৃত। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত সরকারই দেশ শাসন করে তবুও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত সেখানে উপেক্ষিত হয় না। মেজরিটি শাসনই গণতান্ত্রিক পন্থা। কিন্তু ব্রুট মেজরিটির জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠস্বর দমিয়ে দেয়া হলে সমাজে আবার সংকট দেখা দেয়। গণতন্ত্রে সকল মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার পর থেকেই তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছে। অবাধে ভোট দেবার অধিকার, নিজের বিশ্বাস মত ভোট দেবার অধিকার, প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার সেই অধিকার অর্জনের জন্যেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এত মানুষ প্রাণ দিয়েছে। এত মানুষ ত্যাগ স্বীকার করেছে। লক্ষ্য একটাই-অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন, সকল মত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশে এত দিন মানুষের সেই কথা বলার অধিকার সংকুচিত ছিল বলে রাজপথে বিক্ষোভ এমনভাবে ফেটে পড়েছে। মানুষ ভোট দিয়ে নিজের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারেনি বলে এমন সুকঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা অগণতান্ত্রিকতার সকল দুর্গ ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। গণতন্ত্রের স্বাদ মানুষকে কিভাবে উদ্দীপ্ত, উচ্ছল করে তুলতে পারে গত কয়েক দিনের ঢাকা নগরীতে তার প্রমাণ মিলেছে। এরশাদ সরকারের পতন মানুষের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। আন্দোলনে জয়ী হয়ে মানুষ সবগুলি রাস্তায় নেচেছে। উল্লাসে রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করেছে। সাংস্কৃতিক দল প্রাণ খুলে গান গেয়েছে। মনের কথা খুলে বলেছে। হৃদয়ের উল্লাস প্রকাশ করেছে।

সাধারণ মানুষ যে কি অমিত শক্তি ধারণ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য সে কথা আবারও প্রমাণ করেছে। যাদের মনে হয় নিতান্ত তুচ্ছ, হিসাবের বাইরে, শাসকরা যাদের জনসভায় ভিড় বাড়ানোর উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন, যাদের মনে করা হয় করতালি দেবার যন্ত্র, তারা প্রমাণ করলো সাধারণ মানুষ শুধু করতালি বাজায় না, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে কর ব্যবহার করতে জানে। সাধারণ মানুষকে হিসাবের বাইরে রেখে দিলে একদিন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়। ঢাকা নগরীতে এখন গণতন্ত্রের সঙ্গীত ধ্বনিত। ঢাকা নগরীতে এখন প্রাণের উচ্ছ্বাস। মানুষের এই উচ্ছ্বাসকে, এই ইচ্ছাকে গণতন্ত্রে রূপায়িত করতে হবে।

আমাদের সমাজের মধ্যে নানা বন্ধন, নানা বিধি নিষেধ, নানা গ্রন্থি। পরমত সহিষ্ণুতার বড় অভাব। এর ফলে সমাজের মধ্যে অনেক কিছু জট পাকিয়ে আছে। সকল মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে আরাধ্য গণতন্ত্রকে আমাদের বিকশিত করে তুলতে হবে।

রিক্সায় ভরসা

গত কয়েকদিন ঢাকা নগরীতে রিকশাই ছিল একমাত্র যান ও বাহন। পায়ে হেঁটে পথ চলেছে অগণিত মানুষ দূর দূরান্ত থেকে মানুষ শহরের কেন্দ্রস্থলে এসেছে রিকশা চড়ে। রিকশা এক আশ্চর্য যান। তীর ফেলার জায়গা নেই। কিন্তু কোন ফাঁক দিয়ে রিকশা দিব্যি গলে গিয়ে চলাফেরা করে। রিকশা গলি ঘুচির ভিতর দিয়ে চলে যায়। ভাঙা রাস্তা পরোয়া করে না। বৃষ্টি-বাদল-রৌদ্র মানে না। কি দুপুর, কি রাত। চেষ্টা করলে রিকশা মিলেই যায়। গত কয়েক দিনে একথা প্রমাণিত হয়েছে রিকশাই সাধারণ মানুষের নির্ভরযোগ্য যানবাহন। আটাশি সালের ভয়াবহ বন্যার সময়ও মানুষ রিকশার ওপর নির্ভর করেছে। ভাঙা রাস্তা, নালা খন্দক ওয়ালা রাস্তা, অন্ধকার রাস্তা, আলোকময় রাস্তা-সব জায়গায় রিকশার অবাধ চলাচল। যারা মোটর গাড়ীর অধিকারী তারাও বোধ হয় এবার রিকশার কদর বুঝেছেন।

ঢাকা নগরীতে কত রিকশা আছে কেউ বলতে পারেন না। রেজিষ্ট্রার্ড রিকশার সংখ্যা প্রায় এক লাখ। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন হিসাবের বাইরেও বহু রিকশা ঢাকায় চলে। বিমুখ গ্রাম থেকে উঠে আসা বহু মানুষের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন রিকশা। ছিন্নমূল মানুষ রিকশা অবলম্বন করেই এ নগরীতে বেঁচে আছে। বাস-মিনিবাস এ নগরীর জনগণের চলাচলের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। রিকশা আছে বলেই সাধারণ মানুষের বাঁচোয়া।

কেউ কেউ মাঝে মাঝে রিকশা তুলে দেয়ার কথা বলেন। রিকশা তুলে দিলে এ নগরীর নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্ত মানুষের চলাচলের সুযোগই বন্ধ হয়ে যাবে। রুদ্ধ হবে বহু মানুষের জীবিকার পথ। এ কথা ঠিক যে রিকশার ফলে বহু পথে যানজট সৃষ্টি হয়। কিন্তু রিকশার বিকল্প কোথায়?

অতিথি পাখি

এ নগরীতে অতিথি পাখিদের বড় লাঞ্ছনা। পাখিরা অবশ্য এ নগরীতে আসে না। তারা দূর দূর জলাশয়ে এসে আশ্রয় নেয়। বরফের দেশের শীতল আবহাওয়ার কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দলে দলে তারা এ নাতিশীতোষ্ণ দেশে চলে আসে। পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অন্ধকার আকাশে ডানা মেলে দিয়ে, নক্ষত্রের আলোয় পথ চিনে পাখিরা এ সময় দলে দলে বাংলাদেশে আসে।

পৃথিবীতে পাখি যেমন আছে তেমনি শিকারীও আছে। ভাল মানুষ যেমন আছে তেমনি শয়তানও আছে। সুযোগ সন্ধানী মানুষের অভাব নেই। হাজার হাজার অতিথি পাখির ভিড় দেখে শিকারীরা বন্দুকের নল তাক করে, জাল পাতে। সামান্য পয়সার লোভে পাখি ধরে আনে। তারপর পাখিরা এই পাথুরে নগরীতে চালান হয়। রাজপথের মোড়ে মোড়ে ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে পাখি ব্যবসায়ীরা চিৎকার করে-শিকার শিকার।

শিকারী বটে, ফাঁদ পেতে পাখিদের ধরে নিয়ে এসে নগরীর রাজপথে বিক্রি করার। এর নাম শিকার। শিকারের মধ্যেও এক উল্লাস আছে, আনন্দ আছে, সাহসিকতা আছে। বাঘ সিংহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেউ বন্দুকের নল থেকে গুলি উদ্‌গীরণ করলে সে কথা বুঝতে পারি। কিন্তু নগরীর খাবারের টেবিলে বুনো পাখি এ রকম সৎকার কি ধরনের শিকার।

মানুষ কখনও কখনও আরণ্য সভ্যতার স্বাদ চায়। মানুষ অপরিচিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে চায়। মানুষের লক্ষ্যের ভেতর এক আদিমতা আছে। কিন্তু তা কি এই নিরীহ পাখি ধরে ও রন্ধন করে মেটাতে হবে ?

কণা মাত্র মমতা নাই। সামান্যতম বিবেচনা নাই। নিরীহ পাখিদের ধরে এ কী ধরনের রসনা তৃপ্তির আয়োজন?

পাদটীকা

জাপানে বিয়ের খরচে পুরো এক বছরের বেতন খরচ হয়ে যায় শুনে মন্তব্য করলেন জনৈক নাগরিক, মাত্র এক বছরের বেতন। আমরা তো জানি বিয়ে করলে সারা জীবনের বেতনই খরচ হয়ে যায়।[২২৬]

পরের সপ্তাহে ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলার নিয়মিত কলাম: 'নগর দর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই কলামে মন্তব্য করা হয় যে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্রের অবিস্মরণীয় বিপ্লবের সূচনা ঘটেছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঘটে গেছে বিপ্লব। কলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করার আহ্বান জানানো হয়। 'সুপাহু' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

খ্যাতিমান কি অখ্যাত, সফল কি ব্যর্থ, উজ্জ্বল কি অনুজ্জ্বল, এই জগৎ-সংসারে প্রতিদিন বহু লোক মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে। জন্ম যেমন স্বাভাবিক-মৃত্যুও তেমনি প্রত্যাশিত ঘটনা। জীবন, যাপনের ব্যাপারটা অবশ্য জটিল। কাহারও জন্য সুখকর। কাহারও জন্য বেদনাদায়ক। অবিমিশ্র সুখ অথবা অবিমিশ্র বেদনা বোধহয় কাহারও জীবনে নাই। মানুষকে যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হয়– কারণে অকারণে।

সমাজ-সংসারে মৃত্যুর ভিড়ে কখনও কখনও কিছু মৃত্যু সকল ভাবনা তোলপাড় করিয়া দেয়। ম্যাক্সিম গোর্কির লোয়ার ডেথস্ নাটকের শেষ দৃশ্যের মানুষের মত চীৎকার করিয়া বলিতে হয়, মানুষ মারা গেল, মানুষ।

আজ ১৪ই ডিসেম্বর। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে উনিশ বৎসর পূর্বে এই ডিসেম্বর মাসে ঘাতকের হাতে মানুষ খুন হইয়াছিল, মানুষ। দখলদার পাক বাহিনীর সহযোগীরা ডিসেম্বর মাসের এই সপ্তাহে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের বাছিয়া বাছিয়া নৃশংসভাবে খুন করিয়াছিল। তাহারা জীবন্ত মানুষদের খুন করিয়াছিল। শহীদুল্লাহ কায়সার, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন, ডাঃ ফজলে রাব্বী, ডাঃ আলিম চৌধুরী প্রমুখকে বধ্যভূমিতে নিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করে।

আমরা বেদনার্ত এই কারণে যে আমাদের প্রিয়জনকে খুন করা হইয়াছে। বাংলাদেশ তাহার উজ্জ্বল সন্তানদের হারাইয়াছে। কিন্তু ঘাতকদের এ অমোঘ সত্য উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে মানুষ খুন করিয়া আদর্শকে খুন করা যায় না। কোন কোন মৃত্যু পর্বতের তুলনায় ভারী, কোন কোন মৃত্যু পাখীর পালকের তুলনায় হালকা। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের শাহাদাৎ পর্বতের অধিক ভারী হইয়া ঘাতকদের ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নাম, কর্ম ও স্মৃতি আমাদের মনের

মধ্যে এখনও উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল। এই বাংলাদেশে তাহারা চিরকাল ধ্রুবতারার মত পথের দিশারী হইয়া থাকিবেন। জাতি তাহাদের জীবন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

মৃত্যু মানুষের নশ্বর অস্তিত্বকে বিনাশ করে। কিন্তু মৃত্যু মানুষের জীবনের প্রদীপ্ত শিখাকে নির্বাপিত করিতে পারে না। জনমানুষের জন্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত যুগ যুগ ধরিয়া গণমানুষকে উদ্দীপ্ত করিতে থাকে, পথ নির্দেশ করিতে থাকে। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের মাধ্যমে এ অমোঘ শক্তি আমরা জীবনের মাঝখানে ধরিয়া রাখিতেছি। মৃত্যুতে জীবনের বিনাশ নাই। কোন কোন মৃত্যু জীবন, ইতিহাস ও বেদনাকে অতিক্রম করিয়া শাশ্বত স্থান লাভ করে। মৃত্যু জীবনের অধিক হইয়া দাঁড়ায়।

আজ ১৪ই ডিসেম্বর। এই নগরীতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা আমরা স্মরণ করিতেছি। আমাদের হৃদয়ের ভিতর অপরিমিত বেদনা। আমাদের হৃদয়ের ভিতর অপরিমিত গৌরব। ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে বিসর্জন দিবার জন্য এই সমাজে কিছু সাহসী মানুষ ছিলেন। জীবনের খুচরা হিসাবের কাউন্টারে তাহারা লেন-দেন চুকাইয়া দেন নাই। তাহারা মানুষ ছিলেন। আমরা চীৎকার করিয়া বলিতে চাই, ঘাতকদের হাতে কিছু মানুষ নিহত হইয়াছিল। মানুষের মৃত্যু হইয়াছিল। বিপ্লবী চে গুয়েভারা যখন ঘাতকদের হাতে আটক হইয়াছিলেন তখন তিনি তাহাদের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন, Shoot, shoot, you will see how a man dies. ঘাতকদের হাতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মৃত্যু ঘটিয়াছে এই কারণে আমরা বেদনার্ত। কিন্তু আমরা ইহাও দেখিয়াছি মানুষ কিরূপে সগৌরবে মৃত্যুবরণ করিতে পারে। শহীদ বুদ্ধিজীবীরা আমাদের মানুষ পরিচয়ে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন।

জীবন প্রবাহ

ঢাকা নগরীর জীবন প্রবাহ আবার স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছে। কারফিউ নাই, গুলি নাই, টিয়ার গ্যাস নাই। মানুষ আপন নিয়মে জীবন যাপন করিতেছে। রাস্তায় রাস্তায় যানজট জমিতেছে। অফিসপাড়ায় নিরুদ্বিগ্নে গাড়ী পার্ক করা যাইতেছে। মানুষ সুখী হাট-বাজার করিতেছে। দম্পতি রিকশায় বাহির হইতেছে।

মানুষ এইরূপ জীবনের জন্য লড়াই করিতেছে। এইরূপে জীবনের অর্থ হইতেছে নিঃসংকোচ জীবনযাপন।

পৃথিবীতে আসিয়া অন্যকে ট্যাক্স দিয়া চলিতে হইবে কেন? যাহা ভাবিব তাহা বলিব। যাহা বলিব তাহা করিব। ইচ্ছা হইলে হাসিব। কারণ ঘটিলে ক্রন্দন করিব। আমার হাসি-কান্নার উপর অন্য লোক কেন

বিধি-নিষেধ আরোপ করিবে? আল্লাহ তো এই দুনিয়া কয়েকজন লোকের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। সেইরূপ ইচ্ছা থাকিলে তিনি পৃথিবীতে কয়েকজন লোক সৃষ্টি করিতে পারিতেন। এই পৃথিবীতে যেহেতু বিপুল জনতা চলে সেহেতু বিপুল জনতার নিয়মে পৃথিবীকে চলিতে হইবে।

নগর জীবনে কর্মের স্পন্দন ফিরিয়া আসিতেছে। হাটে-বাজারে লোক যাইতে পারিতেছে। জিনিসপত্র কিনিতে পারিতেছে কিনা সে কথা হলফ করিয়া বলিতে পারি না। লোকে কথা বলিতে পারিতেছে। সব কথা বলিতে পারিতেছে কিনা তাহাও বলিতে পারি না। তবে মানুষকে সব বলিতে দিতে হইবে। গোস্বা হইলে চলিবে না। বাধা দিলে চলিবে না। বাংলাদেশে অবিস্মরণীয় গণতন্ত্রের বিপ্লবের সূচনা ঘটিয়াছে- সকল মত প্রকাশের স্বাধীনতা এই বিপ্লবের মূলমন্ত্র। চক্ষু রঙ্গিন করিয়া, কণ্ঠস্বর ভারী করিয়া ধমক দিলে চলিবে না। যাহাকে তাহাকে ইচ্ছামত লেবেল লাগাইয়া অপমানিত করা চলিবে না। সব কিছু আইনানুগ চলিতে হইবে। আইন অন্ধ হইলে বিচার সার্থক হইবে ।

ভারী কথা বলিয়া ফেলিলাম। আসল কথা হইতেছে জীবনের স্রোত বহিতেই থাকিবে। যুদ্ধ আসিবে, রাষ্ট্র- বিপ্লব ঘটিবে, কখনও যতি চিহ্ন পড়িবে। কিন্তু জীবনের স্রোত স্তব্ধ হইবার নয়।

শীতের পিঠাপুলি

নানা গোলমালের মধ্যে শীত আসিয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি কারফিউর তোয়াক্কা করে না। গোলমালেরও না। সূর্যের দক্ষিণায়ন যেন ঘটিয়াছে, রৌদ্রকণার তেজ কমিয়া গিয়াছে, উত্তর গোলার্ধে তাপের অভাব ঘটিয়াছে, সুতরাং শীতের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নানা গোলমালের মধ্যেও লেপ-কম্বল, কাঁথা, পুরাতন বস্ত্র বাজারের রকমারি সামগ্রী ইত্যাদির কথা মনে পড়িতেছে।

শীত আসিয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি ঠাণ্ডা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে খর্জুর বৃক্ষে রসের সঞ্চার হইয়াছে, কলসীতে কানায় কানায় রস সঞ্চিত হইতেছে। খর্জুর রসের গুড় ইতিমধ্যেই নগরীর বাজারে পাওয়া যাইতেছে। পথিপার্শ্বে পিঠার দোকান ইতিমধ্যেই বসিয়া গিয়াছে। ভাপা পিঠা, খোলা পিঠা- কুপির কম্পমান আলোকের নীল ফেরিওয়ালারা বসিয়া এইসব পিঠা বিক্রি করিতেছে।

একটা সময় ছিল বটে যখন রন্ধন- গৃহে মাটির চুলার পাশে বসিয়া মাতার হস্তে তৈরী এইসব পিঠা খাওয়া হইত। সময় বদলাইয়া গিয়াছে। ঘর এখন বাহির হইয়াছে। ব্যবসায় এখন অন্তঃপুরের নিভৃতিকে গ্রাস করিয়াছে। ঘরের পিঠা-পুলি নগরীর ফুটপাতে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু তাহাতে পিঠার স্বাদ কমিয়াছে এমন বলিতে পারি না। তবে পরিবেশ নষ্ট হইয়াছে।

পাদটীকা

একটি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতকারী কোম্পানী তাহাদের 'পাম অয়েল' বাজারজাত করিবার জন্য বিজ্ঞাপন মারফত নাম আহবান করিয়াছেন শুনিয়া মন্তব্য করিলেন জনৈক নাগরিক, 'সর্বশ্রেষ্ঠ নাম হইবে ভেজাল'।[২২৭]

সংবাদে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নিয়মিত এই কলামগুলোতে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। ১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর সংবাদে সাপ্তাহিক নিয়মিত কলাম 'সময় বহিয়া যায়' প্রকাশিত হয়। এই কলামে মন্তব্য করা হয় যে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আবার প্রমাণিত হলো, জনগণের ভাগ্য নিহিত আছে জনগণের হাতেই। ভবিষ্যতে শুধু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই না, এমন ব্যবস্থা করার জন্য উপসম্পাদকীয়তে আহ্বান জানানো হয় যেন জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক হয়। 'গাছ পাথর' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয় :

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান যাঁদের স্মরণে আছে তাঁদের পক্ষে নব্বইয়ের অভ্যুত্থানকে বোঝা কঠিন নয়। সেই একই স্বতঃস্ফূর্ততা, ঐক্য এবং নিপীড়নকারীদের প্রতি ঘৃণা এবারও আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করল। কি ইতিহাসের তো পুনরাবৃত্তি নেই, সে জন্য যতই এক রকমের হোক উনসত্তর ও নব্বই এক নয়, অভিন্ন নয়। উনসত্তরে লড়াই ছিল পাঞ্জাবীর সঙ্গে বাঙালীর, এবারকার লড়াই বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর। এই তফাৎটাকে খাটো করে দেখার দরকার নেই, কিন্তু এই তফাৎটা বড় ওই সত্যটাকে ঢেকে দেবে না যে, শাসক শাসকই, শাসিত শাসিতই এবং শাসক যেখানে নিপীড়ন করে সেখানে অন্য কোনো পরিচয় প্রধান পরিচয় নয়। উনসত্তরে আয়ূব- মোনেমের বিরুদ্ধে জনগণের যে ঘৃণা ছিল নব্বইয়ে এরশাদশাহীর বিরুদ্ধে ঘৃণাটা তার চেয়ে কম ছিল না, যদি বেশী না হয়। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মতোও বটে। আবারও সেই একই স্বতঃস্ফূর্ততা, জনগণের ঐক্য এবং নিপীড়নকারীদের প্রতি ঘৃণা। তফাৎ অবশ্য এই যে, একাত্তর একটি পুরাতন রাষ্ট্র ভেঙেছে, আর নব্বই একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটিয়েছে।

উনসত্তর উনসত্তর হতো না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহাকে বাদ দিয়ে, ওই শিক্ষক নিজের প্রাণের বিনিময়ে জনতার বিক্ষোভকে দ্বিধার দ্বারটুকু পার করে নিয়ে গিয়ে অভ্যুত্থানে পরিণত করে দিয়েছিলেন। আমরা কি করে ভুলি যে একই রকমের ঘটনা ঘটল নব্বইতে এসে। আরেকজন শিক্ষক, ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন নিজের প্রাণ দিয়ে এক নিমেষে আন্দোলনকে উন্নীত করে দিলেন অভ্যুত্থানের স্তরে। শহীদরা তাই করেন। বরকত-রফিকও একই দায়িত্ব পালন করেছেন বায়ান্নতে, আসাদও করেছেন ওই উনসত্তরেই।

এরশাদ সরকারের পতন খুবই জরুরী ছিল জাতির জন্য। কেননা অধঃপতিত এই সরকার প্রতিদিন নীচের দিকে ঠেলছিল, গোটা জাতিকে। এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কুকীর্তির তুলনা মেলা ভার, কিন্তু নৈতিক ক্ষেত্রে এই সরকারের দুষ্কর্ম ছিল সব চেয়ে ভয়াবহ। ড. জোহা শহীদ হয়েছেন পাকসেনাদের হাতে। ওরা ছিল লেলিয়ে দেয়া কুকুর। কিন্তু ডাঃ মিলনকে যে কুকুরেরা হত্যা করলো তারা পেশাদার নয়, অবাঙালীও নয়, তারা ছাত্র এবং তারা বাঙালী। ওই ঘাতকদের একজন সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সরকারের পক্ষের নয় বিরোধী বলেই গ্রেফতার হয়ে জেলে ছিল। এরশাদ সরকার তাকে ছেড়ে দিয়ে লেলিয়ে দিয়েছে ডাঃ মিলনদেরকে হত্যা করার জন্য। শোনা যায় ছেড়ে দেবার আগে তাকে জেল থেকে বের করে এনেছে, বের করে এনে সলাপরামর্শ করেছে এবং প্রচুর টাকা দিয়েছে ঢুকিয়ে, তার পকেটে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নাকি তার কথা হয়েছে। তারপরে আন্দোলনের মধ্যে হঠাৎ জেল থেকে তার মুক্তি এবং ওই কুকীর্তি। এতটা আয়ুব- মোনেমও পারেনি। আয়ুব-মোনেমের কুকীর্তিগুলোর মধ্যে ছিল খোকা- পাচপাত্তু। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে সাপ খেলাতো এবং ছুরি নিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতো, কিন্তু এই অতিপ্রকাশ্যে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার রাস্তায়, দিনেদুপুরে পুলিশকে পেছনে রেখে ডাঃ মিলনের মতো একজন মানুষকে হত্যা করা এটা আয়ুব- মোনেমেরও সাধ্যের বাইরে ছিল। হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদের একনায়কত্ব নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু ওই যে বললাম নৈতিকভাবে জাতিকে অধঃপতিত করার অত্যাশ্চর্য দক্ষতা যার কারণে মিথ্যাচার, ভণ্ডামি, লাম্পট্য, মস্তানি, দেশের সম্পদ বিদেশে পাঠানো এবং নিজের স্বার্থের তুলনায় বড় কিছু দেখতে না পাওয়া সর্বত্র আদর্শায়িত হয়েছিল সেখানে তরুণসমাজকে নষ্ট করার ব্যাপারে এর তৎপরতা বিশেষভাবেই উল্লেখের দাবী রাখবে। ওই সরকার যুবকদের কাউকে করেছে নেশাখোর, অনেককে করেছে মস্তান, প্রায় সবাইকে করেছে হতাশাগ্রস্ত এবং সকলকে সর্বক্ষণ উৎসাহ দিয়েছে অপরাধী হবার। যে যুবক ডাঃ মিলনকে হত্যা করল, কেবল একজন মেধাবী চিকিৎসককেই হত্যা করেনি, নিজেকেও হত্যা করেছে। জাতি তার ফাঁসি চায়। ফাঁসি হবে কি হবে না জানি না। কিন্তু একথা তো সত্য যে, ওই যুবকের পক্ষে আর যাই হোক এমন একজন ঘাতক হবার কথা ছিল না। সরকার রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করেছে তাকে ঘাতক বানাবার কাজে। এরশাদ সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বারম্বার আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে সন্ত্রাসের কারণে। সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্ত্রাস উধাও হয়ে গেছে। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে বের হয়ে এসেছে রাস্তায়, উল্লাসে এবং নির্ভয়ে। তাতে প্রমাণ হয় সন্ত্রাসী ছিল কে সরকার, নাকি ছাত্রসমাজ।

নব্বইয়ের এই আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকাই মুখ্য। এটা ইতিহাসসম্মত বটে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এমন কোন আন্দোলন হয়নি, ছাত্ররা যাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেনি। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে মূলতঃ সরকারী পদক্ষেপের কারণেই ছাত্রসমাজের ভাবমূর্তি ক্রমাগত ম্লান হয়ে আসছিল। এরশাদ সরকার উটের পিঠে শেষ খড়্গটি চাপিয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহ আবার ওইখান থেকেই এসেছে। ছাত্ররাই রুখে দাঁড়িয়েছে সবার আগে। যেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠিত হয়েছে সেদিনই কিন্তু এরশাদশাহীর মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে। ঐক্যই অন্যদেরকে ঐক্যবদ্ধ করল। রাজনৈতিক নেতারা যা করতে পারেননি, ছাত্ররা তা করেছে, তারা এক মঞ্চে মিলে গেছে, এক সঙ্গে আন্দোলন করেছে, অভিন্ন শোভাযাত্রার পথ ধরে এগিয়েছে। বয়স্করা তরুণদের পথ দেখায়নি, তরুণরাই বয়স্কদের পথ দেখালো। ওইখানেই আমাদের আশা, আগের প্রজন্ম যা করবার করে ফেলেছে, নতুন প্রজন্মকে অনেক কিছু করতে হবে; এবং নতুন প্রজন্ম ভালো করবে যদি বয়স্কদের সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধির শিক্ষাটাকে অনেক দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। তরুণ, তুমি দূরে থেকো এবং সামনে থেকো।

ডাঃ শামসুল আলম খান মিলনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, কিন্তু তাদের অনেককেই আমি চিনি, যারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। তাঁরা অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করে তাঁর মানবিক গুণাবলীর। এরশাদ সরকার যে একটি অত্যন্ত বিতর্কিত স্বাস্থ্যনীতি দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে চিকিৎসকরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছেন। ওই আন্দোলনের একেবারে সামনে ছিলেন মিলন। যেদিন শহীদ হলেন তিনি, সেদিনও চিকিৎসকদের ধর্মঘট ছিল। মিলন যাচ্ছিলেন তাঁদের এক সমাবেশে যোগ দিতে; পারলেন না, পথিমধ্যে শহীদ হলেন ওই ঘাতকদের হাতে। সরকার এদেশের চিকিৎসকদের কম ক্ষতি করেনি। স্বাস্থ্যনীতিবিরোধী আন্দোলনের সময় যতভাবে পারা যায় সরকার চিকিৎসকদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চেষ্টা করছে। আর যে পুঁজিবাদী মুনাফাপ্রবণ আদর্শকে মারাত্মক ব্যাধির মতো সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার নিরন্তর চেষ্টায় সরকার লিপ্ত ছিল, সেই ব্যাধির হাত থেকে চিকিৎসকরা নিজেরাও যে রেহাই পেয়েছেন তেমন বলা যাবে না, রোগ তাঁদের মনোভঙ্গির মধ্যেও প্রবেশ করেছে বলে দুরু-দুরুবক্ষ রোগীরা প্রতিনিয়ত সন্দেহ করতে বাধ্য হন। আন্দোলনরত চিকিৎসকদের নেতৃস্থানীয় একজনকে হত্যা করে ঘাতক স্বৈরশাসন তার সেই পৈশাচিক মুখচ্ছবিকেই নতুনভাবে উন্মোচিত করল।

বাংলাদেশে যত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় রয়েছে তাদের প্রত্যেকটির সদর দরজার কাছেই একটি তালিকা আছে, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শিক্ষক ও

ছাত্রদের। পাকবাহিনী ও তার দোসর আলবদরদের হাতে এঁরা প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু ওই খুনীরা তো আজ নেই। দেশ তো আজ স্বাধীন। কিন্তু তবু আজও যে ডাঃ মিলনেরা রাজপথে শহীদ হন এই ঘটনার অর্থ কি? অর্থ খুব স্পষ্ট। মানুষ আজও এদেশে নিরাপদ নয়। ওই ঘটনা বলে গেলো একথা যে, আমরা কেউই ভালো নেই। মানুষ এখানে চিকিৎসা পায় না, চিকিৎসকেরা এখানে নিরাপত্তা পান না, রাজপথে নিহত হন। না, মানুষের নিরাপত্তা নেই। ঘাতকেরা সর্বক্ষণ ও সর্বত্র তৎপর রয়েছে।

একাত্তরের যুদ্ধ হঠাৎই শেষ হয়ে গেছে। ইতিহাস একথাই বলবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ আসলে শেষ হয়নি। শেষ যে হয়নি তার স্পষ্ট প্রমাণ দু'টি। এক, মানুষ এখনও নিরাপদ নয়। দুই, মানুষ এখনো আন্দোলনে রয়েছে। এই অসমাপ্ত যুদ্ধ আজো চলছে সমাজ পরিধির সব এলাকাতে এবং তা চলবে যতদিন পর্যন্ত না চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে।

চূড়ান্ত লক্ষ্যটা কি? সেটি হচ্ছে এমন একটি গড়ে তোলা- যেখানে ডাঃ মিলনদের গায়ে কোনো দুর্বৃত্ত হাত দিতে সাহস পাবে না। যেখানে আনন্দের পেছনে শোকের কালো ছায়ার ভ্রূকুটি রইবে না। তবু নব্বইয়ের এই বিজয়ও কম বিজয় নয়। স্বৈরাচারী সরকারের পতন যেমন জরুরী ছিল, তেমনি ছিল অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যম্ভাবী এই জন্য যে, এই সরকারের পেছনে বিশেষ বিশেষ মহল ছাড়া জনগণের কোনো অংশেরই কোনো সমর্থন ছিল না।

একাত্তরে পাকবাহিনী যতসংখ্যক রাজাকার সংগ্রহ করেছিল, এরশাদ সরকার ততসংখ্যক সমর্থক সংগ্রহ করতে পারেনি। উল্টো ঘৃণা ছিল প্রচণ্ড। সেই ঘৃণার আগুনে দগ্ধ হয়েছে এরশাদশাহী। কিন্তু সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে, পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে চলে গেছে তাতো বলতে পারি না। কেননা যে যন্ত্র ও শক্তিগুলোর সাহায্যে স্বৈরাচার তার নিপীড়ন চালাতো তারা তো রয়ে গেছে। আমরা দুর্বৃত্তদের বিচার চাই, কিন্তু যে প্রবণতা ও নৈতিকতার তারা প্রতিনিধি তারা রয়ে গেলো সমাজদেহে। রোগ ও আবর্জনা পরিষ্কার করা দরকার। কেবল দোষী লোকগুলো নয়, দোষী আদর্শেরও বিচার ও শাস্তি দেওয়া দরকার-তাকে নির্মূল করার লক্ষ্যে।

এবারের আন্দোলনে মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ ছিল প্রধান ঘটনা। মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের ঘৃণাকেই প্রকাশ করেছে নিজস্ব বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। বিজয়ের যে আনন্দ সেটা সাধারণ মানুষের জীবনে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। পতনের সেই রাতে মধ্যবিত্ত বের হয়ে এসেছে রাজপথে, আনন্দ করেছে, উল্লাস করেছে। বিজয় দিবসের আগে যেন আরেক বিজয় দিবস। যেন যে আনন্দ ভুলে গেছিল মানুষ সেই আনন্দের অধিকার ফিরে পাওয়া গেছে। কোথাও কোনো ভয় ওঁৎ পেতে ছিল না মানুষের জন্য। মধ্যরাতে মহিলারাও হেঁটেছেন নির্ভয়ে।

যাতে বোঝা যায় ক্ষমতাসীনরাই ছিল সবচেয়ে বড় দুর্বৃত্ত, মানুষ নয়। প্রমাণ হলো যে, গণঅভ্যুত্থানের মতো সুন্দর ও নির্মল ঘটনা খুব কমই আছে এই মলিন জগতে।

এই গণঅভ্যুত্থান প্রমাণ করল যে, নিপীড়িত মানুষ আত্মসমর্পণ করেনি। কেমন করে সরকারের পতন ঘটবে লোকে তা স্পষ্ট জানতো না, কিন্তু রাজপথে সেই ঘটনা ঘটে গেলো। চূড়ান্ত বিজয়? চূড়ান্ত, বিজয় বলে কি আদৌ কিছু আছে? হ্যাঁ, আমরা বলতে পারি যে, সেই বিজয়ই চূড়ান্ত যে বিজয়ে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনকে আনন্দমুখর করে তুলবে এবং জীবনযাপন নিজেই একটি উৎসবে পরিণত হবে একদিনের নয়, প্রতিদিনের। বলাই বাহুল্য যে, এই নয়, লক্ষ্য এমনি এমনি অর্জিত হবে না। এর জন্য জনগণকে পিছিয়ে রাখছে যে ব্যবস্থা তাকে বদলে ফেলতে হবে। সরকারের পতন হয়েছে, সেটা কম কথা নয়, কিন্তু তবু ব্যবস্থার তো পতন হয়নি, সেটা তো নির্মম সত্য। আমরা আশা করবো দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এবং তার মাধ্যমে একটি নির্বাচিত সরকার ও একটি সচেতন বিরোধী দল আমরা পাবো। যাঁরা ক্ষমতায় যাবেন তাঁরা হয়তো নিজেদের বিজয় দেখে ভাববেন যে, জনগণের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। কিন্তু জনগণের বিজয় অপেক্ষা করবে এবং তা আসবে ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই, কোনো সহজ পথে নয়।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ভেতর প্রতিশ্রুতি ছিল মুক্তিযুদ্ধের, নব্বইয়ের এই নতুন অভ্যুত্থানের ভেতরও তেমনি প্রতিশ্রুতি আছে আগামীকালের নতুন সম্ভাবনার এবং আরো বড় পরিবর্তনের। মানুষ আশা হারিয়ে ফেলছিল, ঘটনা প্রমাণ করল যে, আশা আছে। দেখা গেলো যে, জনগণের শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে এমন ক্ষমতা স্বৈরাচারের হাতে নেই– সেই স্বৈরাচার যতই স্বৈরাচারী ক্ষমতাবান হোক না কেন। হত্যা সামরিক ও সামরিক অভ্যুত্থান ছাড়াই গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে যে সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব তার প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে পাওয়া গেলো। বোঝা গেলো জনগণের ভাগ্য নিহিত রয়েছে জনগণেরই হাতে। আমেরিকা, বৃটেন কিংবা জাপান নয়, সাহায্যদাতা সংস্থাগুলোও নয়, জনগণই করেছে জনগণের কাজ। এবং মানুষের মধ্যে আশা জেগেছে, যে আশা উন্নত জীবনের জন্য তো বটেই, বাঁচার জন্যও প্রয়োজন।

কিন্তু বিজয়কে আরো বড় বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সামান্য কাজ নয়, কেবল স্বতঃস্ফূর্ততারও কাজ নয়। শুধু আশা যথেষ্ট নয়, তার জন্য সংগঠিত ও সচেতন আন্দোলন প্রয়োজন। সচেতন আন্দোলন শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন আমরা তখনই করতে পারবো, যখন সমস্ত সমাজ আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তাঁরা সবাই আলোর প্রত্যাশী, অন্ধকারের নয়। আলো জ্বলে অব্যাহত আন্দোলন ভিন্ন।[২২৮]

পরের সপ্তাহে ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর সংবাদের সাপ্তাহিক নিয়মিত কলাম 'সময় বহিয়া যায়' প্রকাশিত হয়। এই কলামে সতর্ক করা হয় যে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হলেও আসন্ন নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যে স্বৈরাচারের সহযোগীরা সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ নিতে পারে। একই সঙ্গে কলামে স্বৈরাচারমুক্ত দেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ না দেওয়ারও আহ্বান জানানো হয়। 'গাছ পাথর' ছদ্মনামে এই কলামে লেখা হয়:

> 'আমরা কি ধরনের গণতন্ত্র পেতে যাচ্ছি বলে আপনি মনে করেন?' বেশ উদ্বিগ্ন মুখে একজন ভাড়াটে প্রশ্ন করেছেন আমাকে। আমি ভেবাচেকা খেয়ে যাই, দেখি ঠাট্টা নয়। হাসিহাসি মুখ বটে, কিন্তু বেশ শক্ত কিছু একটা আছে পেছনে। কি সেটা বুঝতে না পেরে আরো বেশী অস্বস্তিতে পড়ি।
>
> আমার অবশ্য বলবার ছিল। এখনি এসব প্রশ্ন কেন? পতন ঘটেছে স্বৈরাচারের, জয় হয়েছে জনগণের, এখনি, এই উৎসবের মধ্যে, এসব কঠিন প্রশ্ন কেন? কিন্তু ওই যে ব্যাপার, দেখি তিনি অনেকটা অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন; যেন প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের উত্তর জানাই আছে তাঁর; আমাকে কেবল শোনাতে চান। আমি তাই জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসু মুখে তাকিয়ে থাকি। আশা করি তিনিই বলবেন, যা বলার।
>
> বোঝা গেল বাড়িওয়ালার অত্যাচারে ইনি বড়ই জব্দ আছেন যেন– রাজায়-প্রজায় সম্পর্ক। এঁরা সচ্ছল পরিবার, ঢাকায় বাড়ি আছে কিনা জানি না, তবে কারখানা যে আছে সে তো শুনলামই। ধানমণ্ডি এলাকায় বেশ বড় অঙ্কের ভাড়া দিয়ে তিনতলা বাড়ির নীচের তলায় থাকেন। কিন্তু বড্ড কষ্টে ছিলেন বাড়িওয়ালার স্বৈরাচারে। বাড়িওয়ালা মহিলা, স্বামী পরলোকগত। কিন্তু তাঁর কয়েকজন সন্তান আছে, কেউ কারো চেয়ে কম নয়। একজনের চেয়ে অন্যজন বেশী জাঁদরেল। বাড়িওয়ালার এক মেয়ে ওই বাড়িতেই থাকে; তাঁর স্বামী ছিল জাতীয় পার্টির এমপি। বুঝতেই পারছেন, রবদবা বড় কম ছিল না। তা থাকবেই। মেনেও নিতে হবে। ভাড়াটেরা নিয়েছিলেন মেনেও।
>
> যে রাতে 'মহামান্য' রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করবেন বললেন, সেটা তো একটা নাটকীয় রাত। টেলিভিশনে রাত দশটার খবরে কোন ফাঁকে এসেছে কেউ খবরটা। কেউ শুনেছেন, কেউ শোনেননি, যাঁরা শুনেছেন তারাও বিশ্বাস করতে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেননি। বিবিসি ধরো, ভয়েস অব আমেরিকা কি শেষ হয়ে গেছে, এসব করে করে যখন নিশ্চিত হওয়া গেছে যে হ্যাঁ, যে ঘটনার জন্য তাঁরা প্রতীক্ষা করছিলেন, দোয়া করছিলেন নিয়মিত, সেটা ঘটে গেছে তখন আর ঘরে বসে থাকা নিরর্থক মনে করে গোটা পরিবার বের হয়ে গেছেন রাস্তায়। এখানে-

সেখানে কোথায়-কোথায় ঘুরে ফিরেছেন সেই রাত দেড়টায়। পরদিন সকালে অভ্যাস মতো প্রাতঃভ্রমণে বের হবেন, দেখে একী কাণ্ড, দরজায় তালা। বাড়িওয়ালা নতুন তালা লাগিয়ে দিয়েছেন, যার চাবি ভাড়াটেদের কাছে নেই। তখন আর কি করা যায়, হাতুড়ি এনে পিটিয়ে তালা ভেঙে তাঁরা বের হয়ে গেছেন ভ্রমণে। আগে হলে সাহস পেতেন না, কিন্তু এখন তো আর এরশাদ নেই।

আশা ছিল ঘটনার ওপর যবনিকা এখানেই পড়ে যাবে। তাইতো স্বাভাবিক, স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটেছে। জাতীয় পার্টির এম পি তো এখন গা ঢাকা দেবে, তার কি সাধ্য ভাড়াটের সঙ্গে ঝগড়া করে। না, এমপি আসেনি, সে গা-ঢাকা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু দুপুর হতে না হতেই বাড়িওয়ালার আরেক মেয়ে এসে হাজির। 'পেয়েছেন কি? তালা ভাঙেন?' এই মেয়ে পারে তো মারে করে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। তখন ভাড়াটের স্ত্রী গেছেন এগিয়ে, মেয়েদের ঝগড়া মেয়েদের মধ্যেই রাখা ভাল, তাছাড়া স্বামী একটু রাগচটা, প্রেসার আছে, কখন কি করে বসে ঠিক নেই, তাই মহিলাই এগিয়ে গেছেন। বলেছেন, 'ঠিক করেছি।' 'ঠিক করেছি, জানেন আমি কে? কার স্ত্রী?' বলে বাড়িওয়ালার সেই অগ্নিশর্মা কন্যাটি ভাড়াটে মহিলাকে যা বললেন, সেটা শুনে এ পক্ষ স্তম্ভিত। কন্যাটি অপজিশনের একজন নামকরা ব্যক্তিত্বের নাম করলেন। না, এঁরা যে জানতেন না তা নয়, বিলক্ষণ জানতেন বাড়িওয়ালার মেয়েদের কোথায় কোথায় বিয়ে হয়েছে, না জেনে রক্ষা ছিল না। কিন্তু জানতেন না যে, আগে জাতীয় পার্টির এমপিকে ভয় করতে হয়েছে, এখন ভয় করতে হবে অপজিশনের লোকদের।

তাহলে পরিবর্তনটা কোথায় ঘটল? কার পতন? কার উত্থান? সব তো ভায়রা-ভাই। ভাড়াটের অবস্থা আগের মতোই। তখন জব্দ হতেন এক দলের হাতে, সেটা ছিল স্বৈরাচারের যুগ, কিন্তু এখন তো সেই শাসন নেই। দেশে একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে, এবং যা কখনো ঘটেনি এদেশের ইতিহাসে তাই ঘটেছে, ওপর তলায় খুনোখুনি না করেই প্রকাশ্য রাজপথেই পতন ঘটেছে স্বৈরশাসনের। তারপরও যদি নিপীড়িত হতে হয় নতুন নামে, ভয় পেতে হয় একদলের বদলে অন্য দলকে, তাহলে পরিবর্তন কি ঘটল? কি ধরনের গণতন্ত্র আশা করতে পারি আমরা, বলুন, আপনিই বলুন? তাহলে কেন এই আত্মত্যাগ? কেন এতো আন্দোলন?

ইনি অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলছিলেন, কিন্তু সাধারণ প্রশ্নও নিশ্চয়ই আছে। যেমন প্রশ্ন, সাবেক রাষ্ট্রপতিকে গ্রেফতার করতে এতো দেরী হলো কেন? গ্রেফতারের পরে তাঁকে জেলখানায় না নিয়ে বিলাসবহুল বাসগৃহে কেন রাখা হলো? মন্ত্রীদের যে গ্রেফতার করা হবে এতো ছিল মানুষের ন্যূনতম প্রত্যাশা। তা করা হয়নি। যাদের

গ্রেফতারের আদেশ দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কারও কারও নাম নেই। যখন রাজনৈতিক আন্দোলন চলে তখন কাউকে আটক করা হলে আগে ঘটে ঘটনা, পরে আসে হুকুম ও খবর। গ্রেফতারের পরে কাগজে তা পাওয়া যায়। সব সময়ে যে পাওয়া যায় তাও সম্ভব নয়। মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন; সেই একই পুলিশ ও গোয়েন্দাবাহিনী তো রয়ে গেছে, তবে তারা গ্রেফতার করতেই বা পারছে না কেন? স্বৈরশাসনের অবসানে কি তাদের দক্ষতার কিছু ঘাটতি পড়েছে?

শোনা গেলো একজন মন্ত্রী ও একজন গুরুত্বপূর্ণ লোকসহ সাবেক পররাষ্টমন্ত্রী থাইল্যান্ডে পালিয়ে গেছেন। সেখানে সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তিনি দেখা করবেন না, করলে একটি নয়, দু'টি প্রশ্নের জবাব দিতে হতো তাঁকে। এক, কেন পতন হল? দুই, কি করে পালালেন? পতন ও পলায়ন দুটোই লজ্জার ব্যাপার, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য। কিন্তু তিনি যে পালাতে পারলেন সেটাও তার দেশের জন্য কম লজ্জার ঘটনা নয়। আইন-শৃংখলা এতোই শিথিল, এতো সহজে ধূলো দেয়া যায় বিভিন্ন বাহিনীর চোখে? নতুন যুগেও?

কি ধরনের গণতন্ত্র আমরা আশা করতে পারি– এ প্রশ্নটা তাই উড়িয়ে দেবার নয়। প্রশ্নটা সাতচল্লিশে উঠেছিল, হয়তো ব্যাপকভাবে নয়, তবে উঠেছিল ঠিকই। প্রশ্নটা একাত্তরে উঠেছিল। জানুয়ারীতেই আরও কিছুটা ব্যাপকভাবে। প্রশ্নটা এবারও উঠেছে, অনেকের মনেই। বিজয়ের আলোর পেছনে দু'টি কালো ছায়া, একটি দুঃখের, অপরটি আশঙ্কার। দুঃখেরটা শহীদদের জন্য। আশঙ্কাটা ভবিষ্যৎ নিয়ে। সাবেক রাষ্ট্রপতির কুশাসন ছিল অবাধ লুণ্ঠনের কাল। রাষ্ট্রপতি গেছেন, কিন্তু লুণ্ঠন কি যাবে? পুরনো গুণ্ডারা সাময়িকভাবে গা-ঢাকা দিয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের শূন্যস্থান অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই পূরণ হয়ে গেছে শুনেছি। যেখানে হয়নি সেখানেও অচিরেই হবে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে– নতুন গুণ্ডারা এসেছে কিংবা আসবে। বিদেশী সাংবাদিক একজন এসেছিলেন শহীদ মিনারে, ব্যস্ত ছিলেন ছবি তুলতে, পরে পকেটে হাত দিয়ে দেখেন তার জন্য অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেছে। মানিব্যাগটি উধাও হয়ে গেছে। হ্যাঁ, শহীদ মিনারেই। পতনের দু'দিন পরে ঢাকার সায়েদাবাদে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। সরকারের বড় পদে আছেন এমন একজন বড়ই চিন্তিত মুখে বললেন আজ সকালেই যে, তাঁকে ফোন করেছিলেন বিরোধীদলীয় এক ব্যক্তিত্ব। ঠিকাদারের জন্য তদ্বিরে। শুনে ইনি বলেছেন, ওই ঠিকাদার তো ক'দিন আগে জাতীয় পার্টির মন্ত্রীকে দিয়ে ফোন করাতেন। জানেন আপনি? টেলিফোনে চোহারা দেখতে পাননি, তবে গলায় কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেননি তিনি তদ্বিরকারকের।

বদল তো হয়েছে অবশ্যই। মহামান্যরা সব গেছেন চলে। কিন্তু ব্যবস্থা? ব্যবস্থাতো বদলায়নি। মানুষ লোক কিংবা সরকার বদলের জন্য লড়ছিল না, লড়ছিল ব্যবস্থার বদলের জন্য। ব্যবস্থার পরিবর্তন সামান্য ব্যাপার নয়। স্বৈরাচারকে উপড়ে ফেলা কঠিন হবে, কেননা এর মূল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। এর জন্য প্রয়োজন হবে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার। সেটা সহজ কাজ নয়।

অতদূর না হয় নাই গেলাম। ছোট ছোট কাজগুলোই বা করবেন কি করে? যেমন ধরা যাক, পীরদের ব্যাপারটা। পীর-ফকির এদেশে কোন নতুন ব্যাপার নয়। সব সময়েই তারা ছিল। এমনকি রাজনীতিতে তাদের তৎপরতাও দেখা গেছে। মুসলিম লীগ পীরদের সমর্থন সংগ্রহ করতো। তার শাসন বজায় রাখতে। একাত্তরের কোন কোন পীর অতি জঘন্য ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু সদ্যপতিত সরকারটির মতো পীরতন্ত্রের সেবা করতে অন্য কোন সরকার কোনদিন পারেনি। মহামান্য যেতেন, কাজেই চেলাচামুণ্ডারাও যেতো। কাজ হতো। পীর সাহেব একে বলে ওর, ওকে বলে এর কাজ করে দিতেন। ব্যাপারটার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র ছিল না। এ ছিল পুরোপুরি বৈষয়িক ও বস্তুতান্ত্রিক, কিন্তু এর গায়ে একটা পোশাক পরানো হয়েছিল অলৌকিকতার। যাদুতে তবু কিছু কসরৎ থাকে, এর ভেতর সেটুকুও ছিল না। শোনা যায়, অনেক অপরাধীও পীরের আস্তানায় গিয়ে আশ্রয় নিতো। স্বৈরাচারের আমলে পীরদের রাজনৈতিক শক্তির বিষয়টির তদন্ত হওয়া দরকার।

ন'বছরে যা যা ঘটেছে, কারা ঘটিয়েছে, কি করে ঘটলো তার সবটার ওপরই তদন্ত হওয়া আবশ্যক। শুধু যে অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার জন্য তা নয়, ব্যাপারটাকে বোঝার জন্যও এবং এরকম ঘটনা যাতে আবার না ঘটে তা নিশ্চিত করার স্বার্থেও। যাঁরা গবেষক তাঁদের জন্য এটা একটি চমৎকার ক্ষেত্র। কয়েকটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভের উপাদান এখানে অনায়াসে পাওয়া যাবে।

যত প্রতিষ্ঠান আছে দেশে তার সবগুলোতেই পাওয়া যাবে স্বৈরশাসনের হস্তক্ষেপের কলঙ্কাকীর্ণ নিদর্শন। যেমন, উপজেলা ব্যবস্থা বড় বড় ঢাকঢোল পিটিয়ে এটি প্রবর্তন করা হয়েছিল। ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীও পাওয়া গিয়েছিল কিছু কিছু এর প্রশংসা করবার। বলা হয়েছিল এর মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে। উপেক্ষিত গ্রামগুলো সব জেগে উঠবে। উল্টোটাই ঘটলো। উপজেলা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা চলে গেছে স্বৈরশাসকের হাতে। আর কৃষকের দ্বারপ্রান্তে যা গেছে তা হচ্ছে দুর্নীতি, মস্তান ও টাউট।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মুক্ত ছিল না। পুরানো ঢাকার একটি অত্যন্ত বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের কাজ হয়েছে তা রোমহর্ষক। নির্বাচিত সংসদ একটি গণতান্ত্রিক সংস্থা, ওই কলেজে সংসদ ছিল একটি ভয়ানক

ব্যাপার। কলেজের একজন শিক্ষক আমাকে বলছিলেন সে কথা। বলে শেষ করতে পারেন না। সংসদ একদলীয়, অর্থাৎ এরশাদদলীয়, অন্য দলকে মাথা উঁচু করতে দেয়া হতো না; একবার নির্বাচিত হয়ে সংসদ অনেক বছর শাসন করতো। কলেজের কোন নির্মাণ কিংবা মেরামত কাজ হতো না তাদের হস্তক্ষেপের বাইরে। সংসদ ছাত্র ভর্তি করতো এবং টাকা নিতো। বিভাগ যত না ভর্তি করতো, সংসদ ভর্তি করতো তার চেয়ে বেশী। কলেজটি নকলের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল এবং নকল হতো সংসদের তত্ত্বাবধানে। এসব তিনি বিস্তারিত করে বলছিলেন। একবার সংসদ ঠিক করলো কলেজে আর নকল হবে না। কলেজের সুনাম নষ্ট হচ্ছে, এটা চলতে পারে না। নকল বন্ধ হলো। কিন্তু কাদের জন্য? সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। সংসদের কর্তা ও তাদের পোষ্যরা নকল ঠিকই করবে এবং তাদেরকে নকলে সুযোগ দিতে হবে– ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই রকমের। হলের মধ্যে নকল না করে বাইরে থেকে লেখা খাতা এনে জমা দেয়ারও ব্যবস্থা ছিল। কলেজের সংসদ বাতিল হয়েছে। ভাল কথা, কিন্তু ওইসব ছাত্রনামধারীরা কি একাই করতো ওই কাজ? তাদের সঙ্গে কি কোন শিক্ষক ছিলেন না? সেসব শিক্ষকের সংখ্যা খুবই নগণ্য, কিন্তু তাঁরা তো ছিলেন। তাঁদের কি হবে? তদন্ত তো এখানেও হওয়া চাই। কলেজের ওই শিক্ষক বলছিলেন খুব আবেগ দিয়ে।

কাজেই কি ধরনের গণতন্ত্র আমরা পেতে যাচ্ছি সেটা একটা বড় প্রশ্ন বটে। তাই বলে নব্বইয়ের যে বিজয় তাকে খাটো করে দেখা যাবে না। এই বিজয় একাত্তরের বিজয়েরই ধারাবাহিকতায় এসেছে। নদী যেমন সমুদ্রের দিকে চলে, বিজয়ও তেমনি এগুচ্ছে। প্রমাণ হয়েছে যে যত শক্তিশালীই হোক জনগণের ঐক্যের কাছে স্বৈরশাসনের পতন অবশ্যম্ভাবী। মানুষের মনে নতুন আশা জেগেছে। বাঁচার জন্য এই আশা বড়ই জরুরী। কিন্তু স্বৈরশাসনের ভিত তো রয়ে গেছে সমাজে। সেটা যেন না ভুলি আমরা। সামনে নির্বাচন। আগের সরকার নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছিল। নির্বাচন ছিল ভোটকেন্দ্র দখলের তৎপরতা। দেখতে হবে এবারও যেন সে ঘটনা না ঘটে। যেন সহিংসতা দেখা না দেয়। এবং নির্বাচনের হট্টগোল ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে যেন স্বৈরাচারের সহযোগীরা সমাজে পুনর্বাসিত না হয়ে যায়। আরো দেখা দরকার যেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করে।

কারা করবেন এ কাজ? রাজনৈতিক দলগুলো করবেন বলে ভরসা কম। ছাত্ররা করতে পারে। এবারকার আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। তাদের ঐক্যের ফলেই এবং ওই ঐক্যের চাপেই রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের নিকটবর্তী হতে পেরেছিল। ছাত্ররা ছিল একই সঙ্গে

ঐক্যবদ্ধ ও অনমনীয়। তাদেরকে বিভক্ত করার চেষ্টায় স্বৈরাচারী সরকারের কোন ক্লান্তি ছিল না। টাকা ঢেলেছে, অস্ত্র তুলে দিয়েছে হাতে, কিন্তু তবু পারেনি ঐক্য ভাঙতে। এই ঐক্য যদি ছাত্ররা নিজেরাই ভেঙে ফেলে তবে সেটা দুঃখজনক হবে নিশ্চয়ই। আমরা আশা করবো নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি দাবীর ব্যাপারে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। এই দাবীগুলোর মধ্যে থাকবে স্বৈরাচারের দোসরদের এবং মৌলবাদীদের কোনপ্রকার প্রশ্রয় না দেয়া। আর থাকবে এই দাবীও যে নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, যাতে হানাহানি না ঘটে এবং নির্বাচনের সময়ে বা তার পরে যেন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় যাতে আবার একটি সামরিক শাসনের অজুহাত তৈরী হয়ে যায়। যুব সংগঠনগুলোও এবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এক্ষেত্রে তাদেরও কর্তব্য রয়ে গেছে। কর্তব্য আছে সংস্কৃতিসেবী এবং পেশাজীবীদেরও। এবারের আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন অতীতের কোন আন্দোলনে তাঁরা তেমনটা নিতে পারেননি। তাঁরাও এ বিষয়ে জনমত সৃষ্টি করতে পারেন।

কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের আরো বড় একটা ভূমিকা থাকবে। সেটা হলো দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার পক্ষে কাজ করা। এ কাজ তারা আলাদাভাবে করতে পারবেন না। পারবেন জনগণের সঙ্গে যদি যুক্ত হন তবেই। প্রকৃত গণতন্ত্র আসবে, ওই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি যদি গড়ে তুলতে পারি তাহলেই। স্বৈরশাসনের ভিত উপড়ে ফেলার জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন আবশ্যক। বুদ্ধিজীবীরা পারেন সেই লক্ষ্যে কাজ করতে। না, বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সংলগ্ন হয়ে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আইন করে নিষ্কণ্টক করা যাবে না, নিষ্কণ্টক করতে হবে ভেতর থেকে সাংস্কৃতিকভাবে। ইতিমধ্যে প্রবল ঘৃণারও দরকার, প্রবল সামাজিক ঘৃণা চাই –স্বৈরশাসকের সহযোগীদের প্রতি। সমাজের সকল স্তরে তা দরকার। ঘৃণাহীন ভালবাসা কোন ভালবাসাই নয়। ভালবাসাই লক্ষ্য, গণতন্ত্রই অভীষ্ট। কিন্তু গণতন্ত্র আসবে না গণতন্ত্রবিরোধীদেরকে ঘৃণা না করলে। মানুষ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন। তাদের আরো বেশী সচেতন করা দরকার ঘৃণার বস্তু ও ভালবাসার বস্তুকে আলাদা করে দিয়ে, এবং ওই দুই বস্তুকে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে।[২২৯]

চিঠিপত্রঃ

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের অভিমত তুলে ধরেন। দৈনিক ইত্তেফাকে ১২টি চিঠি প্রকাশিত হয়। ছয়টি চিঠির বিষয় ছিল নির্বাচন। ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে নির্বাচন বিষয়ক দুটি চিঠি

প্রকাশিত হয়। একটি চিঠিতে আসন্ন নির্বাচনের জন্য নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করার দাবি জানানো হয়। চিঠিটি লিখেন নারায়ণগঞ্জের কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট থেকে আশরাফ ও কমল। চিঠির শিরোনাম: 'নতুন ভোটার তালিকা চাই'। এতে লেখা হয়:

> গত ০৯.১২.১৯৯০ তারিখের পত্রিকায় জানিতে পারিলাম নির্বাচন কমিশন আসন্ন নির্বাচনে পুনরায় ভোটার তালিকা তৈরী করিবার বিপক্ষে মত দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, বিগত দিনে যে ভোটার তালিকা তৈরী করা হইয়াছিল, তাহা অগণতান্ত্রিক সরকারের আমলেই তৈরী করা হইয়াছিল। সেই আমলে দেশের জনসাধারণ ভোটাধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিতে পারে নাই। ব্যাপকভাবে ভোট কারচুপি, ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আগেই ভোট দেওয়া হইয়া যাইবার ফলে জনমনে নির্বাচন সম্বন্ধে অনাস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে অতীতের ভোটার তালিকায় অনেকে ইচ্ছা করিয়াই নাম লিপিবদ্ধ করান নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে, অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্ককে ভোটার তালিকায় স্থান দেওয়া হইয়াছে। তাই ভোটার তালিকাটি বর্তমানে আছে, তাহা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃত অর্থবহ নির্বাচনের স্বার্থে নূতন ভোটার তালিকা প্রয়োজন। তাই নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের অনুরোধ, অবিলম্বে নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করুন।[২৩০]

অপর চিঠিতে আসন্ন নির্বাচনে ব্যয় সংকোচন ও অস্বস্তিকর বিষয় নিষিদ্ধ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানানো হয়। চিঠিটি লিখেন কুমিল্লার কান্দিরপাড় নঈম ব্রাদার্স থেকে মুহম্মদ আজিজুর রহমান। চিঠির শিরোনাম: 'নির্বাচন কমিশন সমীপে'। এতে লেখা হয়:

> সংসদ নির্বাচন আসন্ন। ইতিমধ্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ব্যয়বাহুল্য এড়ানোসহ সার্বিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে ঢালিয়া সাজাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহা এই দেশটির জন্য সময়োচিত পদক্ষেপ বলিতে হইবে। নির্বাচনী প্রচারণায় অন্যান্য কার্যক্রম ছাড়াও দেয়াল লিখন এবং রাস্তার উপরে বড় বড় তোরণ নির্মাণ করা হয়। এইজন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীকে যেমনি ব্যয় করিতে হয়, তেমনি বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ মানুষকে তাদের দেয়ালের সৌন্দর্য ফিরাইয়া আনিতে প্রচুর খরচ করিতে হয়। ইহাছাড়া তোরণ নির্মাণের ফলে রাস্তাঘাটের যে করুণ অবস্থা হয় তাহা সংস্কার করিতেও কর্তৃপক্ষের কম খরচ হয় না। তাই প্রচারণার এই জাতীয় কার্যক্রম, যাহা সকলের জন্য অস্বস্তিকর তাহা নিষিদ্ধ করার বিধান রচনার জন্য নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।[২৩১]

১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে নির্বাচন বিষয়ক দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়। দুটি চিঠিতেই আসন্ন নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবি জানানো হয়। একটি চিঠি লিখেন ঢাকার ৫৮-জে পশ্চিম রাজা বাজার থেকে এম মহিউদ্দিন মাশুক। চিঠির শিরোনাম: 'প্রসঙ্গ: ভোটার লিস্ট'। এতে লেখা হয়:

> বলা হইতেছে, আমরা গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে অগ্রসর হইতেছি। নির্বাচনে নিরপেক্ষতা এই প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করিবে। কিন্তু এই দিকটা কেউ কি লক্ষ্য করিতেছেন যে, ভোটার লিষ্ট প্রণয়নের সময়েই ভোট জালিয়াতি বা কারচুপির একটা পদ্ধতি সুসম্পন্ন করিয়া রাখা হয়? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে, ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় অপ্রাপ্ত বয়স্কসহ (বিশেষভাবে মহিলা) অনেক কাল্পনিক নাম জুড়িয়া দেওয়া হয়। নয়-দশ বৎসরের বালিকাকে শাড়ী পরাইয়া ভোট দেওয়ানো হয়। তালিকা করার সময় বাড়ী বাড়ী যাওয়া হয় না। এক জায়গায় বসিয়া নাম লেখা হয়। ফলে অনেকের নামই বাদ পড়ে। এই দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভোটার লিষ্ট সংশোধনের আবেদন জানাইতেছি।[২৩২]

একই শিরোনামের নিচে প্রকাশিত অপর চিঠিটি লিখেন ঢাকার মিরপুরের শাহ আলীবাগ থেকে জোবাইদা বিলকিস ও জাকিয়া আফরোজ। এতে লেখা হয়:

> ২রা মার্চ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু নাগরিক ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা। কারণ অতীতে ভোটার তালিকা সঠিকভাবে করা হয় নাই। ভোটার তালিকায় কল্পিত ভোটারের নাম স্থান পাইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়িয়াছে। একটু যাচাই করিলেই ইহার সত্যাসত্য ধরা পড়িবে। তালিকা প্রস্তুতের পর উহা পরখ করিয়া দেখার জন্য স্বল্প সময় দেওয়া হইয়াছিল। তাই সংশোধন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অতএব, কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।[২৩৩]

পরদিন ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে নির্বাচন বিষয়ক আরো চারটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দুটি চিঠিতে আসন্ন নির্বাচনে কারচুপি রোধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। একটি চিঠি লিখেন গাজীপুরের কালিয়াকৈরের চণ্ডিশ্বর গ্রাম থেকে ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম। চিঠির শিরোনাম: 'নির্বাচন প্রসঙ্গে'। এতে লেখা হয়:

> আগামী ২রা মার্চ জাতীয় সংসদের নির্বাচন। এই নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠু ও অবাধ হয় তাহার জন্য গোটা জাতি আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছে। বিগত সরকারের আমলে যে সমস্ত কারণে সাধারণ মানুষ ভোটের প্রতি

> আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার অন্যতম হইতেছে অনেক ভোটার ভোট কেন্দ্রে গিয়া দেখিতে পাইয়াছে যে, তাহার ভোট আগেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে। বর্তমান পদ্ধতিতে একজন ভোটারের পরিচয়পত্র না থাকার কারণে একজন আরেকজনের ভোট দিলে দায়িত্বে নিয়োজিত পোলিং অফিসারের পক্ষে তাহা আঁচ করিতে পারা সম্ভব হয় না। কাজেই এই ধরনের কারচুপি কিভাবে রোধ করা যায় সেই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।[২৩৪]

একই শিরোনামের নিচে প্রকাশিত অপর চিঠিটি লিখেন পিরোজপুরের মঠবাড়ীয়া থেকে মো. মোশাররফ হোসেন। এতে লেখা হয়:

> অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আমাদের সকলেরই দাবী। পক্ষান্তরে অতীতের নির্বাচনে বাধা-বিঘ্ন এবং পক্ষপাতিত্বের জন্যও আমরা সকলেই কম বেশী দায়ী। তবুও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই আমাদের কাম্য। একমাত্র আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইহার বাস্তবায়ন সম্ভব। সকলের দুষ্কর্মের ফলেই একটি জাতি অধঃপতনে যায়। আবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। তাই দেশবাসী ও কর্তৃপক্ষের নিকট আমার প্রস্তাব হইতেছে : নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা হউক। ভোট কেন্দ্রে বেতার যন্ত্রসহ উপযুক্ত সংখ্যক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া হউক। নির্বাচনী খরচ নিয়ন্ত্রণ পারস্পরিক অপপ্রচার রোধ তথা সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যৌথ পোষ্টার সরবরাহ এবং একই মঞ্চে সকল প্রার্থীর যৌথ নির্বাচনী সভার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সর্বশেষে ভোট কেন্দ্রে ভোট গণনা করিয়া সকল প্রার্থীর প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ভোট গণনাপত্র প্রস্তুতের বিধান প্রবর্তন করা হউক।[২৩৫]

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালানোর আহ্বান জানিয়ে ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর দুটি চিঠি প্রকাশিত হয় দৈনিক ইত্তেফাকে। একই শিরোনামের নিচে চিঠি দুটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বেআইনী অস্ত্র'। এই দুটি চিঠির একটি লিখেন ময়মনসিংহের গফরগাঁও থেকে এম আই চৌধুরী মুক্তা। চিঠিতে লেখা হয়:

> সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে প্রকাশ্যে শত শত রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করা হইয়াছে। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত বেআইনী অস্ত্রধারীদের অবাধ বিচরণে সর্বস্তরের মানুষ উদ্বিগ্ন। এত অস্ত্র ও গোলাবারুদ আসে কোথা হইতে তাহাও চিন্তার বিষয়। প্রত্যেক থানার পুলিশ কর্মকর্তা স্ব-স্ব এলাকায় বেআইনী অস্ত্রধারী অনেক ব্যক্তির নাম-ধাম ও খোঁজ-খবর হয়ত জানেন। সরকার বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য ক্রমাগত চাপ অব্যাহত রাখিলে অনেক সুফল পাওয়া যাইবে। নির্বাচনের

পূর্বে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষসহ সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।[২৩৬]

অপরটি চিঠি লিখেন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থেকে ইয়ারুল হক কাজল। চিঠিতে লেখা হয়:

দেশের মধ্যে অবৈধ অস্ত্র রহিয়াছে। ফলে নির্বাচন উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় সরকার ইতিমধ্যেই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সাজা দেওয়ার নির্দেশ জারি করিয়াছেন। মনে হয় এর ফলে অস্ত্রধারীদের ধরা পড়া কঠিন হইয়া পড়িবে। তাই অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া ঘোষণা দেওয়া হউক যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্ত্র জমা দিলে তাহাদের সাধারণ ক্ষমা করা হইবে। ইহা করা হইলে অনেকেই দেশের স্বার্থে ও নিজের নিরাপত্তার জন্য বেআইনী অস্ত্র জমা দিতে উদ্যোগী হইবেন বলিয়া মনে হয়। আশা করি সরকার বিষয়টি বিবেচনা করিবেন।[২৩৭]

দৈনিক বাংলায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট তিনটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দুটিই ছিল নির্বাচন বিষয়ক। নির্বাচন প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলায় প্রথম চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর। এই চিঠিতে আগের ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবি জানানো হয়। একটি চিঠি লিখেন ঢাকার মিরপুরের ১১১/৩ শাহ আলীবাগ থেকে শাহার বানু, জোবায়দা বিলকিস, জাকিয়া আফরোজ ও জামিল আহমদ শাহেদী। চিঠির শিরোনাম: 'সঠিক ভোটার তালিকা চাই'। এতে লেখা হয়:

গণতন্ত্রকামী সংগ্রামী জনতার আন্দোলনের চাপে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটল। দীর্ঘদিন পরে মানুষ মুক্ত পরিবেশে হাঁফ ছেড়ে স্বস্তি পেল। জনগণের সার্বভৌমত্ব কায়েম হবে, আবার তারা হৃত ভোটাধিকার ফিরে পাবে–আপন মতামতের প্রতিফলন ঘটবে। আর এই মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগের দিনও দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বহু নাগরিক এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ, স্বৈরশাসনের অধীনে ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়েছে, তা সঠিকভাবে হয়নি। স্বৈরস্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে কল্পিত ভোটদাতার নাম তাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রকৃত ভোটদাতার নাম বাদ পড়েছে। একটু যাচাই করলেই এর সত্যাসত্য ধরা পড়বে বলে আমরা মনে করি। তালিকা প্রস্তুতের পর তা পরখ করে দেখার জন্য ভোটদাতাদের যে সময় দেয়া হয়েছিল, তালিকার জটিলতার জন্য তা সকলের পক্ষে সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। অতএব, কর্তৃপক্ষের কাছে

আমাদের আবেদন, নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকা তালিকা সংশোধনের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সকল ভোটদাতাকে তাদের মহা মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দান করুন।[২৩৮]

নির্বাচন প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলায় অপর চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর। এই চিঠিতে নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নতুন ভোটার তালিকা তৈরির দাবি জানানো হয়। একটি চিঠি লিখেন ঢাকার ১৪৫ হাজারীবাগ রোডস্থ ন্যাশনাল পীস অর্গানাইজেশনের সাংগঠনিক সচিব এম এ সোবহান। চিঠির শিরোনাম: 'নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে'। এতে লেখা হয়:

গণআন্দোলনের স্রোতে ভেসে গিয়েছে স্বৈরাচারী মসনদ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ইতিমধ্যে এই সরকার সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছেন। বিভিন্ন কালাকানুন বাতিল করে এই সরকার সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। তাই সরকার প্রধান সর্বস্তরের জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কয়েকদিন আগে অস্থায়ী সরকার বলেছেন, নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের দরকার নেই। আগের তালিকা দিয়েই চলবে। কিন্তু আমার মনে হয়, ভোটার তালিকায় বর্তমানে যে সংখ্যা আছে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করলে সে সংখ্যা অনেক কমে যাবে। এর কারণ হিসাবে আমরা দুটো কারণ উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমতঃ বাংলাদেশের গ্রামের অনেক লোক পেশাগত কারণে শহরে বিশেষ করে রাজধানী শহরে বসবাস করেন। তারা ভোটার তালিকায় দুই জায়গা থেকে ভোটার হয়ে থাকেন। ফলে ভোটার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে কিছু লোক আছেন, যারা সব নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাই তাদের জয়লাভ নিশ্চিত করার জন্য নিজের বাড়ী এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে কিছু কিছু লোক ভুয়া ভোটার করে থাকেন। এর ফলেও ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

আর এই অতিরিক্ত ভোটারদের শূন্যস্থান পূরণ করতে বিভিন্ন প্রার্থী প্রচুর অর্থের বিনিময়ে পেশী শক্তির ব্যবহার করেন। ফলে মাসলম্যানরা ভোট কেন্দ্র দখল করে সীল মারে কিংবা ব্যালটবাক্স ছিনতাই করে। এর ফলে অনেক ভোটার ভোটদানে নিরুৎসাহিত হন।

যদি নতুন করে অতি সতর্কতার সঙ্গে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা যায় এবং ভোটারদের পরিচয়পত্র দেয়ার ব্যবস্থা হয় তবেই একটি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভোটারদের

পরিচয়পত্র দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশে তা করতে অসুবিধা কোথায়?

তাছাড়া আরেকটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, নির্বাচন কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও পুলিশসহ অনেক সরকারী কর্মচারী তাদের নিজ নিজ ভোট দিতে পারেন না। কারণ একদিকে তাদের দায়িত্ব পালন, অন্যদিকে তারা দূরের কোন এক কেন্দ্রের ভোটার। ভোটাররা যেমন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, তেমনি হয়ত সামান্য ভোটের ব্যবধানে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারেন না। তাই নির্বাচন পদ্ধতির সামান্য সংস্কার করা প্রয়োজন এই সঙ্গে (১) অতি সতর্কতার সঙ্গে নতুন ভোটার তালিকা তৈরী করা, (২) ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান করা ও (৩) ভোট কেন্দ্রে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডাকের মাধ্যমে এক সপ্তাহ আগে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করাও দরকার।

আশা করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার উল্লিখিত সুপারিশগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন এবং সত্যিকার অর্থে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন।[২৩৯]

সংবাদে চিঠি প্রকাশিত হয় ৩২টি। এর মধ্যে তিনটি চিঠির বিষয় ছিল নির্বাচন। তিনটি চিঠিই প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর। একটি চিঠিতে আসন্ন নির্বাচনের পোলিং অফিসার বা সহকারী পোলিং অফিসার হিসেবে শিক্ষকদের নিয়োগ না করার আহ্বান জানানো হয়। চিঠিটি লিখেন গাজীপুর সদর উপজেলার রাজবাড়ী সড়ক থেকে মো. জালাল উদ্দিন। চিঠির শিরোনাম: 'প্রসঙ্গ : নির্বাচনে শিক্ষক নিয়োগ'। এতে লেখা হয়:

> প্রতিবারই নির্বাচনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এপিও এবং পিও নিয়োগ করে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। মনে হয় শিক্ষক ছাড়া এই দায়িত্ব যেন পালনের আর কেউ নেই। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শিক্ষকদের যে কি দুর্ভোগ পোহাতে হয় তা বোধ করি অন্যদের জানা নেই।
>
> শিক্ষকরা অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন অবস্থায় সমাজে বসবাস করেন। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নির্বাচনের আগের রাতে খোঁজ নিয়ে শিক্ষকদের বাড়ী গিয়ে বিভিন্ন হুমকি দিয়ে আসে। একই এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরস্পর রেষারেষির জের হিসেবে নির্বাচনকালে বা তার পরে শিক্ষকদের দিতে হয় চরম খেসারত। ৫০/৮০ টাকার জন্য কোন শিক্ষক স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী নয়।
>
> অপ্রত্যাশিত নিয়োগের মাধ্যমে অবহেলিত ও দরিদ্র শিক্ষকদের নিরাপত্তাহীন এই দায়িত্বে নিয়োগ করে সমাজে শিক্ষকদের কার্যত

> প্রভাবশালী প্রার্থী তথা তাদের গুণ্ডাদের কাছে জিম্মি করা হয়। শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে আবেদন, আগামী নির্বাচনে শিক্ষক নিয়োগ না করে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ দরিদ্র শিক্ষকদের সন্তান-সন্ততিদের অযথা হয়রানির হাত থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রেহাই দেবেন।[২৪০]

আরেকটি চিঠিতে আসন্ন নির্বাচনে ভোটারদের পরিচয়পত্র বা ভোটার কার্ড প্রদান করার আহ্বান জানানো হয়। চিঠিটি লিখেন ময়মনসিংহের বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক থেকে মো. দেলোয়ার হোসেন তালুকদার। চিঠির শিরোনাম: 'নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ'। এতে লেখা হয়:

> বর্তমান সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনের জন্য আগামী ২রা মার্চ '৯১ তারিখ নির্ধারণ করেছেন। ছাত্র-জনতার রক্তঝরা সংগ্রামের মাধ্যমে স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটেছে। ইতিমধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তাদের অংগীকার ব্যক্ত করেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি দেশের শান্তিকামী মানুষও অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষপাতী।
>
> প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতিতে কিছু ত্রুটি থাকায় ভোট কেন্দ্রগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিংস ঘটনার সৃষ্টি হয়। আসন্ন নির্বাচনে যাতে ভোট কেন্দ্রে কোন সহিংস ঘটনার সৃষ্টি না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পূর্বেই গ্রহণ করা উচিত। ভোট কেন্দ্রে কি কি কারণে সহিংস ঘটনার সৃষ্টি হয় এবং ভোট কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হয় প্রথমে তার কারণ বের করতে হবে। নির্বাচনে ভোট কারচুপির অপরাপর বিষয় বাদ দিলেও দেখা যায়, নিজ দলকে জেতানোর লক্ষ্যে একটি ভোটার দ্বারা একাধিক ভোটদানের প্রচেষ্টা, ভোটার নয় এমন ব্যক্তি দ্বারা ভোটদান, মৃত/প্রবাসী ব্যক্তির ভোট নিজ দলের পক্ষে গ্রহণের প্রবণতা, এমনকি বিরোধী দলের সমর্থকের ভোটটি পর্যন্ত অবৈধভাবে গ্রহণ করে ভোটাধিকার হরণ করা হয়। প্রচলিত ভোটদান পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকায় এগুলো করা সম্ভব হয়।
>
> আসন্ন নির্বাচনে উপরোক্ত কারণে যাতে ভোট কারচুপি না হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত ভোট গ্রহণ পদ্ধতিতে পোলিং অফিসার কর্তৃক ভোটার করা সনাক্ত সুবিধাহেতু এগুলো ঘটে থাকে। পোলিং অফিসার একজন ভোটারের নাম, পিতার নাম, গ্রাম, বয়স ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করেই ব্যালট পেপার দিয়ে থাকেন। পোলিং অফিসারের পক্ষে স্বল্প সময়ে স্বল্প প্রশ্নে সঠিক ভোটার সনাক্ত করা অসম্ভব। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত পোলিং এজেন্টগণ কখনও কখনও ভোটার সনাক্তকরণে নীরব ভূমিকা পালন করে। এমনকি কোন দলের সমর্থক অবৈধ ভোট প্রদান করতে গেলে একদলের পোলিং

এজেন্ট তাকে সঠিক বলে সনাক্ত করে এবং অপর দল তাকে অবৈধ বলে গণ্য করার জন্য বক্তব্য পেশ করে। ফলে দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা নিরসনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করছি:

১। নির্বাচন কমিশন দেশের ভোটারদের সনাক্ত করার জন্য বিশেষ কার্ডের ব্যবস্থা করবেন। যাকে বলা হবে 'ভোটার কার্ড' এবং ভোটার সনাক্ত করার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক থাকবেন। নির্বাচিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে বলা হবে 'ভোটার সনাক্তকারী'। কার্ড দেখেই যেন পোলিং অফিসার ভোটার সনাক্ত করতে পারেন। দেশে যতগুলো ভোটার রয়েছেন ততগুলো কার্ড এবং উক্ত কার্ডে ভোটারের নাম, পিতার নাম, বয়স, ভোটার নং, কেন্দ্র নং ইত্যাদি থাকবে। উক্ত কার্ডে ছবিও সংযুক্ত করা যেতে পারে। নির্বাচনের অন্ততঃ পক্ষে পক্ষকাল পূর্বে সমস্ত এলাকায় কার্ড পৌঁছে দিতে হবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক (নিরপেক্ষ) নির্বাচন মেম্বার/ওয়ার্ড কমিশনার/স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক/ মাধ্যমিক স্কুলশিক্ষক দ্বারা কার্ড পূরণ করে সনাক্তকারীর সীল/স্বাক্ষর সংবলিত ভোটার কার্ড ভোটারের নিকট সরবরাহ করা হবে। ভোটারগণ উক্ত কার্ড নিয়ে ভোট কেন্দ্রে যাবেন এবং পোলিং অফিসার কার্ড দেখেই ভোটার সনাক্ত করে ব্যালট পেপার সরবরাহ করবেন। ব্যালট পেপার সরবরাহ করার সময় অবশ্যই কালির দাগ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। 'ভোটার কার্ডে' ছবি সংযুক্ত করা সম্ভব না হলে বিভিন্ন দলের পোলিং এজেন্টগণ ভোটার কার্ডধারীকে সনাক্ত করবেন।

২। নির্বাচিত ভোটার সনাক্তকারী স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কার্ড সরবরাহ করার সময় অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবেন যাতে ভুলের অবতারণা না হয়। নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ ভোটার সরবরাহের সনাক্তকারী কার্ড পাশাপাশি উক্ত এলাকা/গ্রামের ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত ভোটারদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে প্রবাসে মৃত্যুবরণ করেছেন। রয়েছেন/দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন, যাদের পক্ষে ভোটদান অসম্ভব তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে সীল/স্বাক্ষর দিয়ে প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ভোট গ্রহণের পূর্ব দিনে সরবরাহ করবেন। যাতে করে ভোট গ্রহণের পূর্বেই ভোটার তালিকায় মৃত/প্রবাসী এবং ভোটদানে অযোগ্য ভোটারদেরকে চিহ্নিত করা যায়। কেহ মৃত/প্রবাসী ভোটারের ভোট দিতে আসলে হাতেনাতে ধরা পড়ে।

৩। ভোটার সনাক্তকারীদের স্বাক্ষর/সীল (স্পেসিমেন সিগনেচার কার্ড)-এর একটি তালিকা পোলিং অফিসার/প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট থাকবে। যাতে কেউ নকল ভোটার কার্ড তৈরী করে নকল সীল/স্বাক্ষর দিয়ে ভোট কারচুপির সুযোগ না পায়।

৪। ভোটার কার্ডটিতে একটি বিশেষ মনোগ্রাম থাকবে যাতে কেউ সহজে নকল না করতে পারে এবং ভোটার কার্ড ব্যতীত কাউকে ভোট দিতে দেয়া হবে না। এবং নির্বাচিত ভোটার সনাক্তকারীগণ যদি ভোটার কার্ড সরবরাহে কারচুপির আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে তা ধরা পড়ে তবে তাকে (ভোটার সনাক্তকারীকে) অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।[২৪১]

অপর চিঠিতে আসন্ন নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। চিঠিটি লিখেন লালমনিরহাটের সাপটানা থেকে এডভোকেট খন্দকার বজলুল হক। চিঠির শিরোনাম: 'মন্ত্রী পরিষদ সচিব মহোদয়ের কাছে একটি প্রশ্ন'। এতে লেখা হয়:

উত্তাল জনবিক্ষোভের ঢেউয়ে ভেঙে গেল স্বৈরাচারের দুর্গ। জনতা উল্লসিত। কিন্তু বিগত দিনের কালো অধ্যায়ের স্মৃতি আজও জনগণকে পীড়া দিচ্ছে। জনতার জন্ম হয়েছে, কিন্তু এটা কি চূড়ান্ত। স্বৈরাচার গেছে কিন্তু কাঠামো তো পাল্টায়নি, যাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তায় স্বৈরাচার বাস্তবে রূপ নিত, তারা আজ কোথায়, আছে তো সবাই বহাল তবিয়তেই। জনতার লক্ষ্য স্বৈরাচারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে তিরোহিত করা। তাই সত্য অনুসন্ধান ও বিবেক বোধকে নাড়া দেবার জন্য এই প্রশ্নের অবতারণা।

সাহেব বিবি গোলামের যুগে সারাদেশ হয়েছিল এরশাদময়। এ ঢেউ লেগেছিল লালমনিরহাটেও। হঠাৎ করেই শুরু হল বাংলাদেশ রেলওয়ের জায়গাজমি ইমারত জবরদখল। এমনি একটি জবরদখল করা ইমারতে প্রতিষ্ঠিত হল 'মাজেদা খাতুন মহিলা মহাবিদ্যালয়'। কাগজে-কলমে ছাত্রীর সংখ্যা দু'শ', এরা কেউই ক্লাসে আসে না। এরা শহরের উঠতি সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী। লেখাপড়ার ইচ্ছা-আগ্রহ এদের নেই। তবু নাম লেখাতে হয়েছে, কারণ কলেজটা এরশাদ সাহেবের মায়ের নামে। ডিসি সাহেব বলেছেন গৃহিণীদের নাম ছাত্রী হিসেবে লেখাতে। তাই ডিসি সাহেবের করুণাধন্য ঠিকাদার, ব্যবসায়ীরা তাদের গৃহিণীদের নাম লিখিয়েছে কলেজের ছাত্রী হিসেবে। ডিসি হাবিবুর রহমান সাহেবের কথা না শুনলে অবাধ্য ব্যক্তি কোথাও দরপত্র দিতে পারবে না, হাট ডাকতে পারবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে বাধা আসবে, আইনের ফ্যাকড়া বের হবে।

এই কলেজের তহবিল, শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি কাজে অনিয়মের কথা তুলেছিল কিছু লোক। এসব দৃষ্ট লোকেরা ঠান্ডা হয়ে গেছে, ওরা জানল না ডিসি সাহেব কি ক্ষমতা রাখেন।

রেলের জায়গা জবরদখল করে এরশাদ স্টেডিয়াম, খরচ ৪ লাখ টাকা, এই টাকা তোলা হলো ২৫.০৪.৯০ তারিখে। ৫ ইঞ্চি গাঁথুনির

১০০ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট উঁচু দেয়াল দিতে এই খরচ। এটাও করা হল আদালতের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারের নির্দেশ অমান্য করে।

একইভাবে গড়ে উঠল রওশন এরশাদ মহিলা মাদ্রাসা। অনিয়ম, অপব্যয়, দুর্নীতির প্রশ্ন তুলেছিল স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনকারী শক্তি, সেসাথে রেল কর্তৃপক্ষ।

ডিসি হাবিবুর রহমান সাহেব সবাইকে ডাকলেন। বলে দিলেন উন্নয়নের কাজে এভাবে বাধা দিলে তিনি ডিটেনশন দেবেন।

গোবেচারা রেল কর্তৃপক্ষ আশ্রয় নিলেন আদালতের সালিশ বসল সার্কিট হাউসে। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, ভূ-সম্পত্তি অফিসার এরা জানালেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া রেলের জমিজমা, ইমারত তারা হস্তান্তর করতে পারেন না। ডিসি সাহেব আবারো একই হুমকি দিলেন। ডেকে পাঠালেন রেলের আইন উপদেষ্টাকে, তাকেও সতর্ক করে দেয়া হল বাড়াবাড়ি না করতে, করলে রুটি (?) খেতে হবে। এখানেই শেষ নয়, রেলের মামলা গ্রহণ করার অপরাধে (?) দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারকে শাস্তিমূলক বদলি করা হল। ডিসি সাহেব এ ব্যাপারে জেলা জজ সাহেবকেও প্রভাবিত করেন, চাপ দেন, নইলে ক্ষমতাসীনদের কুদৃষ্টিতে পড়তে হবে বলে স্মরণ করিয়ে দেন জেলা জজকে।

উপজেলা নির্বাচনে বিশেষ দলের তহবিল সংগ্রহের জন্য চালু করা হল হাউজি। শবেবরাতের চাঁদ তখন আকাশে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ মিছিল করে গেলেন ডিসি সাহেবের কাছে, কাজ হল না- পবিত্র শাবান মাসে হাউজি চলল।

বিশেষ একটি দলের কাজে সহায়তা করতে অস্বীকার করায় একজন ওয়ার্ড কমিশনারকে মামলায় জড়ানো হল। পতিতালয়ের মস্তান বলে খ্যাত ওয়ার্ড কমিশনার আত্মসমর্পণ করলে সে রেহাই পেল। মুক্তি পেল জামিনে।

উপজেলা নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি সমর্থিত প্রার্থী যে যে এলাকায় বেশী ভোট পাবেন সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হল। ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু অফিসার ও ভোটারদের পরিচিতি নিয়ে আপত্তিকর প্রশ্ন ও আচরণ করলেন। এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক কার্যক্রম সফল হল, ভোটাররা মানসম্মানের ভয়ে ভোটকেন্দ্র থেকে ভোট না দিয়ে ফিরে গেল। পতিতালয় থেকে পতিতারা দল বেঁধে ভোটকেন্দ্রে বিচরণ করতে লাগল। সাধারণ ঘরের মেয়েরা ফিরে গেল বাড়িতে, ভোট না দিয়ে।

এরূপ আরো অনেক ঘটনা, যা ঘটেছে ১৯৯০ সালের বিভিন্ন সময়ে। প্রতিটি ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ডিসি সাহেব।

> এখন আমার প্রশ্ন এরূপ বাস্তবতা, দুর্নীতি, ক্ষমতার এরূপ দেখানোর জন্য মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ লালমনিরহাটের ডিসি হাবিবুর রহমানকে কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা? এই ব্যক্তি ও তার সহযোগীগণ আবারো দায়িত্বে থাকলে নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে হবে কিনা? একটা কথা বলা হয়নি– ডিসি সাহেবের উক্ত কাজের সহযোগী হতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় এডিএম মাকসুদুল হক ও সদর ইউএনও বিজয় ভট্টাচার্য তার বিরাগভাজন হন এবং তাদেরকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয় বান্দরবানে। মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ সচিব মহোদয়, এরপর আর কাকে বিশ্বাস করব আমরা? কাকে ভাবব নিরপেক্ষ ও ন্যায়ানুরূপ কর্মকর্তা?[২৪২]

বাংলাদেশ অবজারভারে ১৬টি চিঠি প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনটি চিঠির বিষয় ছিল নির্বাচন। একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর। এই চিঠিতে আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। চিঠিটি লিখেন ঢাকা থেকে ও এইচ কবির। চিঠির শিরোনাম: 'Interim Government And Ensuing Election'। এতে লেখা হয়:

> The historic mass uprising and the fall of autocratic regime has once again proved how deeply the people of our country detest corruption, seek economic emancipation and aspire for the establishment of true democracy and public accountability in Bangladesh. The sacrifices and the sufferings of our people know no bounds. The socio-economic and political problems of our people can no longer be left uncared for indefinitely.
>
> Under special circumstances, the unanimous decision of the Seven Party, Eight-Party and Five-Party Alliances and in pursuance of the wishes of the people, Justice Mr. Shahabuddin Ahmed has assumed the office of the Acting President of the interim, neutral and care-taker government of the People's Republic of Bangladesh on 6.12.1990. The responsibilities entrusted to him enormus. The three major tasks which our Acting President is committed to accomplish within next three months are i) to govern the country efficiently ii) to hold free and fair parliamentary election and iii), to handover power to the elected representatives of the people.
>
> We all need to be dutiful, faithful and careful from the very beginning so that for one reason or other we do not fail to reach to our destination in time. We all must

maintain discipline, move on a straight path and follow a systematic process to avoid any future complications and lapses. We all must assist and cooperate with our Acting President to carry out his sacred duties.

We would request the leaders of three alliances to kindly clarify their stand as to whether the parliamentary and Presidential elections would be held simultaneously? If not, to whom our Acting President would handover power after three months from now? We feel that if the Seven-Party, Eight-Party and Five-Party Alliances want to continue with the Presidential form of government, the parliamentary and the Presidential elections need to be held simultaneously. But if they want to switch over to parliamentary form of government this may be decided now to ensure smooth transfer of power to the elected representatives of the people in the first week of March, 1991. All is well that ends well. Let us all march forward hand in hand for the restoration of true democracy ensuring welfare of the people and bringing peace, justice and prosperity to the country for which we fought the war of independence and won it in 1971.[২৪৩]

অন্য দুটি চিঠিতে আসন্ন নির্বাচনের সময় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠি দুটির একটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর। চিঠিটি লিখেন ঢাকার ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স থেকে নূরুল ইসলাম। চিঠির শিরোনাম: 'Need Of The Hour'। এতে লেখা হয়:

On the threshold of the new momentum in the recent mass surge in establishing democracy imperative need of the hour maintain peace and harmony through-out the country for holding the cherished goal of free and fair election. God forbid, if we fail to perform this sacred responsibility, we shall have to face great difficulties in the future.

The general, mass, almost all political alliances and parties and above all, the dauntless student community have already aired their voice for maintaining peace at any cost successfully and effectively completing the hazardous path of placing the country on the right track through holding election in a peaceful manner so that the supreme sacrifices and sufferings made in the face of one

mains rule does not go in vain and the country may vibrate with energy and enthusiasm leading to the continued progress and happiness of teeming millions.[২৪৪]

অপর চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর। চিঠিটি লিখেন ঢাকা থেকে প্রফেসর আবদুল্লাহ এ হারুন। চিঠির শিরোনাম: 'Let Us Vow'। এতে লেখা হয়:

People have started to breathe free air after long nine years thanks to the heroic struggle of the opposition political parties, the general mass, the united students, the lawyers, the doctors, the journalists, the teachers, the artists, the intelligentsia and many other professional groups and organisations. By the blessing of Almighty Allah we have seen the humiliating downfall of an autocrat.

Let there be no dictator in Bangladesh. Let there be no killings of precious souls by bullets or bombs. Let there be no mastans to drive away the genuine voters from the polling booth. Let the interim government show to the world that a free and fair election is very much possible in an undeveloped country. Let there be no old wines in new bottles. Let there be no want of courage to speak the truth. Let not news media be ever used ugain as a propaganda machine of an authoritarian ruler. Let nobody get the courage to disrupt a peaceful procession or meeting. Let also no political parties get the courage to disrupt public life by holding meetings on thoroughfares. Let no bus or truck driver ever get the courage to create road blockade on trifling grounds. Let no driver be allowed to exceed speed limit and kill the innocent people on board and on the road. Let there be a greater degree of autonomy in every organisation. Let there be no more the disgraceful no objection certificates for the government officials to travel abroad during his/her annual/carned leave. Let there be no insulting red tapism. Let the universities, colleges and schools be never ever be closed and opened by decrees.

Above all let there be public accountability of the public servants for all their deeds.[২৪৫]

জেনারেল এরশাদের শাসনামলে সামরিক আইনে অনেকে দণ্ডপ্রাপ্ত হন। তারা উচ্চ আদালতে আপীল করার সুযোগ পাননি। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এই দণ্ডপ্রাপ্তদের উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে চিঠি লিখেন পাঠকরা। একই ব্যক্তি এই বিষয়ে একাধিক সংবাদপত্রে চিঠি লেখার নজির রয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে এ ধরনের দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়। প্রথম চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর। চিঠিটি লিখেন ঢাকার ধানমণ্ডি সাত মসজিদ রোড থেকে মমতাজ বেগম। চিঠির শিরোনাম: 'সামরিক আইনে দণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য'। এতে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে সামরিক আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা নির্দোষ এবং শুধু ঘটনার শিকার। উচ্চ আদালতে আপীলের সুযোগের অভাবে তাঁহারা দীর্ঘদিন কারাগারে রহিয়াছেন। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয়ভাগে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। তাই সামরিক আইনে দণ্ডপ্রাপ্তদের উচ্চতর আদালতে আপীল করার সুযোগ দানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি।[২৪৬]

অপর চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর। চিঠিটি লিখেন ঢাকার গেণ্ডারিয়া থেকে এস এ হোসেন। চিঠির শিরোনাম: 'একটি আবেদন'। এতে লেখা হয়:

> সামরিক আইনের ৯নং আদেশ ও প্রেসিডেন্টের আদেশে ৯নং ধারাবলে দেশের বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত বহু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরীচ্যুত করা হইয়াছিল। জাতীয় সংসদে ৭ম সংশোধনীর মাধ্যমে উহা অনুমোদনও করা হইয়াছিল। ফলে চাকুরীচ্যুত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আদালতে রিট আবেদনের মাধ্যমেও আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ঐ সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হইবার পর হইতে কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণও পান নাই। বিষয়টি বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।[২৪৭]

সামরিক আইনে দণ্ডপ্রাপ্তদের উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে দৈনিক বাংলায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর। চিঠিটি লিখেন ঢাকার ধানমণ্ডি ১৫ নম্বর সড়কের ১৭৭-এ (পুরোনো) নম্বর বাড়ি থেকে মমতাজ বেগম। চিঠির শিরোনাম: 'আপীলের সুযোগ দেয়া হোক'। এতে লেখা হয়:

> স্বৈরসরকারের আমলে সামরিক আইন আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে শত শত বন্দী (যার মধ্যে অধিকাংশ নির্দোষ এবং ঘটনার শিকার) উচ্চ আদালতে আপীলের সুযোগের অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ দুর্বিষহ জীবন যাপন করছি। ১৯৮৬ সালে সামরিক আইন বিলুপ্তির পর বিভিন্ন সময় এ ব্যাপারে সরকারের নিকট আমরা দণ্ডপ্রাপ্তদের পরিবারবর্গ বহু আবেদন নিবেদন পেশ করেছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি।
>
> উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বলা হয়েছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। আমরা আশা করি এই প্রেক্ষিতে বর্তমান অস্থায়ী সরকার মানবিক কারণে বন্দীদের দণ্ডাদেশ মওকুফ করে উচ্চ আদালতে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তাদের আপীলের সুযোগ দান করবেন।[২৪৮]

১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর সংবাদে সামরিক আইনে দণ্ডপ্রাপ্তদের উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটি লিখেন ঢাকার ধানমণ্ডি ১৫ নম্বর সড়কের ১৭৭-এ (পুরোনো) নম্বর বাড়ি থেকে মমতাজ বেগম। চিঠির শিরোনাম: 'উচ্চ আদালতে আপীলের আবেদন'। এতে লেখা হয়:

> আমরা সামরিক আইন আদালতে দণ্ডপ্রাপ্তদের ভুক্তভোগী পরিবারবর্গ আবেদন জানাচ্ছি যে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে সামরিক আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত শত শত বন্দী (যার মধ্যে অধিকাংশ নির্দোষ এবং ঘটনার শিকার) উচ্চ আদালতে আপীলের সুযোগের অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে দুর্বিষহ মানবেতর জীবনযাপন করছে। ১৯৮৬ সালে সামরিক আইন বিলুপ্তির পর বিভিন্ন সময় আবেদন-নিবেদন পেশ করেছি।
>
> বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে (পার্ট-III) উল্লেখ রয়েছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। উপরি উক্ত বিষয়ের আলোকে সামরিক আদালতে দণ্ডপ্রাপ্তদের সর্বহারা পরিবারবর্গ এ সংকটময় সময়ে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আর্থিক অনটনে মানবেতর জীবনযাপন করছে। মানবিক কারণে বন্দীদের আপীলের সুযোগদানের ব্যবস্থা করে আমাদের নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার আবেদন জানাই।[২৪৯]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী মুক্ত পরিবেশে শক্তিশালী অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর। চিঠিটি

লিখেন ঢাকার ৩৮ ইকবাল রোড থেকে শাব্বির হোসেন। চিঠির শিরোনাম: 'আইনের প্রয়োগ চাই'। এতে লেখা হয়:

> স্বাধীনতা লাভের পর বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ পুনরায় রাজনৈতিকভাবে আরেকটি যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছে। গণতন্ত্র ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার আরেকটি সুযোগ এখন আমাদের সামনে উপস্থিত। যদি আমরা এই সময়ে সঠিক আচরণে অপারগ হই, তবে ইতিহাস এবং অনাগত প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করিবে না। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে আমাদের দেশে সর্বাধিক উপেক্ষিত হইয়াছে আইনের শাসন। কখনো আমাদের ভ্রান্তিপ্রসূত সিদ্ধান্তে, কখনো নির্লিপ্ত মনোভাবে আর অজ্ঞতায় এবং অনিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক চাপের মুখে আইন তার লক্ষ্য হইতে বারংবার বিচ্যুত হইয়াছে। ইহার ফলেই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি প্রশাসনিক দুর্নীতি অপশক্তির আস্ফালন, আর ব্যক্তি শাসনের বিভীষিকা। গণতন্ত্র বাস্তবায়নের সর্বপ্রথম প্রয়োজন দেশে আইনের শাসনের সক্রিয়তা প্রমাণ করা। বর্তমানে একটি নিরপেক্ষ সরকার দেশের পরিচালনায় আছেন। যার লক্ষ্য দেশে জনগণের শাসন প্রবর্তন। তাই শক্তিমান অপরাধীদের বিপক্ষে নিরীহ জনগণ যেন কোনরূপ ভয়ভীতি বা চাপের সম্মুখীন না হইয়া আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বর্তমান সরকার সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আশা রাখি।[২৫০]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর সরকার পদ্ধতি বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করে গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে একাধিক চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য তিন রাজনৈতিক জোটের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠিটি লিখেছিলেন চট্টগ্রাম জজকোর্ট থেকে এডভোকেট শংকর প্রসাদ দে। শিরোনাম ছিল: 'গণঅভ্যুত্থান ৯০ এবং জাতীয় কর্তব্য'। চিঠিতে লেখা হয়:

> সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে স্বৈরশাসকের পতন হলেও স্বৈরতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও এর বিকাশের আর্থ-সামাজিক ধারায় পতন হয়নি। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, আশা-আকাংখার জাতীয় চরিত্রের ফলে। বাহাত্তর সালের ক্ষমতাসীন সেই ঐকমত্যকে দলীয় স্বার্থে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ক্ষুণ্ন করে। দলীয় স্বার্থের আড়ালে ঠিকই পুঁজির বিকাশ ঘটতে থাকে। এক পর্যায়ে সেই ক্রমবর্ধিষ্ণু পুঁজির সাথে মৈত্রী গড়ে উঠে মুনাফাসর্বস্ব আন্তর্জাতিক পুঁজির চরিত্রের দিক থেকে পুঁজির এই বিকাশ ছিল লুটপাটসর্বস্ব। '৭৫ সালে প্রগতিশীল ধারার মর্মান্তিক পরাজয় দীর্ঘ পনের বছরের জন্য জাতিকেও নিক্ষেপ

> করে স্বৈরতন্ত্রের পদতলে। স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ গত দশকে গড়ে ওঠা ২০০০ লুটেরা ধনিকের প্রতিভূ ছিলেন মাত্র। একক কোন দলের পক্ষে যেমন একনায়ক এরশাদের পতন ঘটানো সম্ভব হয়নি তেমনি একক কোন দলের পক্ষে ইতিমধ্যে বিকশিত স্বৈরতান্ত্রিক ধারায় উচ্ছেদ কঠিন ব্যাপার। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপামর জনতার ঐক্য ও ঐকমত্য যেমন বিজয় এনেছে তেমনি জনতার ঐক্যের প্রতিভূ তিন জোটের ঐক্যই পারে পুনরুত্থিত মূল্যবোধকে ধরে রাখতে ও স্বৈরশাসনের আর্থ-সামাজিক ভিত্তিকে উৎখাত করতে।
>
> তিন জোটের ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন আজ যুগোপযোগী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হতে পারে। বেগম খালেদা জিয়ার সংসদীয় পদ্ধতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক নমনীয় মনোভাব জাতিকে অধিকতর আশান্বিত করে তুলেছে। বিপদ আমাদের শেষ হয়নি। বিজয় সুরক্ষিত হয়নি। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় আছে বৈকি।
>
> আবার দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার আহ্বান জানাই। তিন জোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে গড়ে তুলুক জাতীয় সরকার। তাহলে সমূলে উৎখাত হবে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিটি শিকড়। সফল হোক শত শহীদের আত্মত্যাগ।[২৫১]

বাংলাদেশ অবজারভারেও সরকার পদ্ধতি বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করে পাঠকরা। এ বিষয়ে দুটি চিঠি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ অবজারভারে। ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত একটি চিঠিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার উত্তর ধানমণ্ডি থেকে কাজী ওয়াসিম আহমেদ। শিরোনাম ছিল: 'Parliamentary form of Government'। চিঠিতে লেখা হয়:

> The recent people's movement has clearly demonstrated that the people of Bangladesh seek to establish a democratic form of government with in the country. I doing so, Bangladesh has also established her identity as a conscientious and self righteous nation, dispelling all derogatory stigmas attached to her. Let us all endeavour to preserve this dedication to our beloved country sincerely and honestly.
>
> Bangladesh must never be allowed the indignity to suffer from a personality cult in future. We should all be aware of the pitfalls and dangers of being subservient to open individual's whims and dictates.

In order to start in that direction, I would like to earnestly request the leaders of this country to amend the constitution and restore a parliamentary form of government, in other words a broad based people's government, in the first sitting after the parliamentary elections. Let us not be averse to the fact that under the Presidential system, the anti people's forces may stage a comeback.

Let us not deceive the people of this country any more. Let us all work sincerely, honestly and with total dedication to the people of Bangladesh. Let no one be deprived of their inalienable rights. Let us root out corruption and evil from our society once for all, and be absolutely un-wavering in our resolve. Let no one subvert the democratization process of this country.[২৫২]

বাংলাদেশ অবজারভারে ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত অপর চিঠিতে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা না রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে সে বিতর্কের অবসান করার আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার উত্তর সার্কুলার সড়ক থেকে ডা. মুহাম্মদ আহসান। শিরোনাম ছিল: 'Points For Debate'। চিঠিতে লেখা হয়:

We strongly feel that the opportunity for achieving true liberation for the people of Bangladesh is on the anvil now when the country is headed by a neutral government. We also strongly feel that true democracy can be achieved if the people can live in a system where all the three components of the state management the legislature, the executive and the judiciary are totally free but inter-connected by a very fine balance of power. In Bangladesh, this has always been the missing point. In the past. We had experienced parliamentary system when the MPs competed for ministerships and the Presidents were totally ineffective in controlling the corruption and plunders by MPs/ Ministers. We had also experienced the presidential system when the parliament turned into a slave-house where the MPs competed, again, for ministerships and appeasement/ glorification of the Chief Executive.

It is, therefore, extremely important that the people should be freed from the debate between the parliamentary

system and the presidential system and to concentrate very deeply on the question of achieving truly an independent legislature, executive and judiciary.

One possible course of action is to forbid the MPs from becoming ministers so that they are free to compete for their primary responsibilities i.e. legislation and maintaining the necessary balance of power as representatives of the people.[২৫৩]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তাদের অভিনন্দন এবং তাদের কাছে বিভিন্ন আহ্বান জানিয়ে গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে চিঠি লিখেন পাঠকরা। ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তিকে প্রতিহত করার আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার মোহাম্মদপুর ২/১ হুমায়ূন রোড থেকে রোকন উদ্দিন জাহেদ। শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্র মানে ঘাতকদের সাথে হাত মেলানো নয়'। চিঠিতে লেখা হয়:

দুর্বার গণআন্দোলন ও অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পতন ঘটেছে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের। এটাই ইতিহাসের নির্ধারিত পথ। কিন্তু এই গণঅভ্যুত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি '৭১-এর স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ধারাবাহিকতা মাত্র। এই অভ্যুত্থানের চালিকাশক্তি হলো '৭১- এর সংগ্রামী বীর জনতা এবং তাদের উত্তরসূরী ছাত্র ও মেহনতি জনগণ। জনতার এই বিজয়ে কোন স্থান নেই '৭১-এর কুখ্যাত ঘাতক-দালাল ও কিন্তু তাদের দোসরদের। দুঃখজনকভাবে দেখা যাচ্ছে জনতার বিজয় উল্লাস ও গণতন্ত্রের মুক্তির সূচনালগ্নে এরা এখনো সক্রিয় এবং সুযোগ বুঝে বিজয়ী জনতার কাতারে ও প্রচার মাধ্যমে সূঁচের মতো ঢুকে পড়ার চেষ্টায় রত। কিন্তু এই উল্লাস ও ভাবাবেগের মধ্যে আমাদেরকে ইতিহাস বিস্মৃত হলে চলবে না। গণতন্ত্র মানে চিহ্নিত ঘাতককে সুযোগ দেয়া কিংবা ঘাতকের সাথে হাত মেলানো নয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগে যে স্বাধীনতা সূচিত হয়েছিল তারই পথ এসেছে এ বিজয়। এখানে হানাদারের দোসর ১৩ ঘাতকদের স্থান দিলে শহীদদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে এবং পুনরাবর্তন ঘটবে স্বৈরাচারের। তাই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছাত্র-জনতার কাছে আহ্বান, সবাই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে একইভাবে প্রতিহত করা হবে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অপশক্তিকে।[২৫৪]

১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর সংবাদে প্রকাশিত আরেক চিঠিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যকে সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সব সময় একতাবদ্ধ থাকার

আহ্বান জানানো হয়। এই চিঠিটি লিখেছিলেন কুমিল্লার মোগলটুলীর ছৈয়দ ভিলা থেকে জোলেখা রওশন আরা খান। শিরোনাম ছিল: 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নিকট একজন মায়ের দাবী'। চিঠিতে লেখা হয়:

> সন্তানদের কাছে আমার দাবী, প্রার্থনা, আকুল আবেদন। আমি '৫২-র ভাষা আন্দোলন দেখেছি, '৬৯ -এর গণ জাগরণ দেখেছি, '৭১-র স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেছি। আবার '৯০তে দেখলাম, স্বৈরাচারের অবসান। তোমরা দেশের সূর্যসন্তান। প্রত্যেকবারের বিজয় তোমরাই ছিনিয়ে এনেছ, রক্ত ঝরায়ে ঝরায়ে তোমরাই লাল গোলাপ ফুটিয়েছ। এই বাংলা তোমাদের কাছেই বেশী ঋণী। আমার দাবী আমার সন্তানদের কাছে- দলমত নির্বিশেষে সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাক। যেখানে দেখবে অনিয়ম, অবিচার, দুর্নীতি সেখানেই তোমরা সিংহশাবকের মত গর্জে উঠবে। তবেই হয়তো এদেশটা বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। তোমাদের কাছ থেকেই শিক্ষা নেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তোমরাই পার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে- দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে এবং দেশটাকে উন্নতির সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে।
>
> স্বৈরাচার পতনে যারা শহীদ হয়েছে আল্লাহর কাছে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। দোয়া করি তোমরা যুগে যুগে বিজয়ী হও। সারা বিশ্ব তোমাদের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হোক।[২৫৫]

বাংলাদেশ অবজারভারেও ছাত্রসমাজকে অভিনন্দন জানিয়ে চারটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে প্রথম চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর। এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকাস্থ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মো. আতিকুজ্জামান। শিরোনাম ছিল: 'Transition To Democracy'। চিঠিতে লেখা হয়:

> Now that the struggle to gain a democratic government has nearly come to an end. We can speak as well as write freely. At first I must mention with pride that the credit chiefly goes to the students all over the country. We could not even dream of such a popular revolt unless the students had spoken for it, fought for it. Still we had more to sacrifice for the sake of a greater achievement. We lost Basunia, them we lost talents like Arif, Dr. Milon and may others. Their sacrifices were examples that strengthened us to go on and will do so forever. We are bound to remember them with respect.
>
> We now hope that whoever takes over he or she will be a fairly elected President and also that, the President

> will stand for the eleven crore people of this country and only for the people. May he or she be the long-awainted one! I myself being a student pledge that the next government would try its best so that the students may no more be the frustrated ones no more be the burden of society. We deserve proper education in due time. Employment and a prosperous future. So that we can serve the country more than we did ever before. Here I conclude with one sentence 'let there be more light'.[২৫৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে এই বিষয়ে দ্বিতীয় চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর। এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার বড় মগবাজার থেকে ডা. নিয়ামতউল্লাহ। শিরোনাম ছিল: 'Victory For Democracy'। চিঠিতে লেখা হয়:

> I would like to offer my heartfelt congratulations to the student community in particular and the common- man in general for the supreme sacrifices they have made to topple a corrupt and authoritarian rule in the country. I hope that they would now carry forward the fruits of their sacrifices to the ultimate goal of establishing a real democracy in Bangladesh, where there would be respect for human rights, freedom of expression, independence of judiciary and the rule of law.
>
> The journalists have set the example of their unparalled heroic determination not to bring out newspapers come what may unless the emergency imposed was lifted. Their actions will remain enshrined in history in letters of gold. Following them other professionals viz. the university teachers, doctors, other intellectuals echoed sentiments their in the same wavelength, by resigning enblock and taking all risks of service even of their own lives. Then, the politicians for the first time remained firm in their commitments to remove one man's show from the country for a real transition to democracy. Hats off to their unity and hopefully they will lead it successfully to the committed goal by sacrificing group, sectarian and individual interests in future.
>
> Above all the role of the patriotic armed forces has been unique in the scenario, the Nation salutes them today once again.[২৫৭]

ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ অবজারভারে তৃতীয় চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে আমিরুল ইসলাম। শিরোনাম ছিল: ' Need for Austerity'। চিঠিতে লেখা হয়:

> In view of the changed situation in the country, I humbly suggest the following actions:
>
> No gate should be erected, guard of honour should be presented and no student should be used for lining up for the reception of any dignitary in our country.
>
> The students of our country have set an example of unity in ending the authoritarian rule in the country. I appeal to the student community to maintain the same standard of unity fair ensure a country.[২৫৮]

বাংলাদেশ অবজারভারে ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়ে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর। এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার উত্তরা থেকে মো. ফজলুল হক। শিরোনাম ছিল: 'Democracy To be Sustained'। চিঠিতে লেখা হয়:

> All Party Student Unity, political parties, workers' organizations and government employees deserve congratulations on their effective struggle against an autocratic government. The victory celebration for the last few days, its spontaneity and magnitude speak of people's hatred for and abhorrence of the previous government of General Ershad.
>
> Now we have to concentrate on the enduring victory to be meaningful for the whole nation. Victory Celebrations for three days are over. Let the students go back to their studies and maintain peace at all cost. Let the workers ensure quality and optimum production at all levels for ensuring faster economic growth. And let the political leaders and political workers behave and act in a manner so that democracy gets a chance to flourish in Bangladesh. We congratulate all in anticipation of a sustained democracy in the least developed country of the world.[২৫৯]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর সংবাদপত্রে একটি সাক্ষাৎকারের জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়ে একজন পাঠক সংবাদে চিঠি লিখেন। ১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর সংবাদে প্রকাশিত এই চিঠিতে

সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে ধন্যবাদ জানানো হয়। এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার ১৬ ইস্কাটন গার্ডেন কবির হাউস থেকে সৈয়দ আলী কবির। শিরোনাম ছিল: 'অভিনন্দন জানাই'। চিঠিতে লেখা হয়:

> গত ৬ই ডিসেম্বর '৯০ সংবাদে প্রকাশিত ইন্টারভিউয়ের জন্যে নতুন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার রিপোর্টারও তাকে অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছিলেন যার যথাযথ জবাব রাষ্ট্রপতি দিয়েছেন। আশা করি জনমত নির্বিশেষে সবাই এই ইন্টারভিউ মনোযোগ সহকারে পড়েছেন। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের প্রতিবেদন মন দিয়ে পড়া ও অনুধাবন করা উচিত।[২৬০]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর তিন রাজনৈতিক জোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পাঁচটি করণীয় তুলে ধরেন একজন পাঠক তার চিঠিতে। ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার মোহাম্মদপুর মায়া কানন এফ-১১/১ জয়েন্ট কোয়ার্টার্স থেকে ডা. সাকিল আহম্মদ। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'তিন জোট ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের প্রতি'। চিঠিতে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের মানুষ আশাবাদী হতে বড় ভয় পায়। আশাহত হওয়ার কষ্টটা যে কী মর্মন্তদ তা তারা জানে, বড় বেশী করে জানে। আর জানে বলেই নিরাশার ছবিই বার বার দেখে তারা সবকিছুর ভেতর। এমনকি এই ভীষণ সুন্দর গণঅভ্যুত্থানের ভেতরও। রিক্সাচালক থেকে দেশের উচ্চতম শিক্ষিত ব্যক্তিটি পর্যন্ত এতো বিশাল উদার আনন্দের মাঝেও সুন্দর সোনালী আগামীকে কল্পনায় আনতে ইতস্তত করছে-কোথায় যেন একটা বাঁধা, কোথায় যেন একটা ভয় তাদের এই কল্পনাকে লাগাম টেনে আটকে দিচ্ছে। যদি এই সকল দানবেরা আবারও ফিরে আসে আমাদের দেশের 'কুৎসিৎ রাজনৈতিক বিবর্তনের' ধারায়, তখন-? এতো আত্মত্যাগ, রাজপথের অমূল্য প্রাণ, মানুষের দাঁতচাপা দুর্ভোগ সব তাহলে যে আবারও অর্থহীন হয়ে যাবে। শহীদ ডাঃ মিলনের বুলেটবিদ্ধ ফুসফুসের রক্ত থেকে, সিরাজুল মুনিরের আহত পা থেকে, নাজমুল হক প্রধানের ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথা থেকে হলুদ পুঁজ গন্ধ ছড়াবে এরচে' বড় কষ্ট আর কি হতে পারে!! আমরা আর শহীদের রক্তের অবমাননা দেখতে চাই না, যুদ্ধাহত ভাইয়ের আর্তনাদ শুনতে চাই না, দানবদের প্রত্যাবর্তন দেখতে চাই না। চাই না-চাই না-চাই না।
>
> এতোদিনের মিছিল-নির্লিপ্ত ব্যক্তিটি জনতার অভ্যুত্থান দেখতে গিয়ে ফিরে আসতে পারেনি সাথে সাথে, ভালোবাসার এই বিশাল সমাবেশে যে গেছে বুকের ভেতর উদার সুন্দরকে সাথে করে না এনে পারেনি সে, অন্যের বুক নিজের সাথে স্পর্শ করে আনন্দের বন্যা চোখের ভেতর বুকের ভেতর না এনে ফিরেনি সে। এতো যে আনন্দ তার ভেতর যাতে

মানুষ আশা দেখতে পায় সেজন্য আন্দোলনকামী মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সকল শক্তিগুলোকে নিবেদন করছি-

১. সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ, বিকাশ আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত- সে হোক না কেন তৃতীয় বিশ্ব অথবা উন্নত বিশ্বের কোন দেশ (সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান খাদ্য সংকট)। যথার্থ নির্বাচনই গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ। মানুষ যাতে নির্ভয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেজন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যবস্থা নিতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের কেন্দ্র দখল, বোমাবাজি, বাক্স ছিনতাই ইত্যাদির বীভৎস বিবরণ দেয়।

এই সকল অবৈধ অস্ত্রধারী ও বোমাবাজদের গ্রেফতার এবং অস্ত্র উদ্ধার তাই নির্বাচনের পূর্বে অবশ্য প্রয়োজনীয় - তা সে ব্যক্তি যেকোন দলেরই হোক না কেন। রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে নিশ্চিতভাবে এই উপলব্ধিটা ঘটেছে যে ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব অপকারই কেবল করে না ধ্বংস করে দেয় সব শেষ পর্যন্ত। অভি-নীরুর সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড স্মরণ করছি।

২. নির্বাচনে অধিক দলীয় কর্মীদের প্রয়োজনীয়তার সুযোগে স্থানীয়ভাবে যাতে জাতীয় পার্টির দালালরা পুনরায় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলগুলোকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ তা ঘটলে আন্দোলনের আপোষহীন কর্মী এবং জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে। হারাবে গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের প্রতি মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত আস্থা-বিশ্বাস। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা হবে ক্ষুণ্ণ।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মানুষের সেবার বদলে নিজের ও আত্মীয়-পরিজনদের অর্থবিত্ত বৃদ্ধিতে জনগণের তার প্রতি প্রদত্ত আস্থাটিকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। কেবল আমাদের দেশেই নয় তৃতীয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে। তার অন্যতম একটি কারণ অত্যধিক নির্বাচনীয় ব্যয়। এই খরচের অর্থ 'ইনভেস্টমেন্ট' ধরে তারা শুরু করেন লাইসেন্স পারমিটের ব্যবসা। সেজন্য নির্বাচনী প্রার্থীদের সর্বোচ্চ নির্বাচনী ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

৩. যে মহান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতি একটি নতুন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে তা শত শহীদের রক্ত রাঙানো, হাজারো কর্মীদের পঙ্গুত্বের অর্থে কেনা। এইসব সাহসী অমিততেজী বীরদের কাছে জাতি চিরকৃতজ্ঞ। তাদের যথার্থ মর্যাদা দান আমাদের কর্তব্য। সেটা এরশাদ ও তার চামচা মন্ত্রী-আমলা-ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করে এবং তাদের অবৈধ অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে, সেই অর্থের দ্বারা করা যেতে পারে। তাঁদের নামে নামকরণ হোক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সড়ক সেতু ইত্যাদির।

৪. এরশাদ ও তার সহযোগী দালালদের অবশ্যই বিচার করতে হবে এবং যা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে যত সহজতর পরবর্তী সরকারের পক্ষে ততটা হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক বাধ্যবাধকতা ও পিছুটান থাকে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক, রাজনৈতিক পূর্ব-পরিচয়, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদির কথা বলছি, আমাদের দেশটাতো খুব ছোট।

একাত্তরের দালালদের বিচার না করে আমরা যে ভুল করেছিলাম তার মাশুল আজও জাতিকে দিতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তারা আবারও ফিরে এসেছে হিংস্র নখর নিয়ে। এবার দয়া করে অতীত থেকে শিক্ষা নিই যেন আমরা। এই দানবেরা যদি আবারো ফিরে আসে–। না, আমি ভাবতে চাই না তেমন কিছু। কারণ বিশ্বাস করি জাতি এবার তার শহীদদের মর্যাদা দেবে। বিচার হবে সাড়ে ৮ বছরের সকল অপকর্মের। বিচার হবে সর্বস্তরের দালালদের। সময়ের দূরত্বে চাপা পড়ার আগেই শুরু হোক দৃষ্টান্তমূলক এই বিচার কার্য।

৫. রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষহীন হওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই সকল দায়িত্ব অনায়াসে পিছুটান ছাড়াই সম্পন্ন করতে পারবেন। আরো একটা ব্যাপার এই সকল কাজ সম্পন্ন করার কৃতিত্ব কোন দল বা গোষ্ঠীর নয়- এদেশের সংগ্রামী ছাত্র-জনতার। পরবর্তী সরকারের এই সকল কাজ সম্পাদনের শুরুর কৃতিত্ব নেয়ার রাজনৈতিক ইচ্ছা জাগতে পারে যা গণঅভ্যুত্থানের মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এই সকল কাজ শেষ করা থাকলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের পক্ষে দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করা সুবিধাজনক হয়।[২৬১]

জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর একাধিক চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদে। ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত একটি চিঠি লিখেছিলেন বাংলাদেশ দর্শন কংগ্রেসের মূল সভাপতি অধ্যাপক ড. আবদুল জলিল মিয়া। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'গণদুশমনদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই'। চিঠিতে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষের ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও চাপের মুখে গত ন'বছরের খুনী ও স্বৈরশাসক জেঃ এরশাদ ও তার সহযোগীগণ বহু আন্দোলনের পর অবৈধ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে গত ৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মাত্র ৪/৫ দিন পরেই পুনরায় ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য রাখতে শুরু করেছে এরশাদ-মওদুদ গং। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ এবং অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে এ অপপ্রয়াসের ধিক্কার জানাচ্ছি। আমি অবিলম্বে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট এসব গণদুশমনদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য আহ্বান ও দাবী জানাচ্ছি।[২৬২]

একই দিন ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর এই বিষয়ে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদে। চিঠিটি লিখেছিলেন গাজীপুরের কালিয়াকৈরের চণ্ডিশ্বর গ্রাম থেকে ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'আমরা হতাশ'। চিঠিতে লেখা হয়:

> দীর্ঘ আট বছরে বহু ছাত্র-জনতার রক্ত ঝরেছে, বহু মায়ের বুক বিদীর্ণ হয়েছে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটাতে। কিন্তু বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এরশাদশাহী ও তার দোসরদের বিচারের ব্যবস্থা না করায় আমরা হতাশ হয়েছি। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত গণঅভ্যুত্থানে পতিত সরকারের অপকর্মের বিচারের জন্য তাদের গ্রেফতার এখনও করা হয়নি, ভাবতেও অবাক লাগে। আমরা হতাশ আরও একটি কারণে তাহলো বিতর্কিত স্বাস্থ্যনীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ '৯০ বাতিল করা হলেও যে ছাত্রসমাজ এত ত্যাগ স্বীকার করে গণঅভ্যুত্থান ঘটালো তাদের নিজস্ব ১০ দফার (যেমন চাকরির বয়সসীমা ২৭ থেকে ৩০ এ উন্নীত করা) ব্যাপারে সরকার নিশ্চুপ থাকায়। একই সাথে শ্রমিকদের দাবীসমূহের কথাও উল্লেখ করা যায়। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষহীন হওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পন্ন করা সহজ। পরবর্তী সরকারের এই সকল কাজ সম্পাদনের কৃতিত্ব নেয়ার রাজনৈতিক ইচ্ছা জাগতে পারে যা গণঅভ্যুত্থানের মূল্যবোধের পরিপন্থী। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে একাত্তরের পরে রাজাকার-আলবদরদের বিচার না করায় জাতিকে বহু মাসুল গুণতে হয়েছে- এবারও এরশাদশাহীর বিচার করতে ভুল করলে গোটা জাতিকে সেই ভুলের মাসুল গুনতে হবে।[২৬৩]

দুদিন পর ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর এই বিষয়ে আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় সংবাদে। চিঠিটি লিখেছিলেন মাগুরা শ্রীপুরের সাচিলাপুরের তখনপুর গ্রাম থেকে কাজী ফয়জুর রহমান। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'জেনারেল এরশাদ: একারই কি বিচার হবে'। চিঠিতে লেখা হয়:

> ছাত্র জনতার চাপে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ হয়েছেন। তাকে বিচারের বাধ্য দাবী উঠেছে-কৃতকর্মের বিচার হওয়াই দরকার। কিন্তু এই লগ্নে আরো কিছু কাজ আছে। যারা তাকে 'গণতান্ত্রিক' সাজিয়ে রেখেছিলেন, যারা তাকে এবং তার পরিষদবর্গকে গণতান্ত্রিকভাবে ভোট কেটে জিতিয়ে দিয়েছিলেন তাদের কী হবে?
>
> জেনারেল এরশাদ আটষট্টি হাজার গ্রামের ভোট কেন্দ্রগুলোতে যাননি। তাকে ভোট কেটে দিল কে বা প্রিজাইডিং অফিসারদের কারা? শতকরা ৬০/৭০টি ভোট দিয়ে দিতে বললো কে বা কারা? যারা বললো এবং যারা নির্বাচন কমিশনে বানোয়াট ফলাফল পাঠালো তারা কারা?

> তারা ঐ বানোয়াট ফলাফল না পাঠালে তাদের কি শাস্তি হতো? সেই শাস্তির আদেশ কাদের হাত দিয়ে আসতো? তারা আজকে কোথায় আছে? তারা কি আগামীদিনে প্রমোশন বা ভাল পোস্টিংয়ের লোভে তাই করবে না?
>
> এসব প্রশ্ন আজ সংগ্রামী জাতীয় থাকতে থাকতেই নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করা দরকার। এই দালালী অভ্যাস সর্বস্তর হতে বিলোপ করবার বাস্তব ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ভোটকাটা মস্তানদের চিহ্নিত করা দরকার। নইলে অবিলম্বেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।
>
> আবেগ বা জোয়ারই নয় উদ্দেশ্য সাধনে একান্তভাবে সমস্যার গভীরে যেতে হবে।[২৬৪]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতি বলা হবে না প্রেসিডেন্ট বলা হবে সে বিতর্কের অবসান করার আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার পূর্ব রামপুরা থেকে নূর হোসেন। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট না রাষ্ট্রপতি'। চিঠিতে লেখা হয়:

> স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। গত ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে লে. জে. হো. এরশাদ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন আর ৬ই ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ হন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়।
>
> এদেশের মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছে। গণতন্ত্রের সংগ্রামে রক্ত ঝরিয়েছে ডাঃ আলম (সর্বশেষ) সহ বহু মানুষ ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও জনতা। অনেকেই বলেছেন, বাংলাদেশ দু'বার স্বাধীন হলো। একবার হয়েছে ৭১ এ, আর এবার ৯০ তে। নতুন প্রজন্ম ৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দেখেনি, এবারে তা তারা দেখল ৯০ এর ৪, ৫, ৬ ডিসেম্বরে। এটি মানুষের হাতে মানুষেরই অভ্যুত্থান।
>
> এখন কথা হলো, স্বৈরাচারের পতন হয়েছে; কিন্তু শুধু এক ব্যক্তির পতন। এরশাদের পতন। এরশাদের চেলাচামুণ্ডারা বহাল তবিয়তে আছেন। এরশাদের পদ নেই; কিন্তু পদলেহীরা আছেন। আছেন দালাল, মন্ত্রী, আমলা, প্রশাসক, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী। প্রচার মাধ্যম রেডিও টেলিভিশনেও এরা আছেন।
>
> ৭ই ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। ঐ পুষ্পমাল্যের মাঝখানে বেশ বড় করে লেখা ছিল 'রাষ্ট্রপতি' কথাটা। কিন্তু, টেলিভিশনের রাত ৮টার বাংলা সংবাদে ও কিছু পরে রেডিওর বাংলা খবরে রাষ্ট্রপতিকে বারংবার বলা হলো প্রেসিডেন্ট। আপনাদের দৈনিক সংবাদ কিন্তু প্রেসিডেন্ট নয়, রাষ্ট্রপতিই লেখে।

যাই হোক, আমার প্রশ্ন, তিনি রাষ্ট্রপতি না প্রেসিডেন্ট? সংবিধানে তো 'রাষ্ট্রপতি' উল্লেখ রয়েছে। সেক্ষেত্রে কারা সংবিধান অবমাননা করছেন? জনতার জয় সম্প্রচার কেন্দ্র তথা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতা কর্মীদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।[২৬৫]

জেনারেল এরশাদের শাসনামলে বঙ্গভবনের সামনের ও দক্ষিণের রাস্তাটি চলাচলের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এই রাস্তা আবার জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেছিলেন জনৈক নাগরিক। অর্থাৎ চিঠি লেখকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'গণতন্ত্রের সড়ক : স্বৈরতন্ত্রের সড়ক'। চিঠিতে লেখা হয়:

বঙ্গভবনের সামনের রাস্তাটি বিগত কয়েক দশক ধরে পর্যায়ক্রমে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক রূপে কাজ করছে। যখনই দেশে স্বৈরতন্ত্র আসে, রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যায়, যখনই গণতন্ত্র আসে, রাস্তাটি খুলে যায়। বিগত স্বৈরশাসনেরকালে বঙ্গভবনের সামনের এবং দক্ষিণের রাস্তাটি যানবাহন বা লোক চলাচলের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঐ কাজের পরিপূরকরূপে মতিঝিলের রাস্তায় এবং ডিআইটি রোডের একাংশে ও ফকিরাপুল পর্যন্ত রিকশা চলাচল বন্ধ করা হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আমরা আবেদন করছি: বঙ্গভবনের সামনের ও দক্ষিণের রাস্তাটি লোক চলাচল ও যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে ঢাকাবাসীদের গণতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিন। আরো আবেদন করছি: শাপলা চত্বর থেকে দৈনিক বাংলা পর্যন্ত এবং বঙ্গভবন থেকে পুলিশ হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তাগুলোকে রিকশা চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হোক।[২৬৬]

সংবাদপত্রে প্রকাশিত জেনারেল এরশাদের সরকারের ক্ষমতাচ্যুত উপরাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে সংবাদে একটি চিঠি লিখেন একজন পাঠক। ঢাকা থেকে শওকত ওসমান নামের এই পাঠকের চিঠিটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'নিরপেক্ষতা? কার জন্যে নিরপেক্ষতা?'। চিঠিতে লেখা হয়:

আজ ৯.১২.৯০ তারিখের সকালে দৈনিক The Morning Sun (দি মর্নিং সান) পত্রিকায় প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদের এক বক্তব্যে আমি স্তম্ভিত।

রাজপথে শহীদের রক্ত এখনও শুকিয়ে যায়নি। বহু জায়া জননী সন্তান ভগিনী তাদের সদ্য প্রিয়জন-হারা বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর, দগদগে জখমের মত শোক বুকে এখনও আহাজারি-রত।

এমন পটভূমির যারা উৎস, রক্তের হোলিখেলার যারা নায়ক-তাদের মধ্য থেকে ধোয়া তুলসী পাতার আবরণ গায়ে জড়িয়ে কেউ সাফাই গাইতে পারে, তা ভাবা রীতিমত কষ্টসাধ্য।

প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ বর্তমান অস্থায়ী সরকারকে কিছু মুরুব্বীসুলভ নসিহত, উপদেশদানের পর প্রতিবেদককে বলছেন যে, দেশের বর্তমান জনবিক্ষোভ, গণআন্দোলনের মূলে ছিল উচ্চ পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতি। তার ভাষায়, 'Large Scale corruption in high office.'

শুনেছি ভদ্রমহোদয় পেশায় ব্যারিস্টার। পেশা বা দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চয় অবহিত। বাংলাদেশের এই বেগুনা নাগরিককে জিজ্ঞেস করতে বাসনা হয়- উপরাষ্ট্রপতি পদ তো হোসেইন এরশাদ সাহেবের পরই অবস্থিত। নিজ পদে বছরের পর বছর অবস্থানকালে তাহলে তার দায়িত্ব কী ছিল? অনেক পদ থাকে বেতনহীন সম্মানসূচক শোভাবর্ধক। মওদুদ সাহেব কি তৎপর্যায়ভুক্ত ছিলেন?

মানবপ্রেমিক শিল্পী কামরুল হাসান প্রেসিডেন্ট এরশাদকে 'বিশ্ববেহায়া' খেতাব দিয়েছিলেন। এখন দেখছি, প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের মন্ত্রী পরিষদই ছিল বেহায়াগোষ্ঠী-বেশরম, নির্লজ্জ। তিনি জেনে রাখুন, বর্তমান সরকার নিশ্চয় নিরপেক্ষ থাকবে। কিন্তু গণতন্ত্র-আন্দোলনের যারা বিরোধিতা করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে দেশময়, তাদের ক্ষেত্রেও কী তিনি মনে করেন সরকারের নিরপেক্ষতা আবশ্যক? শহীদ না স্বৈরাচারী-গেরস্থ বনাম দস্যু-জালেম বনাম মজলুমের ক্ষেত্রেও কি নিরপেক্ষতা আবশ্যক? নৈতিক লজিকসহ ব্যারিস্টার সাহেব দেশবাসীকে তার জবাব দিন।[২৬৭]

স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন চলাকালে ১৯৯০ সালের ১৭ নভেম্বর সংবাদে একজন পাঠক 'গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনের স্বার্থে' একটি চিঠি লিখেন। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এই চিঠির ব্যাপারে আরেক পাঠকের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখা একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর। চিঠিটি লিখেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিদারাবাদ থেকে ফরিদ গাজী। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'তিনি বিচলিত তাতে আমি অবাক'। চিঠিতে লেখা হয়:

২ অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ বাংলা দৈনিক সংবাদ এর চিঠিপত্র বিভাগে ভোলা থেকে হারিছ আহমদ লিখিত 'গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনের স্বার্থে' এ বিষয়ের মতামতে আমি অবাক। বর্তমানে চলমান গণআন্দোলনে গাড়ী পোড়ানো, রেল লাইনের ক্ষতি, রিকশা-টেম্পোর নষ্ট দেখে তিনি বিচলিত একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে। সব গাধা সমান বোকা নয়। তাই বলা যায় গাধার মধ্যেও বুদ্ধিমান গাধা আছে, আবার বোকা গাধাও আছে। বুদ্ধিমানরা তুলনামূলকভাবে বোকা গাধার চেয়ে সচেতন হয়। সেই হিসেবে তিনিও সচেতন। তার নাগরিক দাবী-জ্বালাও পোড়াও-এর

রাজনীতির পরিবর্তে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ। তাও করেছেন আবার আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কাছে। এ ব্যাপারে ভাই হারিছ, আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি : আপনি দাবীটা সরকারের বরাবরে করুন। কারণ ক্ষতি যে দেশের হচ্ছে এ কথাটা তারা বুঝলে এবং মানলে কাজ হবে। সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব সরকারের।

তার মতামতে আমি অবাক হচ্ছি। কারণ বর্তমান আন্দোলনে তিনি বিচলিত গাড়ী পোড়ানো আর রিকশা টেম্পুর ভগ্নাংশ দেখে। কিন্তু দুঃখিত নন পুলিশের গুলীতে নিহত মানুষ দেখে, ভারাক্রান্ত নন আহত নাজমুল হক প্রধান (ছাত্রনেতা)-এর রক্ত ঝরা চেপ্টা মাথাটা দেখে। তবে আর তাকে কি ভাবে সচেতন বলি?[২৬৮]

জেনারেল এরশাদের আমলে চালুকৃত উপজেলা আদালত নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বন্ধ না করার আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেছিলেন কুষ্টিয়ার খোকসা শাখা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সহসম্পাদক আক্কাছ আলী। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'আইনজীবীদের দাবীটি কি সঠিক'। চিঠিতে লেখা হয়:

সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের একটি বিবৃতি দেখলাম সংবাদপত্রে। আইনজীবীরা সেখানে দাবী করেছে উপজেলা সহকারী জজসহ সকল কোর্ট-কাছারির অবলুপ্তি। ব্যাপারটা কি ঠিক হবে? হবে না। কারণ ইতিমধ্যেই উপজেলা কোর্ট মফস্বলবাসীদের কাছে প্রতিষ্ঠিত একটা ফ্যাক্টর হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ এই কোর্টসমূহকে ঘিরে অনেক অনেক সাধারণ মানুষ, বেকার মানুষ কাজ করে খাচ্ছে (যেমন- মোহরার, ভেণ্ডার, চা-দোকানদার ইত্যাদি)-কাজেই এসব কোর্ট যদি আবার জেলা শহরে ফিরে যায় আমার মনে হয় ভোগান্তি বাড়বেই। আশা করি, সংশ্লিষ্ট সবাই হৃদয় দিয়ে এ ব্যাপারটি অনুধাবন করবেন।[২৬৯]

জেনারেল এরশাদের আমলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চেপে বসা জামাত-শিবির চক্র নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরও সক্রিয় থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল হল থেকে কাজী কামাল উদ্দীন। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'দুঃখ রাখি কোথায়'। চিঠিতে লেখা হয়:

এরশাদের পতন হয়েছে, দেশ থেকে জগদ্দল চেপে বসা স্বৈরাচারী শাসনের অবসান হয়েছে আপাতত। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬ সাল থেকে চেপে বসা সাম্প্রদায়িক জামাত-শিবির চক্র বহাল তবিয়তে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

এরশাদের পতনে সারাদেশে যেমন একজনও জামাত-শিবির কর্মী শহীদ হয়নি তেমনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও এরা কোন এরশাদবিরোধী ভূমিকা পালন করেনি। ২৮শে নভেম্বর সকালে প্রায় চার হাজার ছাত্র ৩ মাইল দূরে অবস্থিত হাটহাজারী উপজেলা ঘেরাও করে এবং কার্ফু অমান্য করে মিছিলসহ সরকারী দপ্তরে আগুন দেয়। সম্মানিত শিবির কর্মীরা এই সময়ে ক্যাম্পাসে তাদের মিছিল সীমাবদ্ধ রাখে এবং বর্তমান মিছিলে এরশাদের চেয়ে বর্তমান উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে শ্লোগান বেশী ছিল। এবং আরো মজার ব্যাপার এর আগে ছাত্রঐক্যের কর্মীরা যখন একটি সরকারী ডাকগাড়ীকে আক্রমণ করার উদ্যোগ নেয় তখন তারা সেটিকে নিরাপদে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে সাহায্য করে। ঐ দিন (২৮-১১-৯০) তারা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে গিয়ে ৩০ শে নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের জন্য তৈরী করা প্যাণ্ডেলসহ অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ভাঙচুর করে এরশাদবিরোধী আন্দোলন শেষ করে। হাটহাজারী থেকে ফেরার পর ছাত্রঐক্যের কর্মীদের হাটহাজারী যাওয়ার অপরাধে মারপিট করে এমনকি পরের দিন সকালে স্টেশন চত্বরে ছাত্রলীগ (হা-অ) কর্মী মামুনকে মারধর করে।

এতকিছু দুষ্কর্ম ঘটানোর পর যখন তারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রঐক্যকে এরশাদের দালাল বলে আখ্যায়িত করে তখন দুঃখ লাগে। এই ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দেবার সময় এখনই।[২৭০]

স্বৈরাচারবিরোধী দীর্ঘ গণআন্দোলনে অনেকেই শহিদ হয়েছেন। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এইসব শহিদদের একটি সঠিক তালিকা প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয় সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে। ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেছিলেন বাগেরহাটের স্টেডিয়াম রোড থেকে মুনির হাসান। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'শহীদের নিষ্কলুষ তালিকা'। চিঠিতে লেখা হয়:

জনতার বিজয় হয়েছে, অজস্র বিনিময়ে। পত্রিকায় আত্মত্যাগের দেখলাম সব মহল এসেছে গণতান্ত্রিক থেকে তাগিদ আন্দোলনের বিভিন্ন নাম শহীদদের তালিকা প্রণয়ন করার। দাবী উঠেছে, বেতার-টিভিতে শহীদদের নাম প্রচার করা হোক, যাতে দেশবাসী সকলেই তাঁদের কথা জানতে পারে, শ্রদ্ধার সাথে নাম উচ্চারণ করতে পারে। শহীদদের প্রায় সকলেই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের আমরা জেনেছি স্ব স্ব সংগঠনের কাছ থেকে নির্ভুলভাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, গত নয় বছরের আন্দোলনে জীবন দানের ন্যূনতম ঘটনা ঘটেনি একটি গোষ্ঠীর। প্রকৃতপক্ষে তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় বর্ণচোর মত। তাদের অতীত, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়াবার কথা বলে না। বিরাশী-নব্বই পর্বের করলে একই সূক্ষ্ম বিচার

সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। কেননা তারা বিগত বছরগুলোতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের ওপর হামলা করেছে। বিভিন্ন স্থানে অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে বারংবার। যেমন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এমনকি নভেম্বরের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সম্ভাবনাময় উত্তাল দিনেও তারা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মত্যাগের উদাহরণ সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দুর্ঘটনা বশতঃও নয় । হয়তো ইতিহাসেরই নির্বন্ধ। গৌরবের ইতিহাসে 'চাঁদের কলংক' সৃষ্টি না করার জন্যে। শহীদের তালিকা তাই নিষ্কলুষ।[২৭১]

সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর শিক্ষিত সমাজকে দেশ গঠনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার মালিবাগ থেকে তরীকুল ইসলাম। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'সর্বস্তরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে একটি বিনীত আবেদন'। চিঠিতে লেখা হয়:

আমরা এতদিন লিখতে পারিনি। কারণ চতুর্দিকে ছিল চোখ-রাঙ্গানি নিষেধের আর বেড়াজাল। পত্রিকাওয়ালারাও অনেকে আমাদের অনেকের সাহসী লেখা ছাপতে পারেননি। যাঁরা সাহসী সন্তান ছিলেন তাঁরা ছেপেছেন এবং স্বৈরাচারী এরশাদের কাছ থেকে পুরস্কারের বদলে পেয়েছেন তিরস্কার। তবে এটা ঠিক সাহসী লেখক দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে পেয়েছেন অকুণ্ঠ ও প্রাণঢালা ভালবাসা ও ভূয়সী প্রশংসা। তাঁদের সাহসী ভূমিকার কাছে আমরা আজীবন ঋণী থাকব।

সর্বযুগেই দেখা যায় সাহস করে অনেক লোকই কথা বলতে পারে না। কারণ তাদের সম্মুখে অনেক বাধা। কিন্তু ঝুঁকি আছে জেনেও যারা সাহস করে বলতে পারেন, লিখতে পারেন তাদের জন্য আমরা অগণিত দেশবাসী প্রাণভরে দোয়া করছি তাঁরা সামনের সঙ্কটময় দিনেও যেন এমনিভাবে বীর সেনানীর পরিচয় দিতে পারেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আমার আকুল আবেদন, দেশমাতৃকার কল্যাণের জন্য এখন একটু মুখ খুলুন। বন্ধ কলমের ক্যাপটা খুলুন। দু'চার কথা বলুন, লিখুন। এখন বসে থাকার সময় নয়। দেশের কাছে আমরা সবাই কম-বেশী দায়বদ্ধ। যার যতটুকু ক্ষমতা এবং যোগ্যতা আছে সেই যোগ্যতার বলেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু গঠনমূলক কাজ করা উচিত। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত ঘরে বসে থাকলেই চরিত্রবান হওয়া যায় না আর সঙ্কটময় মুহূর্তে নির্বোধ প্রাণীর মত জাবরকাটা ও শুয়ে থাকা সুনাগরিকের লক্ষণ নয়।[২৭২]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাতে পারে এমন অনুষ্ঠান প্রচারের আগে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের

প্রতি আহ্বান জানানো হয় সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে। ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার ৪০ পুরানা পল্টন থেকে খালেদ হোসেন চৌধুরী। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'একটি প্রতিবাদ'। চিঠিতে লেখা হয়:

এবারের বিজয় দিবস রজনীতে বিটিভি থেকে মামুনুর রশীদের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় প্রচারিত হয় 'এই সূর্য এই প্রত্যয়' ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। উপভোগ্য এ অনুষ্ঠানের কিছু কিছু অংশ আমাদের নতুন করে ভাবিয়েছে। মামুনুর রশীদ জানালেন যে, ২৭ শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। কিন্তু তিনি বলতে ভুলে গেছেন যে, এর আগের দিন অর্থাৎ ২৬ শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটের ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। মো. হান্নানের ঘোষণার ব্যাপ্তি অঞ্চল মাত্র ৬০ মাইল (সম্ভবত) হওয়ায় বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ তা শুনতে না পেলেও তার সেই অবদানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার নাম ইতিহাসের বিকৃতি।

ইতিহাসের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকার অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের অবদানকে অনেক সংক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু আমাদের যাদের জন্ম স্বাধীন দেশে তারা ঠিকই বিজয়ের এই উনিশতম বার্ষিকীতে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি আমাদের কৈশোরে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কত ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চলেছে। আর এও জেনেছি কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর সততা ও কীর্তির চেয়ে তাদের সুনামের তোড়জোড় একটু বেশীই চলে।

পরিশেষে বিটিভি কর্তৃপক্ষকে বলতে চাই, যে স্বৈরাচারের কারণে এই অনুষ্ঠানটি গত বছর প্রচারিত হয়নি সেই স্বৈরাচারের শাসনকালেই অনুষ্ঠানটি নির্মিত। যে দেশে সরকারী পর্যায় থেকে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর অপপ্রয়াস চলে সে দেশে এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারের পূর্বে অনেক সতর্ক হতে হয়।

খণ্ডিত ইতিহাস ইতিহাস নয় আর যখন তা মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট তখন তো নয়ই।[২৭৩]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টে জেনারেল এরশাদের সহযোগী হিসেবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষে লিখেছিলেন ঢাকার আরমানিটোলা থেকে রফিকুল হাসান। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'আবুল কালাম আজাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত দাবী'। চিঠিতে লেখা হয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন সাহেবের কতিপয় দালালের বিচারের দাবীকে আমরা অত্যন্ত যুক্তিসংগত মনে করি এবং দাবী করি। অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ স্বৈরাচারী এরশাদশাহীর দালালি করিয়া প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতির ছদ্ম আবরণ ও যেসকল আর্থিক ফায়দা লুটিয়াছেন ও প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট হইতে নীতি-বহির্ভূতভাবে নিজে ফায়দা লুটিয়াছেন ও দোসরদেরকে কি পরিমাণ ফায়দা দিয়াছেন তার প্রকাশ্য তদন্ত চাই।

ট্রাস্ট অফিসটি অধ্যাপক সাহেবের বিনোদন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি এসব দুর্নীতির প্রতিবাদে ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাকালীন সচিব পদত্যাগ করিয়াছেন।

অতএব, সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট জোর আবেদন, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন পূর্বক স্বৈরাচারের দোসর অধ্যাপক সাহেবের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।[২৭৪]

জেনারেল এরশাদের শাসনামলে স্বরূপকাঠী উপজেলার নাম পরিবর্তন করে নেছারাবাদ করার অপচেষ্টা করা হয়। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এই নাম পরিবর্তনের বিষয়টি প্রতিহত করার আহ্বান জানানো হয় সংবাদে প্রকাশিত এক চিঠিতে। ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেন স্বরূপকাঠী উপজেলাবাসীর পক্ষে পিরোজপুরের স্বরূপকাঠী উপজেলার কুহদাসকাঠী গ্রাম থেকে পুলিন বড়াল। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'স্বরূপকাঠী উপজেলার নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে'। চিঠিতে লেখা হয়:

স্বৈরাচারী গণবিরোধী এরশাদ সরকারের সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের অপকৌশলের আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপকাঠী উপজেলার নাম পরিবর্তন। ইতিমধ্যে এরশাদ সরকার শত শত বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বরূপকাঠী উপজেলার নাম পরিবর্তন করে নেছারাবাদ রাখার এক নির্দেশ জারি করেন। এলাকাবাসীর মতামত দাবীকে উপেক্ষা করে গণধিকৃত এরশাদ সরকার ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের প্রত্যাশায় জনগণের সোনার কাঠী স্বরূপকাঠীকে নেছারাবাদ নামে পরিবর্তন করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু স্বরূপকাঠীর জনগণ সাথে সাথে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং ও স্মারকলিপির মাধ্যমে উক্ত সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। 'স্বৈরাচারী সরকার তার স্বভাবসুলভ আচারের প্রতিফলন হিসেবে জোরজবরদস্তি করে এক সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে স্বরূপকাঠী উপজেলার নাম পরিবর্তন করে নেছারাবাদ রাখার নির্দেশ দেন। সরকারের নির্দেশের প্রেক্ষিতে কিছু কিছু সরকারী দপ্তরে বাধ্য হয়ে

উক্ত নাম ব্যবহার করলেও জনগণ কর্তৃক উক্ত নাম সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান হয়েছে। স্থানীয় ছারসীনার এক মৃত হুজুরের নামে স্বরূপকাঠী উপজেলার নামকরণ করা হয় নেছারাবাদ। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধে উক্ত হুজুরের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত স্বরূপকাঠী নামের রূপান্তরকে নিজেদের অস্তিত্ব তথা জন্মকে অস্বীকার করারই শামিল। স্বৈরাচারী সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন, ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অপকৌশলের ফসল পরিবর্তিত নেছারাবাদ উপজেলার নাম অবিলম্বে প্রত্যাহার পূর্বক কাগজপত্রে পূর্বের স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপকাঠী নামে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা যাচ্ছে।[২৭৫]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সকল কালো আইন বাতিল করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ অবজারভারে। ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেছিলেন ঢাকার বিএসির সহকারী অধ্যাপক থেকে এম জাহিদুল হক। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'Transition To Democracy'। চিঠিতে লেখা হয়:

With the taking over of charges as the Head of the neutral caretaker Government by Chief Justice Mr. Shahabuddin Ahmed, the process to elect a sovereign Parliament through holding a free and fair elections will soon begin. And very soon a truly elected government is going to be established in Bangladesh.

We sincerely hope that the new government will work hard to strengthen the democratic institutions in the country and to establish people's democratic rights and fundamental rights including the freedom of expression through eliminating all the existing black laws, such as, the Special Powers Act, etc.

Since Bangladesh is an agricultural country, I honestly hope that the new government will adopt pragmatic measures to raise the living standard of the farming people and to ensure overall agricultural development through providing maximum subsidies to the agriculture sector. To educate the farming community, we feel that Agricultural Schools need to be set-up in every villages for imparting agricultural education plus primary education. More agricultural universities and

colleges should be established in order to produce qualified agricultural personnel and farmers.

In general, it is expected that the new government will make a major break-through in improving the lot of the common Bangladeshis and in achieving economic emancipation of the country.

We warmly wish the victory of democracy over injustice and oppressions.[২৭৬]

বাংলাদেশ অবজারভারে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক মিশন পুনর্গঠনের আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই চিঠিটি লিখেন ঢাকার ফুলার রোড থেকে শাহ আলম। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'Re-organisation Of Foreign Mission'। চিঠিতে লেখা হয়:

With reference to a UNB report published in your paper (Dec 12) that the Bangladesh Permanent Representative to the UN may be recalled, it may be mentioned that Mr. Mohiuddin belongs to the Income Tax Service. His entry in the foreign service and phenomenal rise in position is due to the fact that he is a brother-in-law of the former President Ershad. It is a case of gross nepotism and should be dealt with as such. His important connection gave him unrestricted power which was allegedly abused. He reportedly used to dictate to the Foreign Ministry.

I am glad to read in the UNB report that the Foreign Ministry officials are now anxious to observe rules and regulations which were flouted with impunity in the last 8 years including rules on recruitment, posting and transfer and service conduct rules. In fact the Foreign Ministry is in an awful mess and a thorough re-organisation is needed. This may be beyond the competence or capability of the present interim administration. But some urgent measures are necessary to stop the rot from growing further.[২৭৭]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে গঠিত অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের নিরপেক্ষতার স্বার্থে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন আহ্বান জানিয়ে পাঠকরা বাংলাদেশ অবজারভারে চিঠি লিখেন। ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ অবজারভারে এই বিষয়ে দু'টি চিঠি প্রকাশিত হয়। একটি চিঠিটি লিখেন

ঢাকার গুলশান থেকে মো. আহসানুল্লাহ। চিঠির শিরোনাম ছিল: 'A Neutral Government'। চিঠিতে লেখা হয়:

From newspaper reports it appears some doubts are being voiced in various circles including lawyers and other intellectuals about the neutral character of the interim caretaker government. The point is of vital importance. To establish their neutrality the Advisors to the Acting President have pleaded not to contest in any election for a certain period. We feel that it will strengthen the bonafide of the Advisors if they will pledge not to seek or accept any office of profit under the state for one year after the induction of the next government.

The above pledge will remove any lingering doubt in the minds of people regarding the genuine neutrality of the Advisors or that any one of them may be tempted to be partial by the corrupting influence of promise of a lucrative position such as an ambassadorship or chairmanship of an autonomous corporation or a nationalized bank or in the judicial system.[২৭৮]

একই শিরোনামের নিচে ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত অপরটি চিঠিটি লিখেন ঢাকার ধানমণ্ডি থেকে এস এম আবদুল্লাহ। চিঠিতে লেখা হয়:

The present interim Government is supposed to be neutral. But can person be really neutral? He may not belong to any political party but he will certainly have views and/or sympathies favouring this or that party. Some of the Advisors have known political affiliations. They were selected from lists submitted by the political parties. One of them, former bureaucrat, is reported to have joined Baksal in 1974. Therefore what we have at present may be termed as a multi-party government instead of a neutral one.

In the circumstances in all fairness the people have a right to know which party nominated which advisor.[২৭৯]

অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টাদের নিরপেক্ষতার স্বার্থে করণীয় সম্পর্কে আরেকটি চিঠি বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর। চিঠিটি লিখেন ঢাকার জাহানারা গার্ডেন, গ্রীন রোড থেকে

আমানুল্লাহ চৌধুরী। এই চিঠিটির শিরোনামও ছিল: 'A Neutral Government'। চিঠিতে লেখা হয়:

> I support the suggestion of Mr. Ahsanullah (B.O. Dec. 18) that the Advisors to the Acting President should neither seek nor accept any office of profit in the next government. A pledge to this effect will remove any doubt about their neutrality. The Acting President Justice Shahabuddin in his celebrated judgment in the case of Anwar Hussain vrs Bangladesh (the 8th amendment case). para 365. had very rightly observed as follows on the question of impartiality of the judges:
>
> "Opening up of opportunities for appointment after retirement may serve as a temptation and temper with his independence during the concluding period of his service. If this provision for appointment after retirement is retained, its bad effects may be countered if a reasonable period, say two years, elapses, from the date of a Judge's retirement to the date of his fresh appointment to any purely judicial office".
>
> After tremendous sacrifice in blood and tears the people have won a great victory to hold an election under a neutral government. The sacrifices cannot be allowed to go in vain and nothing should spoil this opportunity for a free and fair election. Justice Shahabuddin's formula for the neutrality of judges should be applied to ensure the neutrality of the Advisors. I would appeal to all political leaders. APSU and intellectuals to support this formula which the Acting President had himself prescribed.[২৮০]

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের গঠিত অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো ভাইস প্রেসিডেন্ট বা উপরাষ্ট্রপতি ছিল না। একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট বা উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগের পরামর্শ দিয়ে বাংলাদেশ অবজারভারে চিঠি লিখেন দু'জন পাঠক। এই চিঠিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট বা উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগের ব্যাপারে তিন রাজনৈতিক জোটের সঙ্গে পরামর্শ করার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর চিঠিটি প্রকাশিত হয়। চিঠিটি লিখেন ঢাকার জাহান আরা গার্ডেন গ্রীন রোড থেকে এফ এইচ এম মনসুর । চিঠির শিরোনাম ছিল: 'Appointment Of A Vice-President'। চিঠিতে লেখা হয়:

At this critical juncture of the nation my mind is agitating about one crucial point. The constitutional experts should ponder over the matter seriously.

After a long and hard struggle for democracy the nation, through its representative sin the three political alliances, has nominated one neutral and non-party Vice-President to act as the Acting President of the country who is to arrange for a free and fair election within three months. So far so good. But, God forbid, if anything happens to him during this interim period there might be a constitutional vacuum and this may lead the country to a grave crisis.

To safeguard against this sort of calamity. I would suggest that the Acting President should appoint one Vice-President in consultation with the three political alliances. This will remove, all apprehensions.[২৮১]

■■■

তথ্য সূত্র :

১. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৪. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৭. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২০. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৩. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৫. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৬. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
২৯. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩১. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৫. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৩৯. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪২. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৫. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৭. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫১. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৪. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১

৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৫৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬০. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬১. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৬. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৮. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭০. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭২. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৪. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৬. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৭. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৭৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮০. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৪. *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৮৯. *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯১. প্রাগুক্ত
৯২. *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৩. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৬. *দৈনিক বাংলা*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৭. *সংবাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
৯৯. *দৈনিক বাংলা*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০১. *সংবাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০৩. *সংবাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০৪. *দৈনিক বাংলা*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০৬. *সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০৮. *দৈনিক বাংলা*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১০৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১০. *সংবাদ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১২. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১৪. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১

১১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১৮. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১১৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২০. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২১. *সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২৪. *সংবাদ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১২৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩০. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩১. *সংবাদ*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩২. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩৪. *সংবাদ*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩৭. *সংবাদ*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৪০. *সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৪১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৪২. *দৈনিক বাংলা*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৪৪. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৪৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১
১৪৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৫০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৫১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৫২. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৫৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৫৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৫৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৫৮. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৫৯. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৬০. *সংবাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৬১. *সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৬২. *সংবাদ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৬৩. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৬৪. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৬৫. *সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৬৬. *সংবাদ*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৬৭. *সংবাদ*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৬৮. *সংবাদ*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৬৯. *সংবাদ*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৭০. *সংবাদ*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৭১. *সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৭২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫

১৭৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৭৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৭৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৭৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৭৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৭৮. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৭৯. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৮০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৮১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৮২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৮৩. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৮৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৮৫. *দৈনিক বাংলা*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৮৬. *দৈনিক বাংলা*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৮৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৮৮. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৮৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৯০. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৯১. *দৈনিক বাংলা*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৯২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৯৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৯৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৯৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৯৬. *দৈনিক বাংলা*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
১৯৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
১৯৮. *সংবাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
১৯৯. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২০০. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২০১. *দৈনিক বাংলা*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২০২. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২০৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২০৪. *সংবাদ*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২০৫. *সংবাদ*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২০৬. *সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২০৭. *সংবাদ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২০৮. *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২০৯. *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২১০. *সংবাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২১১. *সংবাদ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২১২. *সংবাদ*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২১৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২১৪. *সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২২৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২২৬. *দৈনিক বাংলা*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২২৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২২৮. *সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২২৯. *সংবাদ*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২

২৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২৩২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২৩৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৪০. *সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৪১. *সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৪২. *সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৪৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৪৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৪৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৪৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২৪৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৪৯. *সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৫০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২
২৫১. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৫২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৫৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৫৪. *সংবাদ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৫৫. *সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৫৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৫৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৫৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৫৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৬০. *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৬১. *সংবাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৬২. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৬৩. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৬৪. *সংবাদ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৬৫. *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৬৬. *সংবাদ*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৬৭. *সংবাদ*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৬৮. *সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৬৯. *সংবাদ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৭০. *সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৭১. *সংবাদ*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৭২. *সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৭৩. *সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৭৪. *সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৭৫. *সংবাদ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৪
২৭৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৭৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৭৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৭৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৮০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫
২৮১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫

চতুর্থ অধ্যায়

আধেয় বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক তথ্য যাচাইয়ের জন্য সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে মোট চারটি সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহ করার সময় সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণির আধেয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে: রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও পাঠকের চিঠি। গবেষণাকর্মের আওতাধীন সময়ে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ে চারটি সংবাদপত্রে মোট ১,৬৩৫টি রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও পাঠকের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। নিচের টেবিলে এই সব আধেয়র সংখ্যা ও হার উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল-১

রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম ও চিঠির সংখ্যা ও হার

সংখ্যা⇨ পত্রিকার নাম ⇩	রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	সম্পাদকীয় (সংখ্যা) (%)	উপসম্পাদকীয় ও কলাম (সংখ্যা) (%)	চিঠি (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
দৈনিক ইত্তেফাক	৪০৪ ৯২	১২ ৩	১১ ২	১২ ৩	৪৩৯ ১০০
দৈনিক বাংলা	৩৩৮ ৯২	১৬ ৪	৮ ৩ (প্রায়)	৪ ১	৩৬৬ ১০০
সংবাদ	৪২৮ ৮৮	১৬ ৩	১২ ২	৩২ ৭ (প্রায়)	৪৮৮ ১০০
বাংলাদেশ অবজারভার	৩১৪ ৯২	১২ ৩	- -	১৬ ৫	৩৪২ ১০০
মোট	**১৪৮৪ ৯১**	**৫৬ ৩**	**৩১ ২**	**৬৪ ৪**	**১৬৩৫ ১০০**

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক আধেয়র মধ্যে চারটি সংবাদপত্রেই রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে চারটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হার ৯১ শতাংশ। চিঠি প্রকাশের সম্মিলিত হার ৪ শতাংশ, সম্পাদকীয় প্রকাশের সম্মিলিত হার ৩ শতাংশ এবং উপসম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশের সম্মিলিত হার হচ্ছে ২ শতাংশ।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বিভিন্ন আধেয়র মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৯২ শতাংশ)। সম্পাদকীয় ও চিঠি প্রকাশের হার ৩ শতাংশ করে। আর উপসম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশের হার ২ শতাংশ। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত বিভিন্ন আধেয়র মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৯২ শতাংশ)। সম্পাদকীয় প্রকাশের হার ৪ শতাংশ। উপসম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশের হার প্রায় ৩ শতাংশ। আর চিঠি প্রকাশের হার ১ শতাংশ। সংবাদে প্রকাশিত বিভিন্ন আধেয়র মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৮৮ শতাংশ)। চিঠি প্রকাশের হার প্রায় ৭ শতাংশ। সম্পাদকীয় প্রকাশের হার ৩ শতাংশ। আর উপসম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশের হার প্রায় ২ শতাংশ। বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত বিভিন্ন আধেয়র মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৯২ শতাংশ)। চিঠি প্রকাশের হার প্রায় ৫ শতাংশ। সম্পাদকীয় প্রকাশের হার ৩ শতাংশ। এই পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও উপসম্পাদকীয় ও কলাম প্রকাশিত হয়নি।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক আধেয়র মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি। এছাড়া চারটি সংবাদপত্রের মধ্যে সংবাদে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (প্রায় ৭ শতাংশ) পাঠকের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে ১৪ দিনে সংবাদে ৩২টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে যা একটি লক্ষণীয় বিষয়।

উপরের টেবিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত চারটি সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক মোট ১,৪৮৪টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। উল্লিখিত রিপোর্টগুলোর ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে জানার জন্য নিচের টেবিলে পৃষ্ঠা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রকাশের সংখ্যা ও হার তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল-২

পৃষ্ঠা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রকাশের সংখ্যা ও হার

পৃষ্ঠা⇨ পত্রিকার নাম ⇩	প্রথম পৃষ্ঠার রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	শেষ পৃষ্ঠার রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	ভেতরের পৃষ্ঠার রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
দৈনিক ইত্তেফাক	৩১৫ ৭৮	৩৭ ৯	৫২ ১৩	৪০৪ ১০০
দৈনিক বাংলা	২৭০ ৮০	২৬ ৮	৪২ ১২	৩৩৮ ১০০

পৃষ্ঠা⇨ পত্রিকার নাম ⇩	প্রথম পৃষ্ঠার রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	শেষ পৃষ্ঠার রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	ভেতরের পৃষ্ঠার রিপোর্ট (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
সংবাদ	২৯০ ৬৮	৭৪ ১৭	৬৪ ১৫	৪২৮ ১০০
বাংলাদেশ অবজারভার	১৯১ ৬১	৮২ ২৬	৪১ ১৩	৩১৪ ১০০
সর্বমোট	**১০৬৬** **৭২**	**২১৯** **১৫**	**১৯৯** **১৩**	**১৪৮৪** **১০০**

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চারটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৭২ শতাংশ)। ১৫ শতাংশ রিপোর্ট শেষ পৃষ্ঠায় এবং ১৩ শতাংশ রিপোর্ট ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে দৈনিক বাংলা। এই সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার ৮০ শতাংশ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক ৭৮ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সংবাদ ৬৮ শতাংশ এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ অবজারভার ৬১ শতাংশ।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ অবজারভার। এই সংবাদপত্রে শেষ পৃষ্ঠায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার ২৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সংবাদ ১৭ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক ৯ শতাংশ এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে দৈনিক বাংলা ৮ শতাংশ।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে সংবাদ। এই সংবাদপত্রে ভেতরের পৃষ্ঠায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার ১৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সম্মিলিতভাবে দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার ১৩ শতাংশ করে। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে দৈনিক বাংলা ১২ শতাংশ।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি হারে প্রকাশ করেছে দৈনিক বাংলা। আর সবচেয়ে কম হারে প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ অবজারভার। বিপরীত দিকে নব্বইয়ের

গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট শেষ পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি হারে প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ অবজারভার। আর ভেতরের পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি হারে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট সংবাদ।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি হলেও এক্ষেত্রে সংখ্যাগত দিক থেকে দৈনিক ইত্তেফাকের অবস্থান শীর্ষে (৩১৫টি)। আর দৈনিক বাংলার অবস্থান তৃতীয় (২৭০)।

গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে চারটি সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ের রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। নিচের টেবিলে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট ও অন্যান্য বিষয়ের রিপোর্ট প্রকাশের হার যাচাই করা হয়েছে।

টেবিল-৩

প্রথম পৃষ্ঠায় গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক খবরের সংখ্যা ও হার

সংখ্যা ⇨ সংবাদপত্রের নাম ⇩	গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক খবর (সংখ্যা) (%)	অন্যান্য খবর (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
দৈনিক ইত্তেফাক	৩১৫ ৮০	৭৭ ২০	৩৯২ ১০০
দৈনিক বাংলা	২৭০ ৮৫	৪৯ ১৫	৩১৯ ১০০
সংবাদ	২৯০ ৮৩	৫৮ ১৭	৩৪৮ ১০০
বাংলাদেশ অবজারভার	১৯১ ৭৫	৬২ ২৫	২৫৩ ১০০
সর্বমোট	**১০৬৬** **৮১**	**২৪৬** **১৯**	**১৩১২** **১০০**

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চারটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী প্রথম পৃষ্ঠায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট ও অন্যান্য রিপোর্ট মিলিয়ে মোট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ১,৩১২টি। এর মধ্যে বেশির ভাগই অর্থাৎ ৮১ শতাংশ নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট। ১৯ শতাংশ অন্যান্য রিপোর্ট।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সব ক'টি সংবাদপত্রেই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হারই বেশি। তবে চারটি সংবাদপত্রের মধ্যে দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট রিপোর্টের মধ্যে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি

(৮৫ শতাংশ)। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সংবাদ (৮৩ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক (৮০ শতাংশ) এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ অবজারভার (৭৫ শতাংশ)।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট রিপোর্টের মধ্যে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলো প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই সময়ে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বেশির ভাগই রিপোর্টই ছিল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক । প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্যান্য রিপোর্টের তুলনায় দৈনিক বাংলায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই না, গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৪ দিনের সংবাদপত্রের মধ্যে দৈনিক বাংলায় তিনদিন কেবলমাত্র নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে। অন্য আর কোনো রিপোর্টই প্রকাশিত হয়নি। উল্লিখিত তিনদিনের মধ্যে একদিন ১৩টি, একদিন ১৭টি এবং একদিন ২০টি রিপোর্টের সবক'টিই ছিল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক। সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারেও উল্লিখিত ১৪ দিনের মধ্যে একদিন শুধু নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত দিন সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৯টি এবং বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ৯টি রিপোর্টের সবক'টিই ছিল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক। নিঃসন্দেহে বিষয়টি তৎপর্যপূর্ণ।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত চারটি সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক মোট ১,০৬৬টি রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উল্লিখিত রিপোর্টগুলোর ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে জানার জন্য নিচের টেবিলে রিপোর্টগুলো কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়ছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

টেবিল-৩

প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রিপোর্টের কলামভিত্তিক ট্রিটমেন্ট

কলাম সংখ্যা ⇨ / পত্রিকার নাম ⇩	সিঙ্গেল কলাম (সংখ্যা) (%)	ডাবল কলাম (সংখ্যা) (%)	তিন কলাম (সংখ্যা) (%)	চার কলাম (সংখ্যা) (%)	পাঁচ কলাম (সংখ্যা) (%)	ছয় কলাম (সংখ্যা) (%)	সাত কলাম (সংখ্যা) (%)	আট কলাম ব্যানার (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
দৈনিক ইত্তেফাক	২৪২ ৭৭	৫৪ ১৭	৭ ২	৭ ২	২ ১ (প্রায়)	- -	- -	৩ ১ (প্রায়)	৩১৫ ১০০
দৈনিক বাংলা	১৭৮ ৬৬	৫৭ ২১	১৯ ৭	৯ ৩	- -	১ ১ (প্রায়)	- -	৬ ২	২৭০ ১০০

কলাম সংখ্যা ⇨ / পত্রিকার নাম ⇩	সিঙ্গেল কলাম (সংখ্যা) (%)	ডাবল কলাম (সংখ্যা) (%)	তিন কলাম (সংখ্যা) (%)	চার কলাম (সংখ্যা) (%)	পাঁচ কলাম (সংখ্যা) (%)	ছয় কলাম (সংখ্যা) (%)	সাত কলাম (সংখ্যা) (%)	আট কলাম ব্যানার (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
সংবাদ	২০৭ ৭১	৫২ ১৮	১৮ ৬	৪ ১	২ ১ (প্রায়)	১ ১ (প্রায়)	- -	৬ ২	২৯০ ১০০
বাংলাদেশ অবজারভার	১৩০ ৬৮	৩৮ ২০	১২ ৬	৭ ৪	১ ১ (প্রায়)	১ ১ (প্রায়)	- -	২ ১	১৯১ ১০০
সর্বমোট	৭৫৭ ৭১	২০১ ১৯	৫৪ ৫	২৭ ২	৫ ১ (প্রায়)	৩ ১ (প্রায়)	- -	১৭ ২ (প্রায়)	১০৬৬ ১০০

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চারটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বেশির ভাগ অর্থাৎ ৭১ শতাংশ রিপোর্ট সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯ শতাংশ রিপোর্ট ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ৫ শতাংশ রিপোর্ট তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ২ শতাংশ রিপোর্ট আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ২ শতাংশ রিপোর্ট চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় ১ শতাংশ রিপোর্ট পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় ১ শতাংশ রিপোর্ট ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে দৈনিক ইত্তেফাক। এই সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশের হার ৭৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সংবাদ ৭১ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ অবজারভার ৬৮ শতাংশ এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে দৈনিক বাংলা ৬৬ শতাংশ।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে দৈনিক বাংলা। এই সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশের হার ২১ শতাংশ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ অবজারভার ২০ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সংবাদ ১৮ শতাংশ এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক ১৭ শতাংশ।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে দৈনিক বাংলা। এই সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশের হার ৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে যৌথভাবে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ অবজারভার ও সংবাদ। এই দু'টি সংবাদপত্রে ৬ শতাংশ রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক ২ শতাংশ।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ অবজারভার। এই সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশের হার ৪ শতাংশ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে দৈনিক বাংলা ৩ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক ২ শতাংশ এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে সংবাদ ১ শতাংশ।

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রায় ১ শতাংশ হারে। কিন্তু দৈনিক বাংলা কোনো নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশ করেনি।

দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রায় ১ শতাংশ হারে। কিন্তু দৈনিক ইত্তেফাক কোনো নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশ করেনি।

দৈনিক বাংলা ও সংবাদ ২ শতাংশ আর দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার ১ শতাংশ নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করেছে। তবে কোনো সংবাদপত্রই সাত কলাম শিরোনামে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেনি।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম ও ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। তবে সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী সংবাদপত্রগুলো প্রায় ১১ শতাংশ রিপোর্ট তিন কলাম শিরোনাম থেকে শুরু করে আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করেছে যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৪ দিনের সংবাদপত্রের মধ্যে দৈনিক বাংলা ও সংবাদে ৬ দিনই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে চারটি সংবাদপত্রেই প্রথম পৃষ্ঠায় চার, পাঁচ ও ছয়

কলাম শিরোনামে প্রকাশিত নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। ট্রিটমেন্টের বিবেচনায় এই সবই বিশেষ তৎপর্য বহন করে।

গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে চারটি সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলো বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য নিচের টেবিলে তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল-৪

প্রকাশিত রিপোর্টে সূত্রের ধরন

সূত্রের ধরন ⇨ / পত্রিকার নাম ⇩	নিজস্ব প্রতিবেদক (সংখ্যা) (%)	বাইলাইন (সংখ্যা) (%)	বার্তা সংস্থা (সংখ্যা) (%)	সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, প্রেসনোট ও তথ্য বিবরণী (সংখ্যা) (%)	উল্লেখ নেই (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
দৈনিক ইত্তেফাক	১৯১ ৪৭	৯ ২	৭৫ ১৯ (প্রায়)	৫৭ ১৪	৭২ ১৮ (প্রায়)	৪০৪ ১০০
দৈনিক বাংলা	১৫০ ৪৪	৫ ২ (প্রায়)	৮৫ ২৫	৪৪ ১৩	৫৪ ১৬	৩৩৮ ১০০
সংবাদ	১৬৬ ৩৯	১৮ ৪	৭৪ ১৭	৫২ ১২	১১৮ ২৮ (প্রায়)	৪২৮ ১০০
বাংলাদেশ অবজারভার	৮৬ ২৭	১ ১ (প্রায়)	২২৩ ৭১	৩ ১	১ ১ (প্রায়)	৩১৪ ১০০
সর্বমোট	**৫৯৩** **৪০**	**৩৩** **২**	**৪৫৭** **৩১**	**১৫৬** **১১ (প্রায়)**	**২৪৫** **১৬**	**১৪৮৪** **১০০**

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চারটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বেশির ভাগ অর্থাৎ ৪০ শতাংশ রিপোর্ট নিজস্ব প্রতিবেদকগণ পরিবেশন করেছেন। ৩১ শতাংশ রিপোর্ট বার্তা সংস্থা পরিবেশিত। প্রায় ১১ শতাংশ রিপোর্ট সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, প্রেসনোট বা তথ্য বিবরণীর ভিত্তিতে তৈরি করা। ২ শতাংশ রিপোর্ট বাইলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। আর ১৬ শতাংশ রিপোর্টে কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাক সবচেয়ে বেশি হারে (৪৭ শতাংশ) নিজস্ব প্রতিবেদকদের পরিবেশিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থান দৈনিক বাংলার (৪৪ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থান সংবাদের (৩৯ শতাংশ) এবং চতুর্থ অবস্থান বাংলাদেশ অবজারভারের (২৭ শতাংশ)।

বার্তা সংস্থা পরিবেশিত রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৭১ শতাংশ) প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ অবজারভার। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থান দৈনিক বাংলার (২৫ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থান দৈনিক ইত্তেফাকের (প্রায় ১৯ শতাংশ) এবং চতুর্থ অবস্থান সংবাদের (১৭ শতাংশ)।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, প্রেসনোট বা তথ্য বিবরণীর ভিত্তিতে তৈরি করা রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (১৪ শতাংশ) প্রকাশ করেছে দৈনিক ইত্তেফাক। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থান দৈনিক বাংলার (১৩ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থান সংবাদের (প্রায় ১২ শতাংশ) এবং চতুর্থ অবস্থান বাংলাদেশ অবজারভারের (১ শতাংশ)।

বাইলাইন রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৪ শতাংশ) প্রকাশ করেছে সংবাদ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থান দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলার (২ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থান বাংলাদেশ অবজারভারের (১ শতাংশের কম)।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই ছিল সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিবেদক পরিবেশিত। দৈনিক ইতেফাকে নিজস্ব প্রতিবেদক পরিবেশিত রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৪৭ শতাংশ) প্রকাশিত হয়েছে। সব সংবাদপত্রেই উল্লেখযোগ্য হারে বার্তা সংস্থার রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও বাংলাদেশ অবজারভারে বার্তা সংস্থার রিপোর্ট প্রকাশের হার অনেকগুণ বেশি (৭১ শতাংশ)। সংবাদপত্রগুলোতে যেসব বার্তা সংস্থার রিপোর্ট বেশি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি), এএফপি, পিটিআই, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা। সংবাদপত্রগুলোতে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট খুব কম হারে প্রকাশিত হলেও সংবাদে বাইলাইন রিপোর্ট প্রকাশে হার (৪ শতাংশ) অন্য সংবাদপত্রগুলোর চেয়ে বেশি। সংবাদে যাদের বাইলাইন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা হলেন: কাশেম হুমায়ূন, কামরুল ইসলাম চৌধুরী, আমীর খসরু, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মনজুরুল আহসান বুলবুল, কাজী বেলাল হোসেন, মোনাজাতউদ্দিন, মানিক সাহা, জিল্লুর রহমান, নূরুর রহমান। দৈনিক ইত্তেফাকে যাদের বাইলাইন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা হলেন: মতিউর রহমান চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আকতার ইউসুফ, রেজানুর রহমান, মইনুল আলম। দৈনিক বাংলায় যাদের বাইলাইন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা হলেন: খায়রুল আনোয়ার, আবদাল আহমদ, মোয়াজ্জেম হোসেন, ইমামউদ্দীন মুক্তা। বাংলাদেশ অবজারভারে শুধু একটি বাইলাইন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আর যার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তিনি হলেন: ইকবাল সোবহান চৌধুরী।

গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে চারটি সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর ঘটনাস্থল সংক্রান্ত তথ্য নিচের টেবিলে তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল-৫

খবরের ঘটনাস্থল

ঘটনাস্থল ⇨ পত্রিকার নাম ⇩	ঢাকা (সংখ্যা) (%)	ঢাকার বাইরে (সংখ্যা) (%)	দেশের বাইরে (সংখ্যা) (%)	মোট (সংখ্যা) (%)
দৈনিক ইত্তেফাক	৩৫৬ ৮৮	৪০ ১০	৮ ২	৪০৪ ১০০
দৈনিক বাংলা	৩১২ ৯২	১২ ৪ (প্রায়)	১৪ ৪	৩৩৮ ১০০
সংবাদ	৩৮৩ ৮৯	৩৭ ৯	৮ ২	৪২৮ ১০০
বাংলাদেশ অবজারভার	২৮০ ৮৯	২০ ৬	১৪ ৫ (প্রায়)	৩১৪ ১০০
সর্বমোট	**১৩৩১** **৯০**	**১০৯** **৭**	**৪৪** **৩**	**১৪৮৪** **১০০**

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চারটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বেশির ভাগ অর্থাৎ ৯০ শতাংশ রিপোর্টের ঘটনাস্থল ছিল ঢাকা। ৭ শতাংশ রিপোর্টের ঘটনাস্থল ছিল ঢাকার বাইরে। ৩ শতাংশ রিপোর্টের ঘটনাস্থল ছিল দেশের বাইরে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, চারটি সংবাদপত্রের মধ্যে ঘটনাস্থল ঢাকা এমন খবরের হার দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি (৯২ শতাংশ) ছিল। এ ক্ষেত্রে সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারের হার ছিল ৮৯ শতাংশ। দৈনিক ইত্তেফাকের হার ছিল ৮৮ শতাংশ।

ঘটনাস্থল ঢাকার বাইরে এমন খবরের হার দৈনিক ইত্তেফাকে সবচেয়ে বেশি (১০ শতাংশ) ছিল। এ ক্ষেত্রে সংবাদের হার ছিল ৯ শতাংশ। বাংলাদেশ অবজারভারের হার ছিল ৬ শতাংশ এবং দৈনিক বাংলার হার প্রায় ৪ শতাংশ।

ঘটনাস্থল দেশের বাইরে এমন খবরের হার বাংলাদেশ অবজারভারে সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৫ শতাংশ) ছিল। এ ক্ষেত্রে দৈনিক বাংলার হার ছিল ৪ শতাংশ। দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদের হার ২ শতাংশ করে।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, চারটি সংবাদপত্রেই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বেশির ভাগ রিপোর্টের ঘটনাস্থল ছিল ঢাকা। ঘটনাস্থল

ঢাকা এমন খবরের হার দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি হলেও এক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হারও প্রায় দৈনিক বাংলার কাছাকাছি। ঘটনাস্থল ঢাকার বাইরে এমন খবরের হার সংবাদে সবচেয়ে বেশি। আর ঘটনাস্থল ঢাকার বাইরে এমন খবরের হার বাংলাদেশ অবজারভারে সবচেয়ে বেশি।

গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে চারটি সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট রিপোর্টগুলোর বিষয় সংক্রান্ত তথ্য নিচের টেবিলে তুলে ধরা হয়েছে।

টেবিল-৬

প্রকাশিত রিপোর্টের বিষয়

পত্রিকার নাম / বিষয়	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	দৈনিক বাংলা (সংখ্যা) (%)	সংবাদ (সংখ্যা) (%)	বাংলাদেশ অবজারভার (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
বিচারপতি সাহাবুদ্দিন	৪৬ ১১	৫০ ১৫	৪৬ ১১	৪৪ ১৪	১৮৬ ১২
শেখ হাসিনা	১৫ ৪	২০ ৬	২৬ ৬	২৮ ৯	৮৯ ৬
খালেদা জিয়া	২১ ৫	১৭ ৫	২৫ ৬	২৯ ৯	৯২ ৬
তিন জোট এবং আটদল, সাতদল ও পাঁচদল	৩৪ ৮	৩৫ ১০	২৬ ৬	২৫ ৮	১১০ ৭
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা	৭১ ১৭	৪৬ ১৪	৩৮ ৯	২৩ ৮ (প্রায়)	১৭৮ ১২
জামায়াতে ইসলামী	১৫ ৪	১৩ ৪	৪ ১ (প্রায়)	১১ ৩	৪৩ ৩
ছাত্র সংগঠন ও নেতা	১৯ ৫	১৯ ৬	১০ ২	১০ ৩	৫৮ ৪
পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন	৩৯ ১০	৩২ ৯	৬৬ ১৫	৩১ ১০	১৬৮ ১১
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা	১১ ৩	৯ ৩	১৪ ৩	৮ ৩ (প্রায়)	৪২ ৩
সরকারি ঘোষণা, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত	২০ ৫	১৭ ৫	১৭ ৪	১৫ ৫	৬৯ ৫
এরশাদ ও তার সহযোগী	২৭ ৭	১৯ ৬	৫৮ ১৩	২১ ৭	১২৫ ৮
বিজয় উৎসব ও বিজয় মিছিল	২৮ ৭	২২ ৬	৩৪ ৮	৩০ ১০	১১৪ ৮

পত্রিকার নাম / বিষয়	দৈনিক ইত্তেফাক (সংখ্যা) (%)	দৈনিক বাংলা (সংখ্যা) (%)	সংবাদ (সংখ্যা) (%)	বাংলাদেশ অবজারভার (সংখ্যা) (%)	সর্বমোট (সংখ্যা) (%)
হামলা, হাঙ্গামা, আহত, নিহত ও প্রহৃত	১২ ৩	৭ ২	১০ ২	৭ ২	৩৬ ২
নিয়োগ, অপসারণ, রদবদল, ওএসডি ও পদত্যাগ	৯ ২	১২ ৩	১২ ৩	৭ ২	৪০ ৩
নির্বাচন	১৬ ৪	১৭ ৫	১৬ ৪	৭ ২	৫৬ ৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু	৭ ২	৩ ১ (প্রায়)	৬ ১	৭ ২	২৩ ২
অন্যান্য	১৪ ৩	১০ ৩	২০ ৫	১১ ৩	৫৫ ৪
মোট	**৪০৪** **১০০**	**৩৩৮** **১০০**	**৪২৮** **১০০**	**৩১৪** **১০০**	**১৪৮৪** **১০০**

উপরের টেবিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চারটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের রিপোর্টগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট। এই দুই বিষয়ের রিপোর্ট ছিল **১২** শতাংশ করে। অন্য রিপোর্টগুলোর মধ্যে পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার ছিল **১১** শতাংশ। এরশাদ ও তাঁর সহযোগী এবং বিজয় উৎসব ও বিজয় মিছিল বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার ৮ শতাংশ করে। তিন জোট এবং আটদল, সাতদল ও পাঁচদল সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রকাশের হার ৭ শতাংশ। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার ৬ শতাংশ করে। সরকারি ঘোষণা, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার ৫ শতাংশ। তিন রাজনৈতিক জোট, ছাত্র সংগঠন ও নেতা এবং নির্বাচন বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার ৪ শতাংশ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, জামায়াতে ইসলামী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক নিয়োগ, অপসারণ, রদবদল, ওএসডি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার ৩ শতাংশ করে। হামলা, হাঙ্গামা, আহত, নিহত ও প্রহৃত এবং গণঅভ্যুত্থানের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশের হার ২ শতাংশ করে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের রিপোর্টগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা সংশ্লিষ্ট

রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (১৭ শতাংশ) প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (১১ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (১০ শতাংশ)। চতুর্থ অবস্থান তিন জোট এবং আটদল, সাতদল ও পাঁচদল সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৮ শতাংশ)। পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে মিলিতভাবে এরশাদ ও তার সহযোগী এবং বিজয় উৎসব ও বিজয় মিছিল সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৭ শতাংশ করে)। ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে মিলিতভাবে খালেদা জিয়া, ছাত্র সংগঠন ও নেতা এবং সরকারি ঘোষণা, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৫ শতাংশ করে)। সপ্তম অবস্থানে রয়েছে মিলিতভাবে শেখ হাসিনা ও জামায়াতে ইসলামী সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৪ শতাংশ করে)।

দৈনিক বাংলায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের রিপোর্টগুলোর মধ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (১৫ শতাংশ) প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (১৪ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে তিন জোট এবং আটদল, সাতদল ও পাঁচদল সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (১০ শতাংশ)। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৯ শতাংশ)। পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে মিলিতভাবে শেখ হাসিনা, এরশাদ ও তার সহযোগী, বিজয় উৎসব ও বিজয় মিছিল এবং ছাত্র সংগঠন ও নেতা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৬ শতাংশ করে)। ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে মিলিতভাবে খালেদা জিয়া, সরকারি ঘোষণা, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৫ শতাংশ করে)।

সংবাদে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের রিপোর্টগুলোর মধ্যে পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (১৫ শতাংশ) প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এরশাদ ও তার সহযোগী সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (১৩ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (১১ শতাংশ)। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৯ শতাংশ)। পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে বিজয় উৎসব ও বিজয় মিছিল সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৮ শতাংশ করে)। ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে মিলিতভাবে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া এবং তিন জোট এবং আটদল, সাতদল ও পাঁচদল সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৬ শতাংশ করে)।

বাংলাদেশ অবজারভারে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের রিপোর্টগুলোর মধ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (১৪ শতাংশ) প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (১০ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে শেখ হাসিনা

ও খালেদা জিয়া সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৯ শতাংশ করে)। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে তিন জোট এবং আটদল, সাতদল ও পাঁচদল সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৮ শতাংশ)। পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে এরশাদ ও তার সহযোগী সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (৭ শতাংশ করে)।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, চারটি সংবাদপত্রেই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই সব রিপোর্টের মধ্যে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের বক্তব্য ও কার্যক্রম, বিভিন্ন পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকাণ্ড, এরশাদের পদত্যাগের পর তার ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি, গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর বিজয় উৎসব ও বিজয় মিছিল, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াসহ তিন রাজনৈতিক জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতার বিভিন্ন কর্মতৎপরতা এবং বিভিন্ন পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকাণ্ড বিষয়ক রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

■■■

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা প্রশ্নের ফলাফল

এই অধ্যায়ে গবেষণাকর্মে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে গবেষণা প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন: এক

ঘটনার গুরুত্বের কারণে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সংশ্লিষ্ট খবরের মাধ্যমে সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ:

সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান শীর্ষক এই গবেষণাকর্মের আওতাধীন সময় ছিল: ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। উল্লিখিত সময়ের সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পর ৫ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোটের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়। পরদিন ৬ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবরটি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। পাশাপাশি সংবাদপত্রে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, পাঁচ দলীয় জোট, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবরগুলো গুরুত্ব পায়। এছাড়া গণঅভ্যুত্থানের পর জনতার আনন্দ-উল্লাস বিষয়ক খবরগুলোও বিশেষত্ব লাভ করে।

১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এই খবরে জানানো হয় যে, প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করার পর তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর আগে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদ বাতিল করা হয়। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিনের অন্য খবরগুলোর মধ্যে ছিল: অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের বক্তব্য, তিন জোটের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করা, জনতার আনন্দ-উল্লাস

প্রকাশ, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্য ও কর্মতৎপরতাসহ অন্য খবর।

১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট কয়েকটি রিপোর্ট তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এর মধ্যে ছিল: জাতির উদ্দেশে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের ভাষণ এবং তিন জোটের সভায় জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার দাবি। এছাড়া এদিনও শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্য ও কর্মতৎপরতাসহ অন্যান্য খবরও প্রকাশিত হয়।

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের তিন জোটে জায়গা না দেওয়ার সিদ্ধান্তের খবর গুরুত্ব পায়। এছাড়া ছিল: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ছয় উপদেষ্টার নাম ঘোষণা, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বিজয় উৎসবসহ অন্য খবর।

১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে বিজয় উপলক্ষ্যে সাত দলীয় জোটের বিজয় মিছিলের খবর গুরুত্ব পায় সংবাদপত্রে। এছাড়া এদিন আরও তিনজন উপদেষ্টা নিয়োগ ও বিবিসি রেডিওর সঙ্গে জেনারেল এরশাদের সাক্ষাৎকার বিষয়ক একটি খবরও প্রকাশিত হয়।

গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোট সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করে এবং এইসব বৈঠকে জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানানো হয়। পরদিন ১১ ডিসেম্বর খবরটি সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে।

জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি অব্যাহত থাকার প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বরের খবরের কাগজে। তিন রাজনৈতিক জোট ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবী জানানো হয়।

১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার ১৫ জন সহযোগীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারি করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এদিনের খবরের কাগজে গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল এরশাদ সরকারের পতন উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের বিজয় মিছিল সংক্রান্ত একটি খবরটিও প্রকাশিত হয়।

জেনারেল এরশাদ গ্রেপ্তার হওয়ার পরদিন ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর তার সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গ্রেপ্তার হন। একইসঙ্গে এরশাদের অন্য সহযোগীদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় ১৯৯১ সালের ২ মার্চ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। পরদিন ১৫ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরদিনই ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলসহ নানা অভিযোগ তদন্তের বিষয়ে গণদাবির পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯০ সালের ১৭ ডিসেম্বর এ ব্যাপারে একটি প্রেসনোট জারি করা হয়। পরদিন ১৮ ডিসেম্বর এই প্রেসনোট ভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে গুরুত্ব পায়।

পরদিনই অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য বিচারপতি আনসার উদ্দীনকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হয়। ১৯ ডিসেম্বর এই খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে।

পূর্ব ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখ ১৯৯০ সালের ২ মার্চ পবিত্র শবে বরাত হওয়ায় নির্বাচনের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এই খবরটি ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে।

এই বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, জাতীয় জীবনে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আর তাই গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরের ঘটনাবলি সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ও প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত চারটি সংবাদপত্রেই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সংশ্লিষ্ট খবরের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

গবেষণা প্রশ্ন: দুই

সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ

খবর উপস্থাপন বা খবরের ট্রিটমেন্টের বিষয়টি দুটি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এর একটি হচ্ছে: খবরটি কোন্ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রচলিত নিয়মে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রথম পৃষ্ঠায়, এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ খবর শেষ পৃষ্ঠায় এবং এর চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ খবর ভেতরের পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হয়। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। চারটি সংবাদপত্রের সম্মিলিত হিসাব অনুযায়ী নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৭২ শতাংশ)। ১৫ শতাংশ রিপোর্ট শেষ পৃষ্ঠায় এবং ১৩ শতাংশ রিপোর্ট ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট রিপোর্টের মধ্যে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলো প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই সময়ে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের রিপোর্টের মধ্যে বেশির ভাগ রিপোর্টই ছিল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্যান্য রিপোর্টের তুলনায় দৈনিক বাংলায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৪ দিনের সংবাদপত্রের মধ্যে দৈনিক বাংলায় তিনদিন কেবল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে। অন্য আর কোনো রিপোর্টই প্রকাশিত হয়নি। উল্লিখিত তিনদিনের মধ্যে একদিন ১৩টি, একদিন ১৭টি এবং একদিন ২০টি রিপোর্টের সবকটিই ছিল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক। সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারেও উল্লিখিত ১৪ দিনের মধ্যে একদিন শুধু নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত দিন সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৯টি এবং বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ৯টি রিপোর্টের সবকটিই ছিল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক। নিঃসন্দেহে বিষয়টি তৎপর্যপূর্ণ।

খবর উপস্থাপন বা খবরের ট্রিটমেন্ট যাচাইয়ের অপর পদ্ধতিটি হচ্ছে প্রকাশিত খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা। প্রচলিত নিয়মে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনাম হচ্ছে সর্বোচ্চ ট্রিটমেন্ট। এরপর সাধারণত ট্রিটমেন্টের ক্রম নির্ধারিত হয় সাত কলাম, ছয় কলাম, পাঁচ কলাম, চার কলাম, তিন কলাম, ডাবল কলাম ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম হিসেবে। অনেক সময় বক্স আইটেম বা লিড আইটেম করে খবরের গুরুত্ব বাড়ানো হয়। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট

খবর প্রকাশের ক্ষেত্রেও এই নজির রয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর প্রায় ১১ শতাংশ তিন কলাম থেকে শুরু করে আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাকি রিপোর্টগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম ও ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

এই বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল।

গবেষণা প্রশ্ন: তিন

সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ

সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে খবর উপস্থাপনাকে ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনা হিসেবে গণ্য করা হয়। গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৪ দিনের মধ্যে দৈনিক বাংলা ও সংবাদ ৬ দিনই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট একটি করে রিপোর্ট আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করেছে। আর দৈনিক ইত্তেফাক ৩দিন এবং বাংলাদেশ অবজারভার ২দিন নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট একটি করে রিপোর্ট আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাকে তিনটি আট কলাম ব্যানার শিরোনামের রিপোর্টের মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের পদত্যাগ : জনতার বিজয় উল্লাস'। একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ অন্তরীণ'। অপর রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ ও তাহার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত'।

দৈনিক বাংলায় ছয়টি আট কলাম ব্যানার শিরোনামের রিপোর্টের মধ্যে তিনটি একটানা তিনদিন প্রকাশিত হয়। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদের পদত্যাগ : জনতার বিজয়োল্লাস'। দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'মন্ত্রিসভা ও সংসদ বাতিল : এরশাদের আনুষ্ঠানিক পদত্যাগ'। তৃতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল:

'নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই মুখ্য দায়িত্ব : গণতন্ত্র কায়েমে সবাই অবদান রাখুন : সাহাবুদ্দিন'। অপর তিনটি রিপোর্টের মধ্যে একটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'মওদুদ জাফরসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে আটকাদেশ: এরশাদ অন্তরীণ'। একটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হবে : ২রা মার্চ সংসদ নির্বাচন'। অপর রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'সম্পত্তির তালিকা তৈরীর পদক্ষেপ : এরশাদের দুর্নীতি তদন্তে কমিটি'।

সংবাদে ছয়টি আট কলাম ব্যানার শিরোনামের রিপোর্টের মধ্যে দুটি পর পর দুদিন প্রকাশিত হয়। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'তিন জোটের ঘোষণা : উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন মনোনীত'। দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর : অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের দায়িত্ব গ্রহণ'। অপর চারটি রিপোর্টের মধ্যে প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'গুলশানের একটি বাড়িতে স্থানান্তর : এরশাদ অন্তরীণ'। দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: '২রা মার্চ সংসদ নির্বাচন'। তৃতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'এরশাদ ও মন্ত্রীদের দুর্নীতি তদন্তে কমিটি'। চতুর্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'সময়সূচীর অন্যান্য তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে : ২৭ ফেব্রুয়ারী সংসদ নির্বাচন'।

বাংলাদেশ অবজারভারে দুটি আট কলাম ব্যানার শিরোনামের রিপোর্ট পর পর দুদিন প্রকাশিত হয়। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'Justice Shahabuddin nominated as Vice-President : Emergency gose : ERSHAD TO STEP DOWN' দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর। শিরোনাম ছিল: 'Parliament, Cabinet dissolved : Ershad goes : Justice Shahabuddin takes over as Acting President'।

অন্যদিকে চারটি সংবাদপত্রেই প্রথম পৃষ্ঠায় চার, পাঁচ ও ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। ট্রিটমেন্টের বিবেচনায় এই সবই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

এই বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল

গবেষণা প্রশ্নঃ চার

সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর একাধিক দিন গুরুত্ব পেয়ে থাকলে সে বিষয়ে একাধিক দিন একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ

গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট মোট ৫৬টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দৈনিক বাংলা ও সংবাদ ১৬টি করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। আর দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার ১২টি করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। শুধু তাই না, সংবাদপত্রগুলোতে একইদিন একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশের নজিরও রয়েছে।

গবেষণা প্রশ্নঃ পাঁচ

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিশেষত্বের কারণে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ

গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে দুটি সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশের নজির রয়েছে। সংবাদপত্র দুটি হচ্ছেঃ দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। দুটি সংবাদপত্রই ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিলঃ 'গণতন্ত্রের জয় জনতার জয়'। এই সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে সংহত করে সুন্দর ভবিষ্যত নির্মিত হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

আর বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিলঃ 'The Need Of The Hour'। এই সম্পাদকীয়তে স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য তাদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি মন্তব্য করা হয় যে, ছাত্রদের সম্মিলিত সংহতি দ্বারা শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি গণআন্দোলনকে দ্রুত গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করে বিজয় এনে দিয়েছে।

গবেষণা প্রশ্নঃ ছয়

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছিল কি?

বিশ্লেষণ

গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত চারটি সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট সর্বমোট ৬৪টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সংবাদে ৩২টি, বাংলাদেশ অবজারভারে ১৬টি, দৈনিক ইত্তেফাকে ১২টি এবং দৈনিক বাংলায় ৪টি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই সব চিঠিতে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠকরা তাদের অভিমত ব্যক্ত করার পাশাপাশি নানা দাবি ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

■■■

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন সেই সময়ের দেশের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের পর পরই ছাত্র সমাজ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোটভুক্ত হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে। বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনও আন্দোলনে শরিক হয়। তবে ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘ আন্দোলনে নানা উত্থান-পতন ঘটে। জেনারেল এরশাদ আন্দোলন দমনের নানা অপচেষ্টা চালায়। নব্বইয়ের ডিসেম্বরে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল এরশাদের দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে ।

স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই গণআন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে কাজ করেছে সংবাদপত্র। এরশাদ সরকার নানা পদ্ধতিতে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টা চালায়। নানা কালাকানুন প্রয়োগ করে। কিন্তু স্বৈরশাসনের নানা বিধিনিষেধ, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সংবাদপত্র গণআন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এজন্য সংবাদপত্রকে অনেক সময় নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে।

গণআন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর এরশাদ সরকার দেশে জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে সংবাদপত্রে আন্দোলনের খবর প্রকাশের ওপর কঠোর সেন্সরশিপ আরোপ করে। এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা অবিরাম ধর্মঘট শুরু করেন। সাংবাদিকরা সিদ্ধান্ত নেন যে, জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। ধর্মঘটের ফলে ২৮ নভেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে যায় সংবাদপত্রের প্রকাশনা। একটানা আট দিন দেশে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। অবশেষে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের পর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পুনরায় সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু হয়। গণআন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ থাকায় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তীব্র গণরোষের প্রতিফলন ঘটেনি বাংলাদেশের

সংবাদপত্রে। এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এই গবেষণাকর্মে। এই গবেষণাকর্মে সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন যাচাই করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করা হয়েছে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সংশ্লিষ্ট খবরের উপস্থাপন-প্রবণতা। পাশাপাশি সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ, কলাম ও পাঠকের চিঠি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের একটি চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সংবাদপত্রে গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবরগুলোর বিষয়বস্তু প্রধানত ছিল:

এক. জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা;

দুই. ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে তিন রাজনৈতিক জোটের সর্বসম্মত মনোনয়ন;

তিন. বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর;

চার. বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের বক্তব্য ও ভাষণ;

পাঁচ. দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে বিভিন্ন মহলের অভিনন্দন;

ছয়. জনতার উল্লাস ও বিজয় উৎসব;

সাত. তিন জোটের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত;

আট. শেখ হাসিনার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য;

নয়. খালেদা জিয়ার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য;

দশ. পাঁচ দলীয় জোটের কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য;

এগারো. জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য;

বারো. সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য;

তেরো. জেনারেল এরশাদের বক্তব্য;

চৌদ্দ. জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি;

পনেরো. জেনারেল এরশাদ অন্তরীণ;

ষোলো. জেনারেল এরশাদের অন্য সহযোগীদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ান জারি;

সতেরো. ১৯৯১ সালের ২ মার্চ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তফসিল ঘোষণা;

আঠারো. জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলসহ নানা অভিযোগ তদন্তের জন্য বিচারপতি আনসার উদ্দীনকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন ও

উনিশ. পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পুনর্নির্ধারণ।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সংবাদপত্র প্রকাশনা শুরু হয়। প্রকাশনা শুরুর পরবর্তী দুসপ্তাহ সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক আধেয়র মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশের হার ছিল সবচেয়ে বেশি (৯১ শতাংশ)। এই সময়ে শুধু নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট রিপোর্টই নয়, পাশাপাশি এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। নিয়মিত কলামগুলোতে গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি সংবাপত্রে প্রকাশিত চিঠিতেও পাঠকরা চিঠি লিখে এই বিষয়ে তাদের বিভিন্ন অভিমত, পরামর্শ ও দাবি তুলে ধরেছেন।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী দুসপ্তাহজুড়ে গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই না, এই সময়ে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্য সব রিপোর্টের মধ্যে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলো প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্যান্য রিপোর্টের তুলনায় দৈনিক বাংলায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৪ দিনের সংবাদপত্রের মধ্যে দৈনিক বাংলায় তিনদিন কেবল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে। অন্য আর কোনো রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। উল্লিখিত তিনদিনের মধ্যে একদিন ১৩টি, একদিন ১৭টি এবং একদিন ২০টি রিপোর্টের সবকটিই ছিল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক। সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারেও উল্লিখিত ১৪ দিনের মধ্যে একদিন শুধু নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত দিন সংবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৯টি এবং বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ৯টি রিপোর্টের সবকটিই ছিল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক। নিঃসন্দেহে বিষয়টি তৎপর্যপূর্ণ।

গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর প্রায় ১১ শতাংশ তিন কলাম থেকে শুরু করে আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে খবর উপস্থাপনাকে ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনা হিসেবে গণ্য করা হয়। গবেষণাকর্মের

অন্তর্ভুক্ত ১৪ দিনের মধ্যে দৈনিক বাংলা ও সংবাদ ছয়দিনই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট একটি করে রিপোর্ট আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করেছে। আর দৈনিক ইত্তেফাক তিনদিন এবং বাংলাদেশ অবজারভার দুইদিন নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট একটি করে রিপোর্ট আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে চারটি সংবাদপত্রেই প্রথম পৃষ্ঠায় তিন থেকে ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সময়ে দৈনিক ইত্তেফাকে ৯ দিন নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট একটি করে রিপোর্ট চার অথবা পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক বাংলায় আটদিন নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট একটি করে রিপোর্ট চার অথবা ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদে সাতদিন নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট একটি করে রিপোর্ট তিন থেকে ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ অবজারভারে ৯ দিন নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট একটি করে রিপোর্ট তিন থেকে ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। ট্রিটমেন্টের বিবেচনায় এই সবই বিশেষ তৎপর্য বহন করে।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্টগুলোর বেশির ভাগই ছিল সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিবেদক পরিবেশিত। দৈনিক ইতেফাকে নিজস্ব প্রতিবেদক পরিবেশিত রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি হারে (৪৭ শতাংশ) প্রকাশিত হয়েছে। সব সংবাদপত্রেই উল্লেখযোগ্য হারে বার্তা সংস্থার রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও বাংলাদেশ অবজারভারে বার্তা সংস্থার রিপোর্ট প্রকাশের হার অনেকগুণ বেশি (৭১ শতাংশ)। সংবাদপত্রগুলোতে যেসব বার্তা সংস্থার রিপোর্ট বেশি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি), এএফপি, পিটিআই, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা। সংবাদপত্রগুলোতে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক রিপোর্ট খুব কম হারে প্রকাশিত হলেও সংবাদে বাইলাইন রিপোর্ট প্রকাশে হার (৪ শতাংশ) অন্য সংবাদপত্রগুলোর চেয়ে বেশি। সংবাদে যাদের বাইলাইন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তারা হলেন: কাশেম হুমায়ূন, কামরুল ইসলাম চৌধুরী, আমীর খসরু, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মনজুরুল আহসান বুলবুল, কাজী বেলাল হোসেন, মোনাজাতউদ্দিন, মানিক সাহা, জিল্লুর রহমান, নূরুর রহমান। দৈনিক ইত্তেফাকে যাদের বাইলাইন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তারা হলেন: মতিউর

রহমান চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আকতার ইউসুফ, রেজানুর রহমান, মইনুল আলম। দৈনিক বাংলায় যাদের বাইলাইন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তারা হলেন: খায়রুল আনোয়ার, আবদাল আহমদ, মোয়াজ্জেম হোসেন, ইমামউদ্দীন মুক্তা। বাংলাদেশ অবজারভারে শুধু একটি বাইলাইন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আর যার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তিনি হলেন: ইকবাল সোবহান চৌধুরী।

সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বেশির ভাগ রিপোর্টের ঘটনাস্থল ছিল ঢাকা। ঘটনাস্থল ঢাকা এমন খবরের হার দৈনিক বাংলায় সবচেয়ে বেশি হলেও এক্ষেত্রে অন্য সংবাদপত্রগুলোর হারও প্রায় দৈনিক বাংলার কাছাকাছি। ঘটনাস্থল ঢাকার বাইরে এমন খবরের হার সংবাদে সবচেয়ে বেশি। আর ঘটনাস্থল ঢাকার বাইরে এমন খবরের হার বাংলাদেশ অবজারভারে সবচেয়ে বেশি।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই সব রিপোর্টের মধ্যে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের বক্তব্য ও কার্যক্রম, বিভিন্ন পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকাণ্ড, এরশাদের পদত্যাগের পর তার ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি, গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর বিজয় উৎসব ও বিজয় মিছিল, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াসহ তিন রাজনৈতিক জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা এবং বিভিন্ন পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকাণ্ড বিষয়ক রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর প্রকাশনা শুরুর পরবর্তী তিনদিন গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট অভিন্ন বিষয়বস্তুর কিছু খবর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর চারটি পত্রিকায় অভিন্ন বিষয়বস্তুর খবরগুলো ছিল:

এক. জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত;

দুই. শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা;

তিন. খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা;

চার. জনতার উল্লাস;

এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত বিষয়ক খবরটি চারটি পত্রিকায়ই গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট

অন্য সব খবরের তুলনায় বেশি গুরুত্ব লাভ করে এবং তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে। এই খবরে জানানো হয়, ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল এরশাদ ১৯৯০ সালের ৫ ডিসেম্বর ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছেন। আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোট প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেছেন। ৬ ডিসেম্বর তার কাছে জেনারেল এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

বাকি তিনটি খবরের মধ্যে শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতার খবরে জানানো হয়, তিনি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার এবং গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে সংহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। আর খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিনি বলেছেন গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে সংহত করে সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে হবে। তিনি বিজয়-উচ্ছ্বাসের নামে আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে জনতার উল্লাস বিষয়ক খবরে জানানো হয়: জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ে নানা শ্রেণি পেশার মানুষ। রাজধানীর মানুষ ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। আনন্দে উল্লসিত জনতা রাজপথ মিছিল-স্লোগানে মুখর করে তোলে। আনন্দ-উল্লাসে বিচ্ছিন্ন ছিল না শিশু কিংবা মহিলা, নবীন কিংবা প্রবীণ কেউই।

পাঁচ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যও ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর আলাদা আইটেম হিসেবে তিনটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। পাঁচ দলীয় জোটের বক্তব্যভিত্তিক খবরে জানানো হয়, এই জোটের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এরশাদবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় এখনো অর্জিত হয়নি। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবরে জানানো হয়, জামায়াতে ইসলামীও বলেছে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য এখনো আসেনি। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পর এই সাফল্য আসবে। অপরদিকে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্যভিত্তিক খবর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর আলাদা আইটেম হিসেবে দুটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এতে জানানো হয়, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এরশাদবিরোধী আন্দোলনের বিজয়কে অর্থবহ করার জন্য বিজয়কে সুসংহত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট অভিন্ন বিষয়বস্তুর খবরগুলো ছিল:

এক. বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর;

দুই. বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের বক্তব্য;

তিন. বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে বিভিন্ন মহলের অভিনন্দন;

চার. তিন জোটের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত;

পাঁচ. শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা;

ছয়. খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা;

সাত. সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা ও

আট. জনতার আনন্দ-উল্লাস।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক খবরটি তিনটি পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকা তিনটি হলো দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক জেনারেল এরশাদের পদত্যাগ বিষয়ক খবরটিকে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে। তিনটি পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত উক্ত খবরে জানানো হয়: ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বাকি ছয়টি খবরের মধ্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের বক্তব্যভিত্তিক খবরে জানানো হয়: তিনি যত দ্রুত সম্ভব একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন এবং এজন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জেনারেল এরশাদের পদত্যাগকে গণতন্ত্রের জন্য বিজয় হিসেবে অভিহিত করেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন বিষয়ক খবরে জানানো হয়, অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা ও সর্বস্তরের মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিন জোটের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত বিষয়ক খবরে জানানো হয়, আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের এক যুক্ত ঘোষণায় এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সকল কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিনি আশা প্রকাশ করেছেন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনে সক্ষম হবে। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। অন্যদিকে খালেদা জিয়ার

বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিনি এরশাদবিরোধী আন্দোলনের বিজয়কে সুসংহত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বলেছেন, গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনে জনগণকে সর্তক থাকতে হবে। তিনি এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচার দাবি করেন। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্যভিত্তিক খবরে জানানো হয়, তারা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতে গিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচার দাবি করেছেন। অপরদিকে জনতার আনন্দ-উল্লাস বিষয়ক খবরে জানানো হয়, গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের প্রেক্ষাপটে সারাদেশে আনন্দ-উৎসব ও বিজয়-উল্লাস প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। ঐদিন অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবর তিনটি পত্রিকায় আলাদা আইটেম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়: এই দল জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচার দাবি করেছে।

১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর চারটি পত্রিকায় গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট অভিন্ন বিষয়বস্তুর খবরগুলো ছিল:

এক. জাতির উদ্দেশে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের ভাষণ;

দুই. তিন জোটের সভায় জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার দাবি;

তিন. শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা;

চার. খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা;

পাঁচ. সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা।

জাতির উদ্দেশে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের ভাষণ বিষয়ক খবরটি চারটি পত্রিকায়ই গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট অন্য সব খবরের তুলনায় বেশি গুরুত্ব পায় এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। এই খবরে জানানো হয়, জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবাইকে একযোগে কাজ করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

বাকি চারটি খবরের মধ্যে তিন জোটের সভায় জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার দাবি বিষয়ক খবরে জানানো হয়, আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের যৌথসভায় জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচার এবং তাদের দেশত্যাগ নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে। শেখ হাসিনার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য বিষয়ক খবরে জানানো হয়: তিনি জেনারেল

এরশাদের নেতৃত্বাধীন দল জাতীয় পার্টি নেতাদের আশ্রয় না দেওয়ার জন্য এরশাদবিরোধী আন্দোলনে জড়িত দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি জনগণকে যে কোনো মূল্যে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান। অন্যদিকে খালেদা জিয়ার কর্মতৎপরতা ও বক্তব্য বিষয়ক খবরে জানানো হয় : এরশাদবিরোধী আন্দোলনে বিজয় উপলক্ষ্যে তিনি বিএনপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত করেছেন। অপর দিকে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বক্তব্য ও কর্মতৎপরতা বিষয়ক খবরে জানানো হয়: তারাও এরশাদ ও তার সহযোগীদের কোনো গণতান্ত্রিক দলে আশ্রয় না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ঐদিন অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্যভিত্তিক খবরে জানানো হয়, তারা সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সকলকে ধৈর্য্য, সংযম ও সহনশীলতার সঙ্গে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট তিনটি খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব পায় যার বিষয়বস্তু ছিল:

এক. জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের তিন জোটে আশ্রয় না দেয়ার সিদ্ধান্ত;

দুই. অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় উপদেষ্টার নাম ঘোষণা;

তিন. সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বিজয় উৎসব।

এরশাদ ও তার সহযোগীদের তিন জোটে আশ্রয় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিষয়ক খবরে জানানো হয়, তিন জোটের যুক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এরশাদ সরকারের কাউকে আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত কোনো দলে আশ্রয় দেওয়া হবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় উপদেষ্টার নাম ঘোষণা বিষয়ক খবরে জানানো হয়: অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের জন্য ছয়জন উপদেষ্টার নাম ঘোষণা করেছেন। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বিজয় উৎসব বিষয়ক খবরে জানানো হয়, গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করায় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী বিজয় উৎসব পালন করে।

১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বরেও গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট তিনটি খবর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব পায় যার বিষয়বস্তু ছিল:

এক. সাতদলীয় জোটের বিজয় মিছিল;

দুই. আরও তিন উপদেষ্টা নিয়োগ;

তিন. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাক্ষাৎকার।

সাতদলীয় জোটের বিজয় মিছিল বিষয়ক খবরে জানানো হয়: গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন উপলক্ষ্যে সাতদলীয় জোট বিজয় মিছিল বের করে। আরও তিন উপদেষ্টা নিয়োগ বিষয়ক খবরে জানানো হয়: অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে আরও তিনজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন। বিবিসি রেডিওর বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল এরশাদ বলেছেন গণঅভ্যুত্থানের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হলেও তিনি তার অতীত কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত নন। ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করবেন।

বিভিন্ন মহল থেকে জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি সোচ্চার হতে থাকে। সংবাদপত্রের খবরে এর প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ১০ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোট সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেছে এবং এইসব বৈঠকে এরশাদ ও তার সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানানো হয়। পরদিন ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালেও তিন জোট নেতৃবৃন্দ জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এই দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত অপর এক খবরে জানানো হয়, তিন জোট ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন শ্রেণীর সংগঠনের পক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানানো হয়েছে।

১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদকে অন্তরীণ করা হয় এবং তার ১৫ জন সহযোগীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারি করা হয়। পরদিন ১৩ ডিসেম্বর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব কটি পত্রিকায় খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এদিনের খবরের কাগজে গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল এরশাদ সরকারের পতন উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের বিজয় মিছিল সংক্রান্ত একটি খবরটিও প্রকাশিত হয়।

জেনারেল এরশাদ গ্রেপ্তার হওয়ার পরদিন ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর তার সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গ্রেপ্তার হন। একইসঙ্গে এরশাদের অন্যান্য সহযোগীর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এদিনের সংবাদপত্রে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ, আটদলীয় জোট নেত্রী শেখ

হাসিনা ও সাতদলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতার খবরও গুরুত্ব পায়।

১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণায় ১৯৯১ সালের ২ মার্চ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। পরদিন ১৫ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে। এদিনের সংবাদপত্রেও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ, আটদলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ও সাতদলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতার খবরও গুরুত্ব পায়। প্রকাশিত হয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সঙ্গে পাঁচদলীয় জোটের নেতাদের সাক্ষাতের খবর।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরদিনই ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এদিনের সংবাদপত্রে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ, আটদলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ও সাতদলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্য ও কর্মতৎপরতার খবরের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয়: বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং বিচারপতি আমিনুর রহমান খান ও বিচারপতি নইমউদ্দীন আহমেদকে নির্বাচন কমিশনার করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে।

জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলসহ নানা অভিযোগ তদন্তের ব্যাপারে গণদাবির পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯০ সালের ১৭ ডিসেম্বর এ ব্যাপারে একটি প্রেসনোট জারি করা হয়। পরদিন ১৮ ডিসেম্বর এই প্রেসনোট ভিত্তিক খবর সংবাদপত্রে গুরুত্ব পায়। এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা অপর এক প্রেসনোটের বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: সরকার অভিযোগ পেয়েছে যে, গণঅভ্যুত্থানের পর কিছু অসাধু ব্যক্তি ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা আদায়। চাঁদা আদায়কারীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর প্রদান করবে বলে হুঁশিয়ার করা হয়। তিন রাজনৈতিক জোট নেতাদের যৌথসভা অনুষ্ঠানের একটি খবর এদিন প্রকাশিত হয়।

পরদিনই অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য বিচারপতি আনসার উদ্দীনকে প্রধান করে

তিনজন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হয়। ১৯ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে। এদিন সংবাদপত্রে গুরুত্ব পাওয়া আরেকটি খবর ছিল নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ১৯৯০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই তালিকায় বাদ পড়া ভোটারগণ নাম অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পাবেন।

পূর্বে ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখ ১৯৯০ সালের ২ মার্চ পবিত্র শবে বরাত হওয়ায় নির্বাচনের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এই খবরটি ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে। জেনারেল এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদকে গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশি ও পুলিশি তৎপরতা নিয়ে একাধিক খবর প্রকাশিত হয় এদিনের সংবাদপত্রে।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি গুরুত্ব লাভ করেছিল বলেই গণঅভ্যুত্থান অব্যবহিত পরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি পত্রিকায় ৫৬টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সব সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করে প্রধানত দশ ধরনের বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়:

এক. রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র-জনতাকে অভিনন্দন;
দুই. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয়;
তিন. বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন;
চার. জাতির উদ্দেশে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের ভাষণ;
পাঁচ. তিন রাজনৈতিক জোটের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে সমর্থন;
ছয়. শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার আহ্বান সমর্থন;
সাত. সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আহ্বানের প্রতি সমর্থন;
সাত. জেনারেল এরশাদের অন্তরীণ হওয়া;
আট. পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গ;
নয়. সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা;
দশ. শহিদ পরিবারকে সাহায্যের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রশংসা।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র, জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলা এই বিষয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে:

এক. গণতন্ত্রের জন্য এরশাদবিরোধী আন্দোলন জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে অভিহিত হবে;
দুই. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে সংহত করতে হবে;
তিন. গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন।

বাংলাদেশ অবজারভারও এইদিন অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয়তে স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য তাদের অভিনন্দন জানায়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে, ছাত্রদের সম্মিলিত সংহতি দ্বারা গঠিত শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি গণআন্দোলনকে দ্রুত গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করেছে এবং বিজয় এনে দিয়েছে।

১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। অভিনন্দনের পাশাপাশি এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মূল শক্তি ও প্রেরণা ছিল সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য।

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে বেশ কটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলোতে। দৈনিক ইত্তেফাকে এই প্রসঙ্গে পাঁচটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়গুলো প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৯০ সালের ৬, ১১, ১২, ১৬ ও ২০ ডিসেম্বর। করণীয় সম্পর্কে সম্পাদকীয়গুলোতে দৈনিক ইত্তেফাকের পরামর্শ, অভিমত ও মন্তব্যগুলো ছিল:
এক. তিন রাজনৈতিক জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে ধৈর্যশীল, সহনশীল ও দূরদর্শী হতে হবে;
দুই. অর্জিত বিজয়কে কেউ যাতে বিপথগামী না করতে পারে সে জন্য আন্দোলনরত সকল রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনকে সতর্ক থাকতে হবে;
তিন. গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে;
চার. দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির স্বার্থে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সরকারকে তৎপর হতে হবে। এই জন্য দুটি পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রথমত: অবৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো। দ্বিতীয়ত: তল্লাশি অভিযান চালানো;

পাঁচ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেই গণঅভ্যুত্থানের প্রধান বিজয় অর্জিত হবে। এই লক্ষ্যে সর্বস্তরের মানুষকে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করতে হবে;
ছয়. অস্থায়ী সরকার তাদের মৌলিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকলেও প্রশাসন আশানুরূপ তৎপর হচ্ছে না;
সাত. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদেরকে আরও দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে।
নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কে দৈনিক বাংলায় ছয়টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৯৯০ সালের ৬, ১৩, ১৪ ও ১৯ ডিসেম্বর একটি করে এবং ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর দুটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়গুলোতে দৈনিক বাংলার পরামর্শ, অভিমত ও মন্তব্যগুলো ছিল:
এক. গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার গুরুদায়িত্ব ছাত্র ও তরুণ সমাজকে গ্রহণ করতে হবে; দুই. বিশৃঙ্খলার সুযোগে কুচক্রীমহল জনতার বিজয়কে ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই সকল স্তর আর পর্যায়ে সুশৃঙ্খল থাকতে হবে;
তিন. অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হলে সকল শ্রেণির নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে;
চার. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অস্থায়ী সরকারের তৎপরতা আশাবাদের সঞ্চার ঘটিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গণঅভ্যুত্থানের পূর্ণ বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে সকল স্তরের জনসাধারণকে নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে সক্রিয় হতে হবে;
পাঁচ. সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তা সমুন্নত রাখার জন্য উন্নত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অপরিহার্য। তাই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে কোন দল বা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে;
ছয়. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী জাতীয় জীবনের সন্ধিলগ্নে ব্যবসায়ী সমাজের ব্যক্তিগত মুনাফার চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।
সাত. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী আনন্দ ও বিজয় উৎসবের বিপরীতে সমাজবিরোধী কিছু মানুষ নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে;
আট. দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে গণঅভ্যুত্থানের অভীষ্ট লক্ষ্য বানচাল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে;

নয়. গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অপরিহার্য। চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাতিকে আশাবাদী করে তুলেছে। এই শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান সবসময় ধরে রাখতে হবে;

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কে সংবাদে তেরোটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়গুলো ১৯৯০ সালের ৬, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়গুলোতে সংবাদের পরামর্শ, অভিমত ও মন্তব্যগুলো ছিল:

এক. গণঅভ্যুত্থানে বিজয় অর্জিত হওয়ায় শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতে হবে;

দুই. গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে;

তিন. গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ে আত্মহারা না হয়ে অশুভশক্তির চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে;

চার. গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যকে মজবুত করতে হবে যাতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়;

পাঁচ. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দায়িত্বগ্রহণকারী অস্থায়ী সরকারের মুখ্য কাজ হচ্ছে একটি জবাবদিহিমূলক নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তাই এই কাজে অস্থায়ী সরকারকে সকল দলমত, শ্রেণী ও পেশার মানুষকেই সহযোগিতা করতে হবে;

ছয়. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের অপসারণ করার পর এই মুহূর্তে জেলা প্রশাসকদের দিয়ে পরিষদগুলোর ন্যূনতম দৈনন্দিন কাজকর্ম চালু রাখতে হবে। একই সঙ্গে পরিষদগুলোর প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ বা পুনর্গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য নির্বাচিত সরকারের অপেক্ষায় থাকতে হবে;

সাত. মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আগের কমিটি বাতিল করে গঠিত আহ্বায়ক কমিটিকে দুটি দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রথমত. মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সপক্ষের শক্তির সহযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে;

আট. জেনারেল এরশাদের শাসনামলে সামরিক ট্রাইব্যুনালে দোষী সাব্যস্ত করে বরখাস্তকৃত সরকারি কর্মচারীদের নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর ন্যায়বিচারের স্বার্থে আপিল করার সুযোগ দেওয়া উচিত;

নয়. বিনাবিচারে বা বিচারাধীন বন্দিদের সমস্যা জরুরিভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন;

দশ. সরকারি মালিকানাধীন রেডিও-টেলিভিশনের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার স্বার্থে এই দুটি শক্তিশালী গণমাধ্যমকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করার গণদাবি মেনে নেওয়া উচিত;

এগারো. গণবিচ্ছিন্ন স্বৈরশাসকরা জনসাধারণ থেকে বঙ্গভবনকে বিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে বঙ্গভবনের আশপাশের রাস্তা ও পার্কে প্রবেশ ও চলাচল নিষিদ্ধ করেছিল। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বঙ্গভবনের আশপাশের রাস্তা ও পার্কে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া উচিত;

বারো. স্বৈরাচারমুক্ত স্বদেশে একাত্তরের আদর্শকে সমুন্নত রাখতে হবে;

তেরো. ছাত্র-জনতা এবং স্বাধীনতার সপক্ষ রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ শক্তি নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। এই ঐতিহাসিক গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে একাত্তরের ঘাতক ও দালালরাও এসে পায়ে পায়ে এসে শরিক হয়েছে। একাত্তরের এই পরাজিত শক্তিকে প্রশ্রয় না দেওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে;

চৌদ্দ. ভবিষ্যতে দেশে যে কোনো সরকারই আসুক তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। গণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের প্রতি স্তরে জবাবদিহির ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত জনগণের বিজয় থেকে জনগণের কোনো লাভই হবে না;

পনেরো. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অস্থায়ী সরকারের মূল দায়িত্ব অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। তাই এই সরকারের কাছে অন্য কোনো দাবি-দাওয়া পেশ করা উচিত হবে না;

ষোলো. দাবি-দাওয়ার নামে কোনো চক্রান্ত বা উস্কানি যেন দেশবাসীকে বিপথে চালিত না করতে পারে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে;

সতেরো. প্রেসিডেন্টের সচিবালয়কে অতিরিক্ত ফাইলের বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে করণীয় সম্পর্কে বাংলাদেশ অবজারভারে পাঁচটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়গুলো ১৯৯০ সালের ৮, ১১, ১৩, ১৫ ও ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়গুলোতে বাংলাদেশ অবজারভারের পরামর্শ, অভিমত ও মন্তব্যগুলো ছিল:

এক. অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিয়োগ প্রকৃত গণতন্ত্র ও জাতির আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের একটি পদক্ষেপ। তাই তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা করা উচিত;

দুই. অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল কাজ নব্বই দিনের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান হলেও এই সরকারকে চলমান উন্নয়ন কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা, আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা, জাতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির গুরুতর সমস্যাগুলো সমাধানের দিকে নজর দিতে হবে;

তিন. স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বার্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে;

চার. স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন চলাকালে শিক্ষাক্ষেত্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের পর ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য এই দুই ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

পাঁচ. আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করা সকল রাজনৈতিক দলসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের দায়িত্ব;

ছয়. সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারকে আন্তরিক হতে হবে;

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো। দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ জাতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা;

দুই. কর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ দেশের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। জাতির ক্রান্তিলগ্নে দুরূহ দায়িত্ব পালনের জন্য নিষ্ঠা ও দৃঢ়তাই দরকার;

তিন. দেশের সকল শ্রেণির মানুষের উচিত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে :

এক. তিন রাজনৈতিক জোটসহ যে সব রাজনৈতিক মহল বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছে, এখন তাদের সবার উচিত দেশ পরিচালনায় তাকে সহযোগিতা করা;

দুই. যথাসময়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে সাহায্য-সহায়তা দেয়া;

তিন. ভবিষ্যতে দেশের সকল নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে :

এক. অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ তার প্রধান দায়িত্ব জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সফল হবেন;

দুই. বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অস্থায়ী হলেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাই এই সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটা উচিত।

বাংলাদেশ অবজারভার তার সম্পাদকীয়তে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সাফল্য কামনা করে। পরদিন ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত আরেক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার পরামর্শ দেয় :

এক. গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে নিয়োগ করার বিষয়টি গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম ধাপ;

দুই. সকলের উচিত নিজ নিজ সামর্থ্য ও অবস্থান থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কর্মতৎপরতায় সহযোগিতা করা।

দায়িত্ব গ্রহণের পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এই ভাষণ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। দৈনিক বাংলায় পর পর দুদিন ১৯৯০ সালের ৯ ও ১০ ডিসেম্বর এই প্রসঙ্গ নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে:

এক. আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়া দরকার। কারণ, এর ওপর কেবল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই নয়, জাতির ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে;

দুই. জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা করা উচিত।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ অবজারভারে সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর। এই সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে:

এক. বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশে তাঁর প্রথম ভাষণে অর্থনৈতিক সংকটের ওপর জোর দিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে;

দুই. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে সব ক্ষেত্রে ব্যয় কমানো উচিত ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা করেও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে যে রদবদল করছে তাতে প্রশাসন গতিশীল হবে।

গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশের নামে আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়া এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় তিন রাজনৈতিক জোট নেতারা। এই আহ্বানকে সমর্থন করে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর। এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে :

এক. গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার ব্যাপারে তিন জোটের আহ্বান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

দুই. দেশের প্রতিটি নাগরিকের উচিত তিন জোটের আহ্বানে সাড়া দেয়া।

গণঅভ্যুত্থানের পর তিন রাজনৈতিক জোটের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, জেনারেল এরশাদের সহযোগী ও তাঁর দল জাতীয় পার্টির কোনো নেতা-কর্মীকে তিন জোট বা জোটভুক্ত কোনো দলে গ্রহণ করা হবে না। এই বিষয়ে ১৯৯০ সালের ১১ ডিসেম্বর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার তিন রাজনৈতিক জোটের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়।

গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও আটদলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাতদলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়ার বিভিন্ন আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। দৈনিক বাংলা এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা দুই নেত্রীর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানায়। দৈনিক বাংলা আশা প্রকাশ করে, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয় পূর্ণতা লাভ করবে।

শুধু তিন রাজনৈতিক জোট না, জনসাধারণের প্রতি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও আটদলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাতদলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়ার আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানায় সংবাদপত্রগুলো। ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর এক সম্পাদকীয়তে দুই নেত্রীর

আহ্বানে সাড়া দেওয়ার আহ্বান জানায় দৈনিক বাংলা। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে, স্বৈরাচার দমন করে জনতা লক্ষ্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আরেকটু ধৈর্য ও ত্যাগ চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করতে পারে। তাই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই মুহূর্তে কোন প্রকার শৈথিল্য দেখানো যাবে না।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য অভিযোগ করে যে, তাদের নামে দেশে বিভিন্ন অপতৎপরতা চলছে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায়। সংবাদপত্র তাদের আহ্বানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ। ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক ইত্তেফাক। দৈনিক ইত্তেফাক দুষ্কৃতিকারীরা সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নামে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর অপপ্রয়াসকারীদের দমন করার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানায়।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৯০ সলের ১২ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। দৈনিক ইত্তেফাক এই প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৯০ সালের ১৩ ডিসেম্বর। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এই গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো কোনো স্বৈরশাসকের পক্ষেই শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ভবিষ্যতে আর কোনো সামরিক বা বেসামরিক স্বৈরশাসক যেন সেনাবাহিনীর মদদ না পায় এবং সেনানিবাসের সুসংরক্ষিত এলাকায় বসে জনগণের ওপর অপশাসন চালাতে না পারে- এটাই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মূল তৎপর্য।

বহুল প্রত্যাশিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর নির্বাচন প্রসঙ্গে নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৯০ সালের ১৫ ডিসেম্বর নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ অবজারভার একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার আশা প্রকাশ করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী নব্বই দিনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে সফল হবে।

১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলা একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা নির্বাচন সফল করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো এবং সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সকল বাধা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানায়। দুদিন পর ১৯৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলা আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই

সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা নির্বাচনের বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকও একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য যথাযথ নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করে। একই সঙ্গে এই আচরণবিধি প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সম্মতি ও সহযোগিতা নেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে তিন বাহিনীর প্রধানের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। সাক্ষাৎকারে তাদের বক্তব্য প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয় সংবাদপত্রে। ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দীন খান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল আমীর আহমদ মোস্তফা এবং বিমান বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার কমোডোর ইরফান উদ্দীনের বক্তব্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয় এবং তাদের অভিনন্দন জানানো হয়। দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে তিন বাহিনীর প্রধানদের বক্তব্য দেশের সকল স্তরের মানুষকে কেবল আশ্বস্তই করেনি, উদ্বুদ্ধ এবং আনন্দিতও করেছে।

এই প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর। সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে, তিনবাহিনী প্রধানের বক্তব্য জাতিকে আশ্বস্ত করেছে, সশস্ত্রবাহিনীও চায় দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকুক।

স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন ও নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে অনেক মানুষ শহিদ হয়। আহতও হন অনেকে। শহিদ ও আহতদের পরিবারকে সাহায্যের জন্য স্বপ্রণোদিত উদ্যোগের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমন উদ্যোগের প্রশংসা করা হয় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে। ১৯৯০ সালের ১০ ডিসেম্বর সংবাদ এ ধরনের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ আশা প্রকাশ করে, এ ধরনের উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত হবে। আরও প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এ ধরনের উদ্যোগে এগিয়ে আসবে।

সংবাদপত্রগুলোতে গণঅভ্যুত্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি নিয়ে বেশ কিছু উপসম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। নিয়মিত কলামগুলোতেও গণঅভ্যুত্থানসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা অভিমত প্রকাশ করা হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে এ ধরনের মোট ৩১টি উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ ও

কলাম প্রকাশিত হয়। বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বেশির ভাগ উপসম্পাদকীয়তেই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান ও অভিমত প্রকাশ করা হয়। এই সব পরামর্শ ও অভিমতগুলো ছিল:

এক. রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে সাধারণ মানুষের অমিত শক্তির কথা ভুলে গেলে চলবে না। প্রকৃতপক্ষে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণই ইতিহাসের নিয়ন্তা। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান এই কথাই আবার নতুন করে প্রমাণ করেছে;

দুই. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের এক অবিশ্বাস্য সম্ভাবনার ফসল জাতির সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই সম্ভাবনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরির কৃতিত্ব তিন রাজনৈতিক জোটসহ গণতান্ত্রিক সকল দল, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও জনতার;

তিন. গণঅভ্যুত্থানের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দেশের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে নিয়োগ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত মহৎ এবং এটাই স্বাভাবিক;

চার. গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে রাজনৈতিক দল ও জোটের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের ওপর। তাই স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে যে নজিরবিহীন ঐক্য তৈরি হয়েছিল তা ধরে রাখতে হবে;

পাঁচ. ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিরোধী জোটসমূহ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের পতন ঘটিয়েছে। তাই স্থায়ী ও স্থিতিশীল গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতার স্বার্থে শুধু আসন্ন নির্বাচন পর্যন্ত নয়, আরও দীর্ঘদিন তিন জোটের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত;

ছয়. গণঅভ্যুত্থানে অর্জিত বিজয়ের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত পাকাপোক্ত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে;

সাত. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য তিন রাজনৈতিক জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোকে আরও বেশি বিচক্ষণ হতে হবে;

আট. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয় মানেই শেষ কথা নয়। গণতন্ত্র অনুশীলনের জন্য কিছু মূল্যবোধ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। একই সঙ্গে কিছু দায়িত্ব বহনের অঙ্গীকারও গ্রহণ করতে হবে;

নয়. একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের পর নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আবার গণতন্ত্র চর্চা শুরু করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্রের চর্চা দৃঢ়মূল

করার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়। রাজনৈতিক দল ও জোটসহ সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত ভূমিকার মধ্য দিয়েই দৃঢ়মূল হবে গণতন্ত্রের শিকড়;

দশ. গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হলেও স্বৈরাচারী সরকারের ভিত ও তাদের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা সহজ নয়। সে জায়গায় একটি নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণ আরও দুরূহ কাজ। কিন্তু দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে। এর মধ্যদিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগানোর উচিত;

এগারো. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসনের অবসান হলেও চক্রান্ত শেষ হয়ে যায়নি। এই চক্রান্ত প্রতিরোধ করার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের;

বারো. স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে;

তেরো. সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নিজেদের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন একটি মডেল সাংবিধানিক মর্যাদা পাবে;

চৌদ্দ. গণঅভ্যুত্থানের পর আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকলের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

পনেরো. স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরিতে অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য এগিয়ে আসতে হবে;

ষোলো. গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রচর্চা নিশ্চিত ও সচল রাখার স্বার্থে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পরিপন্থি সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে। একইসঙ্গে সাংবাদিকদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে;

সতেরো. জেনারেল এরশাদ সরকারের আমলে সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্তদের উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন।

সংবাদপত্রগুলোর নিয়মিত কলামে গণঅভ্যুত্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি নিয়ে বেশ কিছু অভিমত ও পরামর্শ তুলে ধরা হয়। এই সব অভিমত ও পরামর্শের মধ্যে ছিল:

এক. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে খুব শান্ত এবং পরিচ্ছন্নভাবে লালন করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে;

দুই. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর শুধু একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই শেষ কথা না হয়। এটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। তাই সব রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হতে হবে;

তিন. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত মালিক জনসাধারণ। প্রকৃত ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে। জনসাধারণ সমর্থন করলে ক্ষমতায় থাকা যায়। প্রত্যাখ্যান করলে পদচ্যুত হতে হয়। ইতিহাসের এই সত্যটিতে ভবিষ্যত ক্ষমতাসীনদের স্মরণ রাখতে হবে;

চার. রাজনীতিবিদদের মনে রাখতে হবে যে জনসাধারণ না চাইলে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। আবার জনসাধারণেরও মনে রাখতে হবে, রাতারাতি কিছু অর্জন করা সম্ভব না। গণদাবি আদায়ের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সহনশীল হতে হবে;

পাঁচ. স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য ও নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে সাধারণ মানুষ কি অমিত শক্তি ধারণ করে। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীনরা যেন কখনো সাধারণ মানুষকে হিসাবের বাইরে রাখার চিন্তা না করেন। তাতে বিপর্যয় ঘটা অস্বাভাবিক না;

ছয়. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আবার প্রমাণিত হলো, জনগণের ভাগ্য নিহিত আছে জনগণের হাতেই। ভবিষ্যতে শুধু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই না, সব ক্ষেত্রেই এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক হয়;

সাত. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর সরকারি কর্মচারীদের আর সরকারের তাঁবেদার হলে চলবে না, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এবং জনসাধারণের সেবক হয়ে উঠতে হবে;

আট. স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে সংযম, সহনশীলতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা বজায় রাখায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেনি;

নয়. কোনো মহল বা গোষ্ঠী যেন গণঅভ্যুত্থানের বিজয়কে পশ্চাদমুখী, অগণতান্ত্রিক এবং মানবাধিকারের পরিপন্থি করার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে;

দশ. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর স্বৈরাচারের বর্ণচোরা সহচররা আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। তাদের জাতির সামনে ধিক্কৃত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা দরকার। অন্যথায় সুযোগ পেলেই তারা আবার পুনর্বাসিত হয়ে অপতৎপরতা শুরু করবে;

এগারো. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেলেও সব বিষয়ে খুব সাবধনতা অবলম্বন করা দরকার। কারণ স্বৈরশাসনের মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। সুযোগ পেলেই তা বিস্তার লাভ করতে পারে;
বারো. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শহিদদের অবদান চিরস্মরণীয় করে রাখতে হবে। কারণ তাদের প্রাণের বিনিময়েই স্বৈরাচারের পতন হয়েছে;
তেরো. স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের দুঃশাসন রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। স্বৈরশাসনের নিষ্পেষণে প্রান্তিক মানুষ ক্রমাগত নিঃস্ব থেকে নিঃস্ব হয়েছে। তাই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে;
চৌদ্দ. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্রের অবিস্মরণীয় বিপ্লবের সূচনা ঘটেছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঘটে গেছে বিপ্লব। মত প্রকাশের এই স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে;
পনেরো. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর স্বৈরাচারমুক্ত দেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা যেন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ না পায়।

সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ ও কলাম ছাড়াও এই প্রসঙ্গে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের অভিমত তুলে ধরেন। গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৪ দিনের সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট সর্বমোট ৬৪টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু সংবাদেই ৩২টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, সংবাদপত্রের পাঠকরা নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিঠির মাধ্যমে সংবাদপত্রে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপকভাবে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিগুলোর প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু ছিল :
এক. আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে অভিমত;
দুই. জেনারেল এরশাদের শাসনামলে সামরিক আইনে দণ্ডপ্রাপ্তদের আপিলের সুযোগ দানের আহ্বান;
তিন. গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে অভিমত;
চার. অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টাদের নিরপেক্ষতার জন্য করণীয়;
পাঁচ. অস্থায়ী সরকারে একজন উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ;
ছয়. অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন;
সাত. গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তিন রাজনৈতিক জোট ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যকে অভিনন্দন;

আট. জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের আওতায় আনা;
নয়. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সকল কালো আইন বাতিল করা;
দশ. নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক মিশন পুনর্গঠনের আহ্বান;
এগারো. উপজেলা আদালত নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বন্ধ না করার আহ্বান।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গণঅভ্যুত্থানের পর আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি অভিমত প্রকাশ করেছেন পাঠকরা। নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা চিঠি লিখেছেন। একই বিষয়ে একাধিক চিঠিও প্রকাশিত হয়েছে। এই সব বিষয়ের মধ্যে ছিল: এক. আসন্ন নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সহযোগিতা করা;
দুই. নির্বাচন নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার আহ্বান;
তিন. নির্বাচনে কারচুপি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ;
চার. নতুন ভোটার তালিকা তৈরি;
পাঁচ. ভোটার তালিকা সংশোধন;
ছয়. ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান;
সাত. নির্বাচনের সময় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান;
আট. নির্বাচনের আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালানো;
নয়. নির্বাচনে পোলিং অফিসার হিসেবে শিক্ষকদের নিয়োগ না করা;
দশ. নির্বাচনে ব্যয় সংকোচন।

জেনারেল এরশাদের শাসনামলে সামরিক আইনে অনেকে দণ্ডপ্রাপ্ত হন। একতরফাভাবে তাদের ওপর বিচার চাপিয়ে দেওয়া হয়। তারা উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ পাননি। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর এই দণ্ডপ্রাপ্তদের উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সংবাদপত্রে চিঠি লিখেন পাঠকরা। একই ব্যক্তি এই বিষয়ে একাধিক সংবাদপত্রে চিঠি লিখেও এই আহ্বান জানান।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর সরকার পদ্ধতি বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন পাঠকরা। সংবাদপত্রগুলোতে এই বিষয়ে একাধিক চিঠি প্রকাশিত হয়। পাঠকরা একদিকে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য তিন রাজনৈতিক জোটের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কেউ কেউ নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর সংসদীয় পদ্ধতির

সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানায়। অপর দিকে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা না রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে সে বিতর্কের অবসানেরও আহ্বান জানান পাঠকরা।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে তিন রাজনৈতিক জোট ও ছাত্রসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তাদের অভিনন্দন জানান পাঠকরা। অভিনন্দনের পাশাপাশি চিঠিতে তাদের কিছু করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ তুলে ধরা হয়। পরামর্শগুলো ছিল:

এক. স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে;

দুই. সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সব সময় একতাবদ্ধ থাকতে হবে;

তিন. মানুষ যাতে নির্ভয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেজন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যবস্থা নিতে হবে;

চার. জাতীয় পার্টি যেন পুনরায় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে;

পাঁচ. স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদ ও পঙ্গুত্ববরণকারীদের যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে সংশ্লিষ্ট ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর রাতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পর উল্লাসে ফেটে পড়েন সারা দেশের মানুষ। জনতার এই উল্লাস ও বিজয়-উৎসব চলতে থাকে কয়েকদিন ধরে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিজয় মিছিল বের করে ঘটনার ধারাবাহিকতায়। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণার পর ৫ ডিসেম্বর তিন রাজনৈতিক জোট প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে সর্বসম্মতভাবে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করেন। ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন। তিন মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্য নিয়ে সরকার পরিচালনা শুরু করেন তিনি। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পরই ৬ ডিসেম্বর তিন জোট আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করে। ৭ ডিসেম্বর তিন জোটের যৌথ সভায় জেনারেল এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়।

এরপর বিভিন্ন মহল থেকে এই দাবি সোচ্চার হয়। অবশেষে ১২ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদকে অন্তরীণ করা হয় এবং তার ১৫ সহযোগীর বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে তারা বিচারের সম্মুখীন হন। জেনারেল এরশাদ গ্রেপ্তার হওয়ার পরদিন ১৩ ডিসেম্বর তার সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গ্রেপ্তার হন। ১৪ ডিসেম্বর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণায় ১৯৯১ সালের ২ মার্চ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরদিনই ১৫ ডিসেম্বর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলসহ নানা অভিযোগ তদন্তের বিষয়ে গণদাবির পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৭ ডিসেম্বর এই বিষয়ে একটি প্রেসনোট জারি করা হয়। পরদিন ১৮ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। পূর্বে ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখ ১৯৯০ সালের ২ মার্চ ছিল পবিত্র শবে বরাত। তাই ১৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয় এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত খবরের কাগজে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয় এবং গুরুত্ব লাভ করে। প্রকাশিত খবরের সংখ্যা ও ট্রিটমেন্ট উভয় দিক থেকেই তা উল্লেখ করার মতো।

শুধু খবরের ক্ষেত্রেই নয়, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও নিয়মিত কলামেও নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক সম্পাদকীয় প্রথম পৃষ্ঠায়ও স্থান পায়। শুধু তাই নয়, একই দিন এই বিষয়ে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশের নজিরও দেখা যায়। এই সব সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলামগুলোতে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ও সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানানো হয়। অভিনন্দন জানানো হয় বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে জাতির ক্রান্তিলগ্নে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করায়। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সাফল্য কামনার পাশাপাশি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়।

সার্বিকভাবে সংবাদপত্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ইস্যুতে সম্পাদকীয় নীতির কোনো অমিল দেখা যায়নি।